মুখ্যমন্ত্রী

চাণক্য সেন

ক্লাসিক প্রেস

৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

'মুখ্যমন্ত্রী' সমকালীন ভারতবর্ষের ঔপন্যাসিক আলেখ্য। প্রশাসন এবং রাজনীতি সমকালীন ভারতমানসে দিগন্ত প্রসারিত; সাহিত্যে তার রূপায়ণ অন্তত বাংলাভাষায় এই প্রথম। পাঠক-পাঠিকাদের পূর্বাহ্ণে বলে রাখা দরকার, এ উপন্যাসে বর্তমান ভারতবর্ষের অনেকখানি বাস্তব ভাব-ও-ঘটনা-সমাবেশ তাঁদের চোখে পড়বে; কিন্তু চরিত্রগুলিকে কোনও বাস্তব জীবিত বা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে যাবার দায়িত্ব একান্ত তাঁদের। লেখকের কাছে সব চরিত্র পরিপূর্ণ কাল্পনিক; 'মুখ্যমন্ত্রী' তো বটেই।

চাণক্য সেন

কোশল মন্ত্রীসভার পতন ঘটেছে।

তিনদিন আগে এই দুর্ঘটনা ভারতবর্ষের প্রত্যেক সংবাদপত্রে তারস্বরে বিঘোষিত হয়েছে। এমন কোনও সংবাদপত্র নেই যার সম্পাদক এ বিষয়ে গুরুগম্ভীর ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করেন নি। মন্ত্রীসভার যখন নাভিশ্বাস, তখন প্রদেশের রাজধানী এই শহরে বড় বড় দেশনেতাদের আগমনে আবহাওয়া হঠাৎ নিদাঘতপ্ত মরুভূমির ন্যায় জ্বালাময় হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের সভাপতি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে মুমূর্ষু রোগীর দেহে প্রাণ সঞ্চারের ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। দিল্লীতে নেতাদের জরুরী বৈঠক হয়েছে। এই প্রদেশের দলপতিগণ কেউ কেউ দিল্লীপথে ধাবিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী সরাসরি হস্তক্ষেপ না করায় গুরুত্বপূর্ণ জল্পনার দমকা হাওয়া উত্তেজিত আলোচনাকে বার বার বিভ্রান্ত করেছে।

দীর্ঘদিন ধ'রে প্রদেশের রাজনৈতিক জীবনে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল; স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েও এ চাঞ্চল্যের অংশ পর্যন্ত দেখা যায় নি। বিধান সভার তিনশ' ছাব্বিশ জন সদস্য, কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী—বার বার এই শহরে এসে সকাল থেকে রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত আলোচনায়, বিতর্কে, লেনদেনে নিমগ্ন হয়েছেন; তাঁদের গোপন সলাপরামর্শের বেশীটাই অবশ্য সংবাদপত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। কংগ্রেসের দলনেতাগণ—প্রাদেশিক পর্যায় থেকে জিলা পর্যায় পর্যন্ত—অপূর্ব তৎপরতার সাংঘাতিক প্রমাণ দিয়েছেন। সাধারণত নির্জীব এই প্রদেশ হঠাৎ কোন যাদুবলে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

অনেক চেষ্টা করেও মন্ত্রীসভাকে বাঁচান যায় নি।

অবশেষে, মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে. ডি. কোশল কয়েকদিন আগে এক

ম্লান দিবসের বিষণ্ণ দুপুরে গবর্ণরের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে মন্ত্রীসভার পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন।

যেমন হয়ে থাকে, নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের অপেক্ষায় গবর্ণরের অনুরোধে তিনি প্রাদেশিক শাসনের দায়িত্ব বহন করতে রাজী হয়েছেন।

এদিকে নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের লড়াই চলছে। আগামী কাল নতুন দলপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

যে প্রদেশের কথা বলছি তার নাম উদয়াচল। জনসংখ্যার শতকরা ষাটজন হিন্দীভাষাভাষী, ত্রিশজন মারাঠী; বাকী দশজন দশমেশালী। হিন্দীওয়ালারা যেহেতু সংখ্যায় প্রধান, রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের, অর্থাৎ তাদের নেতাদের হাতে। মারাঠীরা সংখ্যালঘু হলেও হেয় নয়; রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগাভাগিতে ন্যায্য অংশের কিছু বেশি তারা দাবী করে, পেয়েও থাকে। অন্যান্য লোকেদের মধ্যে রাজধানী বিলাসপুরে বঙ্গসন্তান নেহাৎ কম নয়; ডাক্তারী, আইন, শিক্ষকতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁদের সুনাম ও প্রতিষ্ঠা প্রাচীন এবং কুলীন। বেশ কয়েক হাজার তামিলনাদ-নিবাসী সরকারী নোকর; কিছু গুজরাতী ব্যবসা-বাণিজ্যে তৎপর; প্রদেশের শিল্প বলতে যা বোঝায় সেই কাপড়ের কল তিনটির মালিক তারা। কিছু শিখ সর্দার ট্যাক্সি ও বাস চালায়, সদর বাজারে ব্যবসা করে; কয়েক বছর হ'ল কন্‌ট্রাক্‌টারীর উর্বর ভূমিতেও তাদের চরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে।

উদয়াচল নাম হলেও প্রদেশটি অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর। আয়তনে সবচেয়ে বড় তিনটি প্রদেশের অন্যতম; খাদ্য-শস্যের অভাব ত নেই-ই, বরং কিছু বাড়তি উৎপন্ন হয়ে থাকে; কিন্তু শিল্প বিশেষ নেই, যা আছে তাও অন্য প্রদেশের মানুষের কব্জায়। বস্তুতপক্ষে, অনেকে বলেন, উদয়াচলের সবটুকু সম্পদ, তার সঙ্গে শাসনক্ষমতা,

যাদের হাতে তারা প্রায় সবাই বাইরের মানুষ। হিন্দীভাষী জনসাধারণ ছত্রিশগড়ী, কিন্তু ভদ্রলোকেরা উত্তর প্রদেশ থেকে বহুপুরুষ আগে চ'লে এলেও জনতার সঙ্গে এক হ'তে পারেন নি, বা হন নি। মারাঠী সমাজের অধিকাংশ 'গোঁদ' উপজাতির বর্তমান ধোলাই সংস্করণ; অথচ যাদের হাতে ক্ষমতা তারা প্রায় সকলেই মহারাষ্ট্র-বিচ্যুত ব্রাহ্মণ। হাইকোর্টের জজ, বড় ডাক্তার, ভাল অধ্যাপক বেশ কয়েকজন বাঙ্গালী; তাঁরাও উদয়াচলী নামে পরিচিত হ'তে চান না। ফলে, উদয়াচল প্রদেশ ঠিক কারুর নয়, একমাত্র জনসাধারণ ছাড়া, যারা এখনও না শাসন করে, না শাসন করায়।

এহেন উদয়াচলে ছয় বছর দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব—অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীত্ব— ক'রে এসেছেন কে. ডি. কোশল। ছয় বছর পর তাঁর মন্ত্রীসভা বর্তমানে ভূপতিত।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল।

এ প্রদেশে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে বহু লোক তাঁকে চেনেন। নামে, প্রতিষ্ঠায়, সংবাদপত্রে বহুবার প্রস্ফুটিত মুখচ্ছবিতে।

প্রস্ফুটিতই বটে। অমন সুগঠিত দেহ কম পুরুষের দেখতে পাওয়া যায়। ধবধবে ফর্সা রং, সটান ছ'ফুট দৈর্ঘ্য, নির্লোম সতেজ শরীর।

মুখের দিকে তাকালে প্রথমে চোখে পড়ে নাক। কপাল থেকে হঠাৎ গজিয়ে, কোনও কিছুর তোয়াক্কা না ক'রে, ঋজু বলিষ্ঠতায় গড়ে উঠে ঈষৎ বেঁকে ঠোঁটের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাক দেখলে বোঝা যায়, কেন তাঁর এত দুর্নাম, এত সুনাম। নাকের দু'পাশে চোখ দু'টি কোটরগত; কপাল দীর্ঘ হ'লেও সামান্য চাপা; গালের ওপর বেমানান দু'টি ভাঁজ। এসব মিলে নাককে যেন আরও জোরাল চোখাল ক'রে তুলেছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখে নাকের প্রভুত্ব বাদ দিলে আর বিশেষ কিছু থাকে না। তাই অনেকে বলেন, কে. ডি. কোশলকে বোঝবার উপায় নেই; নাকের আড়ালে সব-কিছু ঢাকা পড়েছে।

উদয়াচলে কে. ডি. কোশল "শক্ত মানুষ" নামে পরিচিত। রাজনীতিকে শাসনকার্যের স্নাতকোত্তর অবস্থায় জমিয়ে তুলতে হ'লে অন্তত একজন শক্ত মানুষের দরকার, এই হ'ল প্রচলিত ধারণা। যেমন সর্দার প্যাটেলকে বলা হ'ত নয়া দিল্লীর কঠিন মানুষ। বাস্তব-ক্ষেত্রে এই শব্দ দু'টির ঠিক অর্থ যে কি তা কিন্তু সহজে জানবার উপায় নেই। যদি বলা যায়, শক্ত মানুষ জনমতের পরোয়া করেন না, জনসাধারণ যা চায়, পছন্দ করে, তার বিপরীত কাজে পিছুপা হন না, তা হ'লে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ক্ষেত্রে এ বিশেষণ প্রযোজ্য নয়। কারণ, যাদের ভোটে রাজত্ব করেন তাদের খুশী রাখবার জন্যে তার চেষ্টার অবহেলা নেই।

যদি বলা যায়, শক্ত মানুষের অসীম দুঃসাহস, তিনি যে-কোনও বিষয়ে বিরুদ্ধপক্ষের সম্মুখীন হ'তে ভয় পান না; বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর পুলিসকে গুলী চালাবার হুকুম দিতে তাঁর কণ্ঠস্বর একবারও কেঁপে ওঠে না, তা হ'লেও কে. ডি. কোশলের ক্ষেত্রে এ বিশেষণ অপব্যবহৃত। একথা সবাই জানে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেপরোয়া না হ'লে বিরুদ্ধশক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সম্মুখ সমরে বিশ্বাস করেন না; যদিও অনেকে জানেন না, পুলিসকে গুলী চালাবার হুকুম একবারও তিনি নিজে দিতে পারেন নি।

অথচ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উদয়াচলের রাজনীতিতে শক্ত মানুষ নামে পরিচিত।

এ নিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে তার নালিশ আছে। কেননা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল কবি; হিন্দী কাব্যসাহিত্যে তাঁর রচিত "কৃষ্ণলীলাকাহানী" স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতির বাইরে অবকাশ পেলে, এবং কোনও সাময়িক উত্তেজনায় জড়িয়ে না পড়লে, মনের মত নিরাপদ মানুষ পেলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এখনও মাঝে মধ্যে কবি হয়ে ওঠেন, জীবনের নিগূঢ় রহস্য নিয়ে আলোচনায় নিমগ্ন হ'তে পারেন। তখন তাঁকে সখেদে বলতে শোনা যায়, "সবাই বলে আমি

শক্ত মানুষ। আমার মন যে কত দুর্বল তা কেউ জানে না। গাছের পাতা নড়লে পর্যন্ত আমার মনে শিহরণ লাগে।"

একটু থেমে, ম্লান হেসে যোগ দেন, "যখন আমি রাজনীতি করি না, তখন আমি কবি।"

বিলাসপুর প্রাচীন শহর; ভারতবর্ষের সুদূর অতীতের চিহ্ন বহন করছে। মারাঠাদের সঙ্গে মোঘলের অন্যতম প্রধান যুদ্ধ একদা এ শহরে ঘটেছিল; পুরাতন মারাঠা দুর্গ এখনও তার সাক্ষ্য বহন করছে। তার বহু বছর পরে এ দুর্গ থেকেই অন্য এক মারাঠা নৃপতি ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। সে যুদ্ধও দুর্গের ডান দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হয়েছিল। পরবর্তীকালে সমস্ত প্রান্তর ও দুর্গ ঘিরে নিয়ে ইংরেজ সরকার এক বিরাট ছাউনির পত্তন করেছিল। ছাউনির নাম সিংহগড়।

সিংহগড়ের অনতিদূরে ইংরেজের হাতে নির্মিত লেজিস্লেটিভ্ অ্যাসেম্বলির ভবন, বর্তমান নাম বিধানসভা। বড় বাড়ী, বিস্তীর্ণ উদ্যানে ঘেরা। যে রাজপথের ওপর বিধানসভা ভবন, তার দুই সীমান্তে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন। তাদের পেরিয়ে এসে আবার একবার দুই ফটকের সামনে সশস্ত্র পুলিসের সামনে দাঁড়াতে হয়। তারা পাস দেখে পথ ছাড়লে তবে সাধারণ মানুষ বিধানসভা ভবনে ঢুকতে পারে।

রাজপথের নাম ভীমরাও রোড। যে মরাঠা রাজা ইংরেজকে লড়েছিলেন তাঁর নাম। ইংরেজ নাম রেখেছিল ওয়াটসন রোড, কর্ণেল ওয়াটসনের হাতে ভীমরাও পরাজিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল মুখ্যমন্ত্রী হবার পরে নাম পাল্‌টে রাখা হ'ল। এজন্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাহবা পেয়েছিলেন। নতুন নামকরণের জন্যে মনোরম অনুষ্ঠান হয়েছিল। বক্তৃতায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেছিলেন, "এ নাম-পরিবর্তন সাধারণ ঘটনা নয়। পরাধীন ভারতবর্ষের রূপ বদলে

স্বাধীন ভারতবর্ষ আজ উদ্ভাসিত। ইতিহাস যাই বলুক্ না কেন, ভীমরাও কোনদিন হারেন নি। হারতে পারেন না। আমাদের মন চিরদিন বলেছে, তিনি জিতেছেন।"

নিমন্ত্রিত জনসভা হাততালিতে ভেঙে পড়েছিল।

মন্ত্রীসভার পতন হ'লেও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল তাঁর পরাজয় মেনে নেন নি। মানবার ইচ্ছাও নেই। যে চতুর নৈপুণ্যে বহু ভাগে বিভক্ত দলের ওপর ছয় বছর তিনি নেতৃত্ব ক'রে এসেছেন, বিধাতার কঠিন অবিচারে, তিনি মনে করেন, তা আজ সাময়িক ভাবে অকেজো হয়েছে মাত্র। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উদয়াচলের রাজনীতির নাড়ীনক্ষত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ জানেন; এমন কোন দলীয় নেতা, উপনেতা নেই যার সবটুকু পরিচয় তাঁর আয়ত্ত নয়। একে ত সুদীর্ঘকাল তিনি এ প্রদেশে রাজনীতি করেছেন, এ ক'রে চুল পেকেছে, হাত পেকেছে, এক কালের কুমার-হৃদয়ে অর্ধস্ফুট উত্তপ্ত আদর্শ ক্রমে ক্রমে শাসন-শিল্পে পরিণত রূপ পেয়েছে। তা ছাড়া, মুখ্যমন্ত্রী হবার পর তাঁর নিজস্ব গুপ্তচরেরা প্রত্যেক নেতা, উপনেতা, নেতৃত্বাভিলাষীর ওপর সতর্ক নজর রেখে তাঁকে রীতিমত রিপোর্ট দিয়ে এসেছে। সুতরাং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল জানেন, যার যত উচ্চাশা থাক্ না কেন, যে যতই না করুক্ চেষ্টা, হাই-কমাণ্ডের তাবেদারী, দলকে একসঙ্গে বেঁধে রেখে শাসন চালিয়ে যাবার ক্ষমতা কারুর নেই।

শুধু আছে একজনের। তাঁর নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল।

আছেন, আরও একজন আছেন। খুব ভয় না পেয়েও কম্পিত বক্ষে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁর কথা ভাবেন। কিন্তু ছ' বছরে উদায়চলের রাজনীতি যে মোহমুদ্গর রূপ ধারণ করেছে, এর মধ্যে সেই অনিশ্চিত নেতা নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না ব'লে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। আদর্শবাদ সুন্দর; কিন্তু শুধু আদর্শবাদ দিয়ে শাসন চলে না, এগোয় না দলীয় রাজনীতির চাকা। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

নতুন মন্ত্রীত্ব গঠন করে আপনার নেতৃত্ব পুনঃস্থাপিত করার দেশ-প্রেমিক প্রচেষ্টায় দিবারাত্র নিযুক্ত থেকেও অনেক সময় তাঁর সঙ্গে এই একমাত্র সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের বিরোধের কথা কল্পনা করেন। এ বিরোধ এখনও ঘটে নি ; তাঁর ধারণা ঘটবে না। যদি ঘটে, লড়াই সত্যিকার জমবে।

·

ভীমরাও রোড বিধানসভা ভবন পেরিয়ে ডান দিকে মোড় খেয়ে সোজা ধাবিত হয়েছে। আধ মাইল পরে এসে মিলেছে জওহরলাল এ্যাভিনিউর গায়ে। জওহরলাল এ্যাভিনিউও পুরাতন রাস্তার নতুন নাম। ইংরেজ আমলে ছিল কার্জন রোড।

জওহরলাল এ্যাভিনিউর একটা 'ডাক নাম'-ও আছে। কে. ডি. এ্যাভিনিউ। এ রাস্তাতে মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের সরকারী নিবাস।

মস্ত বড় বাড়ী। পুরো ছ' একর জমি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বড় বড় গাছের ছায়ায় শান্তশ্রী। আম, বকুল, জাম, ইউকালিপটাস, অর্জুন, নিম, গুলমোহর, কৃষ্ণচূড়া। চারদিকে সবুজ মসৃণ প্রশস্ত লন। মাঝখানে দোতলা বাড়ী, সঙ্গে মাত্র চার বছর আগে তৈরী মুখ্যমন্ত্রীর অফিসব্লক। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রায় রোজ ঘণ্টা-দুয়েকের জন্যে সেক্রেটারিয়েটে যান ; বাকী সময় বাড়ীতে, অর্থাৎ আপিস-ব্লকে, ব'সে কাজ করেন।

ব্লকটি তিনি নিজের খুশি ও সুবিধামত তৈরী করেছেন। নিচের তলায় কর্মচারীদের ঘর। প্রাদেশিক প্রশাসনে বারোটি বিভাগের চারটি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিজস্ব পোর্টফোলিও। সুতরাং খুব বাছাই বাছাই কয়েকজনকে বাড়ীর আফিসে কাজ করতে আনলেও সংখ্যা একেবারে কম নয়। দোতলায় উঠে সিঁড়ির সঙ্গে আগন্তুকদের বসবার, অপেক্ষা করবার ঘর ; পশ্চিমী কায়দায় সুসজ্জিত। দেওয়ালে দেশনেতাদের ছবি। এই ঘরের সঙ্গে তিনখানি ছোট ঘর, তাতে মুখ্যমন্ত্রীর

পার্সোনাল ষ্টাফ বসেন। তারপর প্রাইভেট সেক্রেটারী দ্বারকা প্রসাদের কক্ষ। একটু দক্ষিণে চীফ সেক্রেটারীর জন্যেও একখানা ঘর নির্দিষ্ট রয়েছে। তারপর মুখ্যমন্ত্রীর নিজের দপ্তরঘর।

বিরাট, কিন্তু একেবারে নিখুঁত সাবেকী ভারতীয়। মির্জাপুরী সতরঞ্চিতে মেঝে আবৃত। তার উপর ধবধবে সাদা চাদর। চাদরের ওপরে অনেকটা স্থান জুড়ে মির্জাপুরী কার্পেট। মুখ্য-মন্ত্রীর জন্যে মাঝখানে পার্সিয়ান কার্পেট। তিনটি তাকিয়া সুন্দর ক'রে সাজান। মুখ্যমন্ত্রী কার্পেটের ওপর সোজা হয়ে বসেন, সামনে চৌকিতে তাঁর কাগজপত্র, ফাইল থাকে। মাঝে মাঝে তিনি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেন। লোকজনের সঙ্গে কথা বলার সময় কখনও-সখনও তাকিয়ায় গা ছেড়ে দেন। দর্শনপ্রার্থীকে লক্ষ্য করে বলেন, "আরাম করে বসুন। চেয়ারে ব'সে লোকে যে কি সুখ পায় জানি না। ছোট বেলা থেকে আমার মাটির ওপর সোজা হয়ে বসা অভ্যাস। এখন বুড়ো হয়েছি, মাঝে-মধ্যে একটু আরাম চায় দেহ!"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের দপ্তরঘরের সংলগ্ন বাথরুম, পায়খানা; আর, অন্য পাশে আর একখানা ঘর। বিশ্রাম ঘর। পালঙ্কে শয্যা পাতা, সঙ্গে দু'খানা আরাম-কেদারা, টেবিল, শেল্‌ফ্‌। কাঠের ছোট আলমারীতে কিছু কাপড়-জামা। রিফ্রিজেরেটরে আহারের ফল, পানীয়।

এমন অনেক রাত এসে যায়, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আর আসল বাড়ীতে ফিরে যেতে পারেন না। তখন এ বিশ্রাম ঘরেই তিনি রাত্রি যাপন করেন।

দপ্তরঘরের অন্যদিকে মন্ত্রীসভার বৈঠক-কক্ষ। এ ঘরটাও বিরাট; সুসজ্জিত। মস্তবড় গোলাকার মেহগনি কাঠের টেবিল, চতুর্দিকে মন্ত্রীদের জন্য পুরু ডানলোপিলো-মোড়া চেয়ার। টেবিলের মাঝখানে বৃহদাকার চীনে 'ভাস', মালী তাতে রোজ ফুল রাখে। সাধারণত

প্রতি শুক্রবার এ ঘরে মন্ত্রীসভার বৈঠক বসে। তা ছাড়া কখন-সখন জরুরী বৈঠক আহ্বান করতে হয়।

যেদিন এ কাহিনীর শুরু ও শেষ, সেদিনও শুক্রবার। মন্ত্রীসভার বৈঠক হবে বেলা এগারটায়।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রোজ চারটে বাজতে শয্যা ত্যাগ করেন ; আজও করেছেন। লনে পুরো এক ঘণ্টা তিনি বড় বড় পা ফেলে হাঁটেন ; সঙ্গে সঙ্গে মনে রোজকার রাজনীতি খেলার ছক তৈরী ক'রে নেন। আজ সকালে বেড়াবার সময় মন্ত্রীসভার বৈঠকের কথা বার বার মনে হয়েছে ; এ বৈঠকের গুরুত্ব যে কতখানি হ'য়ে দাঁড়াতে পারে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের অজানা নেই। মন্ত্রীসভায় তিনটি প্রধান দল ; একটি তাঁর নিজের। অন্য দু' দল হঠাৎ তাঁর বিরুদ্ধে একত্র হ'য়ে যাওয়ায় তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এখনও এই আকস্মিক ঐক্যকে তিনি একেবারে ভাঙ্গতে পারেন নি; তবে বহুমুখী চেষ্টা তাঁর চলছে; এবং তিনি শেষ ফল সম্বন্ধে সত্যিকারের আশাবাদী হ'য়ে উঠেছেন। আজ মন্ত্রীসভার বৈঠকে তাঁর চেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে, হবার সম্ভাবনা আছে, তা অনেকখানি বোঝা যাবে। বৈঠকের আগে আটটা থেকে একেরপর এক মানুষ আসবেন দেখা করতে, তাঁরা সবাই রাজনীতিতে হাত-পাকা। বারজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মধ্যে সাতজনের সঙ্গেও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পূর্বাহ্নে কথা বলবেন। সকালে এক ঘণ্টা বেড়াবার সময় এ সব আসন্ন সংঘাতের ছক মনের মধ্যে কাটা হয়ে গেছে।

প্রাতঃভ্রমণ শেষ হ'লে গৃহে ফিরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এক গ্লাস সান্তরার রস পান করেন। তারপর স্নান সেরে পূজায় বসেন। পূজার ঘরে তাঁর সঙ্গে সারাদিনের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘকাল দেখা হয়—ভগবানের সঙ্গে নিশ্চয় নয়—এক অতি সুন্দর বৃদ্ধার সঙ্গে, যাঁর চুল পেকে মুখের রং-এর সঙ্গে মিলে গেছে, যাঁর শীর্ণ দেহে গরদের লাল-পাড় শাড়ী, আয়ত চোখে উদাস নিস্তেজ বেদনা, যিনি কথা বলেন খুব কম;

অথচ যাঁর দৃষ্টি এত সবাক্ যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তা বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারেন না। কৃষ্ণ-পাথর হরিহরের মূর্তির সামনে চোখ বুজে আধ ঘণ্টা ধ্যান করবার সময় মানসপথে দেশ-শাসনের জটিল সমস্যা যেমন জুলুম ক'রে প্রসারিত হয়ে পড়ে, তেমনি দৃষ্টিপথে বার বার অদূরে উপবিষ্টা মুদিত-আঁখি নারী বারংবার এসে দাঁড়ায়।

তথাপি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ হিন্দুর অন্তরে যে ধর্মভাব জাগে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ভজন-পূজন তার চেয়ে কিছু বেশী। একে ত তিনি ধর্মপ্রাণ পিতা-মাতার পুত্র; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম, এবং সে কারণে ধর্মে স্বাভাবিক অনুরাগ সম্ভব। তা ছাড়া ভারতবর্ষে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির ওতপ্রোত সম্বন্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভাল ক'রে জানেন এবং মানেন। যে রাজনৈতিক নেতা ধার্মিক নন, অর্থাৎ পূজা না করেন, দেবদ্বিজে ভক্তি না দেখান, মন্দির স্থাপনে উৎসাহী না হন, মাঝে-মধ্যে প্রকাশ্যে কপালে তিলক না কাটেন, সাধুসন্তদের সঙ্গে সময় যাপন না করেন এবং বক্তৃতার সময় গীতা, মহাভারত ও রামায়ণ থেকে শ্লোক আবৃত্তি করতে না পারেন, ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষে রাজত্ব করা তাঁর পক্ষে কঠিন। মুখ্যমন্ত্রী হবার পর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল অনেক বেশী বুঝতে পেরেছেন, ধর্মের প্রভাব কত গভীর, কত ব্যাপক ভারতবাসীর মনে। এ প্রভাবকে যে ব্যবহার করতে জানে না, তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব ব্যর্থ। এ কারণেও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রতিদিন এক ঘণ্টা পূজার ঘরে কাটান; চন্দন-চর্চিত গৌর কপাল, পরণে পবিত্র রেশমের ধুতি, গ্রীষ্মে অনাবৃত দেহ, শীতে মাত্র রেশমের চাদর: পূজার পর তাঁকে অপূর্বকান্ত দেখায়।

এই কান্তি নিয়েই কদাচিৎ তিনি দু-একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হ'লে চাপরাশী বৈঠকখানায় বসায়। 'পণ্ডিতজী' পূজাঘরে আছেন। পূজার পরই দেখা করবেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা বৈঠকখানায়

চ'লে আসেন। অমলিন হাসি ঝরতে থাকে তাঁর মুখে, চোখে, সর্বাঙ্গে। নাকের দাপট যেন একটু স্তিমিত হয়ে আসে।

সাক্ষাৎপ্রার্থী বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। একি সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, যাঁর নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়, যাঁর কুৎসায় বহু মানুষ মুখর!

কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে অনেক উঁচু, একটু যেন মহান, অনেকখানি রহস্যময় মনে হয়।

আজ পূজায় বসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্থিরমনে দেবভজন করতে পারেন নি। শুধু এজন্যে নয় যে, অনেককালের চেনা অথচ অনেকখানি অচেনা এক নারীর ধ্যানরত মুখখানা আজও তাঁকে বার বার বিচলিত করেছে। তার চেয়েও বেশী বিচলিত হয়েছেন সারাদিনের সংঘাত ও সঙ্কটের কথা মন থেকে না যাওয়ায়। হরিহরের কাছে তিনি বহুবার মার্জনা চেয়েছেন সবকিছু স্খলন-পতন ত্রুটির জন্যে; প্রার্থনা করেছেন সংগ্রামে জয়লাভের।

পূজাশেষে প্রণাম সেরে উঠতে যাবেন এমন সময় আজকার দিনের প্রথম ঘটনা ঘটল।

নারীকণ্ঠ থেকে ধ্বনি এল: "তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। কখন সময় হবে?"

মুহূর্তের জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন খেই হারিয়ে ফেললেন। হঠাৎ জবাব এল না।

বললেন: "আজ বড় কাজের চাপ।"

"তা হোক্। দুপুরে বাড়া এসে খেয়ো। তারপর কথা হবে।"

বিস্ময়ে হতবাক্ হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। আজ-তিন বছর হ'য়ে গেছে এ ভাবে জোর দিয়ে একটা কথাও এই বিশীর্ণা রমণী বলেন নি। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন টের পেলেন, এ হুকুম অমান্য করা চলবে না। সহজে মানবার পাত্র তিনি নন। বললেন, "চেষ্টা করব। সময় বড় কম।"

পূজার ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একবার চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলেন। প্রথম মার্চের সকাল। শীতের আমেজ এখনও লেগে আছে, বার্ধক্যে লাজুক কামনার মত জড়সড়, সংগোপন। ইউকালিপটাস্ গাছগুলিব পাতা ঝবছে, গায়েব চামড়া উঠতে আরম্ভ করেছে। ঝির্‌ঝিরে মোলায়েম হাওয়া বইছে, প্রভাতকে আরও মনোবম, স্নিগ্ধ ক'রে। আকাশ রঙিয়ে উঠছে। জওহব এ্যাভিনিউ যেখানে ভীমরাও রোডে মিশে গেছে সেই অবধি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের দৃষ্টি চ'লে গেল। দেখতে পেলেন কালো রং-এব একখানা গাড়ী আসছে।

এ গাড়ীর অপেক্ষায় ছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

গাড়ী এসে ফটকে ঢুকল। নিষ্ক্রান্ত হলেন খদ্দরের ধুতি-কুর্তা পরিহিত মাঝবয়সী ছোট্টখাট্ট এক ভদ্রলোক। মাথা-ভরতি টাক; শুধু কপালেব ওপব হঠাৎ অপ্রয়োজনীয় একগুচ্ছ লালচে চুল। দেহে ছোট হ'লে কি হবে, লোকটির মুখখানার সবকিছু একটু বড়, একটু বেশি। কপাল একটু বেশি চওড়া, চোখ দুটি খুব বড় বড়, নাক একটু বেশি মোটা, গাল দুটো একটু বেশি ভরা ভরা, চিবুক বড় বেশি চ্যাপটা, ওষ্ঠাধর একটু অতিরিক্ত মোটা, দাঁতগুলি তামাকে বড় বেশি কালো এবং বিবর্ণ। এসব মাত্রাধিক্যের ফলে লোকটির চোখে-মুখে অসাধারণ তৎপরতা সর্বদা প্রকাশিত হয়ে থাকে। যেন তিনি অনেক বেশি দেখছেন, জানছেন, বুঝছেন; অনেক বেশি গন্ধ পাচ্ছেন, অনুভব করছেন। মুখোমুখি ব'সে কথা বলতে কেমন অস্বস্তি লাগে।

গাড়ী রাস্তায় দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পূজার ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন। গিয়েই তাকিয়েছিলেন, চোখ বুজে তখনও ধ্যানরতা রমণীর শীর্ণ মুখে বিদ্রূপের বিশীর্ণ বক্র রেখা দেখতে পাবেন ভেবে।

গাড়ী থেকে যিনি নামলেন তাঁর নাম সুদর্শন দুবে। চাপরাশী বেয়ারা সেলাম করে তাঁকে সম্বর্ধনা করছে, এমন সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

পূজার ঘর থেকে আবার বেরিয়ে এলেন। মুখে তাঁর দশাবতার স্তোত্র ঃ "কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে।"

সুদর্শন তুবেকে জড়িয়ে ধরলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

"আসুন, আসুন। কৃষ্ণপূজাব পরই সুদর্শন-দর্শন। দিন যাবে আজি ভাল।"

হাসতে হাসতে সুদর্শন তুবে বললেন, "ক্ষমা করবেন। একটু দেরি হয়ে গেল। দেখতে পেলাম আপনি অপেক্ষা করছিলেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মনে মনে রেগে গেলেন। প্রথম চালে হার হ'ল। এ লোকটার চোখ বড় বেশি দেখে।

হাসতে হাসতে বললেন, "কিছুমাত্র দেবি হয নি। আজ অনেক কাজ। একটু তাড়াতাড়ি পূজা শেষ করতে হ'ল।"

তুজনে গিয়ে বসলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিভৃত নিজস্ব মন্ত্রণা-ঘবে। এ ঘরে প্রবেশাধিকাব খুব কম লোকের।

সুদর্শন তুবে প্রথম কথা বললেন।

"আপনাব সঙ্গে লেন-দেন অনেক দিনেব; কিন্তু পূজার পরে সকাল বেলা এই বেশে এইভাবে আপনাকে প্রথম দেখলাম।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে বললেন, "নিশ্চয় হতাশ হন নি।"

"হতাশ হবার কথা কেন তুলছেন? পূজারী ব্রাহ্মণ হিসেবে আপনার কাছে আমরা কেউ কোনও দিন কিছু আশা করি নি।"

"আমার ঠাকুরদা পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন।"

"আমাব পিতামহও নিশ্চয় তার চেয়ে বেশি বা কম কিছু ছিলেন না।"

"কম ছিলেন না নিশ্চয়। কি খাবেন বলুন। চা খাবেন নিশ্চয়।"

"চা খেয়ে বেরিয়েছি। আসুন, কাজের কথা হোক। আপনার ত আজ অনেক কাজ।"

"তা বটে। বলুন।"

"কি শুনতে চান?"

"বলবেন তো আপনি।"

"বলব। আশা করি আপনি আমায় হতাশ করবেন না।"

"বলুন। যতটা সম্ভব আমি আপনার সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতে চাই, দুবেজী।"

"হরিশংকর ত্রিপাঠী স্বরাষ্ট্র বিভাগ চাইছেন।"

"মাধব দেশপাণ্ডে?"

"অর্থমন্ত্রীত্ব।"

"মহেন্দ্র বাজপাঈ?"

"বাণিজ্য-শিল্প।"

"প্রজাপতি শেউড়ে?"

"তার বিরুদ্ধে যে ক'টা নালিশ এসেছে সব তুচ্ছ করতে হবে। সে যা আছে তাই থাকবে।"

উঠে দাঁড়ালেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। কয়েক মিনিট মেঝেয় পায়চারি করলেন। তারপর হঠাৎ সুদর্শন দুবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন:

"আর আপনি?"

সুদর্শন দুবে এ প্রশ্নের জন্যে তৈরী ছিলেন না। তাঁর মুখের প্রত্যেকটি অতিরিক্ত অঙ্গ যেন একসঙ্গে চমকে উঠল। হঠাৎ তিনি উত্তর দিতে পারলেন না।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কণ্ঠস্বরকে তিক্ত-কষায় করে ব'লে গেলেন:

"বলুন আপনি কি চান? যে-কজনের দাবী আমার কাছে পেশ করলেন এ ত কেবল তাঁদের দাবী নয়, এ আপনারও দাবী। হরিশংকর ত্রিপাঠীকে হোম-মিনিষ্টার করবার জন্যে পাঁচ বছর ধ'রে আপনি চেষ্টা ক'রে এসেছেন। মাধব দেশপাণ্ডে অর্থমন্ত্রী হ'লে প্রদেশের সর্বত্র অনর্থ বাধবে। তবু তার উচ্চাশায় আপনি ইন্ধন জোগাচ্ছেন। মহেন্দ্র বাজপাঈ শিল্প-বিভাগ পেলে আপনার কি

সুবিধে হবে আমার জানা আছে। প্রজাপতি শেউড়েকে আপনি বাঁচাতে চান। তা হ'লে দেখুন, এদের সম্মিলিত দাবী আপনারই দাবী। এগুলো সব মেনে নিলে আপনি খুশী, না এর ওপরে আপনার আরও কিছু হুকুম আছে ?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যখন কথা বলছিলেন তখনই সুদর্শন দুবে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। তিনি যখন জবাব দিলেন তখন তাঁর মুখে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের হাসি।

"আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়, কোশলজী। এ না হ'লে ভারতবর্ষের অন্যতম ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতা ব'লে আপনার খ্যাতি হ'ত না। আপনি যখন সাফ্ কথাবার্তা বলছেন, আমিও তাই করব। আপনি ঠিক বলেছেন, এসব দাবী আমি সমর্থন করি। যদি আপনি এগুলো মানতে পারেন, পার্টি আপনাকে অধিকাংশ ভোটে পুনরায় দলপতি নির্বাচন করতে পারে। পুরো কথা আমি আজও দিতে পারছি না। তবে সম্ভাবনা নিশ্চয় আপনার পক্ষে।"

একটু থেমে আবার বললেন, "আমার নিজের কোনও দাবী আছে কি না জানতে চাইছেন? দেখুন, আপনি আমি প্রায় একই সঙ্গে রাজনীতিতে ঢুকেছিলাম। আপনার বয়স কিছু বেশি ছিল। সেকালে আমরা একে রাজনীতি বলতাম না, স্বদেশী বলতাম। তখনকার জেলে যাওয়া, চরকায় সূতা কাটা, আবগারী দোকানে পিকেট করা, মিছিল ক'রে ইংরেজের পতন দাবী, এসব যে একদিনের শাসনকার্যের পায়তাড়া, তা আমাদের কারুর মনে হয় নি। দেশ যখন স্বাধীন হ'ল, আমরা যখন দেশসেবক থেকে শাসকে উত্তীর্ণ হলাম, তখন নতুন কর্তব্যের আহ্বান এল। এ প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করবার যোগ্যতা সত্যিকার যাঁর, তিনি নির্লিপ্ততার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে স'রে দাঁড়ালেন। বাকী রইল দু'জন: সুদর্শন দুবে আর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল।"

সুদর্শন দুবে উঠে জানলার পাশে এসে দাঁড়ালেন। বাইরের দিকে

মুখ রেখে ব'লে চললেন, "যদি কর্তারা আমাদের লড়বার স্বাধীনতা দিতেন, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আপনাকে হারতে হ'ত। কিন্তু আপনার কলকাঠি নড়ল ওয়ার্ধায়, দিল্লীতে। জিতলেন আপনিই।"

"জিতলেন বটে, তবে পুরোপুরি নয়। মুখ্যমন্ত্রীত্ব পেলেন আপনি, কংগ্রেসের নেতৃত্ব রইল আমার হাতে। এ অবস্থায় চলল ছ' বছর।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "এ ছ'বছরে আমি প্রতিপদে আপনার সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে এসেছি।"

সুদর্শন দুবের গলা চড়ল।

"একথা পার্কে বক্তৃতা করবার সময় বলবেন। এ ছয় বছর আপনি আমার ক্ষমতা খর্ব করতে চেয়েছেন, আমি আপনার ক্ষমতা খর্ব করতে চেষ্টা করেছি। ছ'বছর আগে আমি হেরে গিয়েছিলাম। নির্বাচনে আপনি এক চুলের জন্যে জিতেছিলেন। আজ আপনি পুরোপুরি হেরে গেছেন। দলের অধিকাংশ সভ্য আপনার ওপর অনাস্থা জ্ঞাপন করেছে। তাদের আস্থা ফেরৎ পেতে হ'লে আমার সঙ্গে আপনাকে হাত মেলাতে হবে।"

"কোন সর্তে? আপনি মন্ত্রীসভায় আসতে চান?"

"না। সুদর্শন দুবে ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল এক মন্ত্রীসভায় থাকতে পারে না। এক মন্ত্রীসভার দু'জন নেতা হ'তে পারে না। তা ছাড়া, আমি এই বেশ আছি। রাজত্ব করি না, রাজা তৈরী করি। দায়িত্ব নেই, সমালোচনার অধিকার রয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী হবার চেয়ে এ অনেক আরামের। আমার সর্ত অন্য।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নীরব দেখে সুদর্শন দুবে বলে চললেন:

"সর্ত এমন কিছু নয়। আপনি এবং আমি একসঙ্গে বিবৃতিতে ঘোষণা করব যে, এর পরে প্রাদেশিক শাসনের বড় বড় ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী সর্বদা প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন।"

"অর্থাৎ আপনি আমাকে পরিচালিত করবেন!"

"অত বড় স্পর্ধা আমার নেই, কোশলজী। ক্ষমতাও আমার সামান্য। এই সামান্য ক্ষমতা আমি প্রদেশের কল্যাণে বিনিয়োগ করতে চাই। আমাব নিশ্চিত বিশ্বাস, আমার পরামর্শ গ্রহণ করলে আপনি লাভবান বই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না।"

সুদর্শন দুবে উঠলেন। জোড় হাতে নমস্কার ক'রে বললেন, "প্রস্তাবটা ভেবে দেখবেন। আজ সন্ধ্যায় বা কাল সকালে আপনার টেলিফোন প্রত্যাশা করব।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দ্বারপথ পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন সুদর্শন দুবেকে।

গাড়ীতে ব'সে, গাড়ী ছাড়বাব আগে, সুদর্শন দুবে ব'লে উঠলেন, "ভুলবেন না, কোশলজী, আমাদের পিতামহ দু'জনেই পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ফটক থেকে ফিরে আসতে আসতে ভাবলেন, "ব্রাহ্মণের বংশধর, ব্রাহ্মণ হ'য়েও আমরা রাজা। না ব্রাহ্মণ, না ক্ষত্রিয়, না বৈশ্য। আমরা সব এক একজন বিশ্বামিত্র।"

সুদর্শন দুবের সর্তগুলি মনে পড়তে তাঁর নাসিকা ঈষৎ কুঞ্চিত হ'ল। সুদর্শন খুব চতুর, কিন্তু বুদ্ধি তাঁব অপ্রচুর। যাঁদের নিয়ে তিনি দল গড়েছেন, তাঁদের তিনি খুব ভাল ক'রে জানেন না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁদের বরং অনেক বেশি জানেন।

দুই

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পূজার বেশবাস বদল ক'রে শুভ্র খদ্দরের ধুতি ও কুর্তা পরিধান ক'রে প্রভাতী জলযোগের জন্যে প্রস্তুত হলেন। জলযোগ ঠাকুর-বেয়ারা সাজিয়ে দেয় খাবার ঘরে; উপস্থিত থাকেন পরিবারের পুরুষরা সবাই, মেয়েদের কেউ কেউ এবং একান্ত নিকটবর্তী কোনও কোনও রাজনৈতিক কর্মী। কদাপি কখনও নিমন্ত্রিত হন অন্তরঙ্গ বন্ধু বা সহকর্মী।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পাঁচ ছেলে, তিন মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে হ'য়ে গেছে, তারা শ্বশুরালয়ে। ছেলেদের মধ্যে চারজন বাবার সঙ্গে থাকে বড় ছেলে অম্বিকাপ্রসাদ তিনবার আইন পরীক্ষায় ফেল ক'রে চতুর্থবার দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। বর্তমানে সে আইন কলেজে অধ্যাপক; হাইকোর্টেও যাতায়াত করে। দ্বিতীয় ছেলে শ্যামাপ্রসাদ কাপড়ের ব্যবসায়ে ভাল উপার্জন করছে। চতুর্থ ছেলে সূর্যপ্রসাদ রাজনীতি করে; বর্তমানে বিধান সভার সদস্য। পঞ্চম ছেলে চন্দ্রপ্রসাদ কিছু করে না। বিলাসপুর শহরে তার পরিচয়, সে মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে।

তৃতীয় ছেলে দুর্গাপ্রসাদ বাবার সঙ্গে থাকে না। বিদ্রোহের অপরাধে সে নির্বাসিত। পড়াশুনায় ভাল ছিল, একটানে এম. এ. পর্যন্ত পাস ক'রে গিয়েছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের তাকে নিয়ে অনেক আশা ছিল। ছেলেদের সবাকার চেহারা সুন্দর, কিন্তু দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না। গৌরবর্ণ ছ' ফুট দু' ইঞ্চি দেহে ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভেবেছিলেন, তাকে এম. এল. এ. বানাবেন; দু-তিন বছরের মধ্যে উপমন্ত্রী ক'রে নেবেন। যে কয়জন উপমন্ত্রী আছেন তাঁদের সবার একত্রিত যোগ্যতার চেয়ে দুর্গাপ্রসাদের যোগ্যতা তিনি বেশি মনে করতেন।

কিন্তু দুর্গাপ্রসাদ বিদ্রোহ ক'রে বসল। তার রাজনীতি বিপজ্জনক পথ ধরল। প্রথমে সে সমাজতন্ত্রী দলে গিয়ে ভিড়ল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিশেষ বিব্রত হলেন না। সমাজতন্ত্র ত কংগ্রেসের আদর্শ, যদি কেউ পারে কংগ্রেসই পারবে তাকে বাস্তব রূপ দিতে। নিজে তিনি সমাজতন্ত্র ব্যাপারটা কি, ভাল জানেন না; কিতাব পড়ার সময় কোথায়? তবে তিনি যে উদয়াচলকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাতে কোনদিন তাঁর সন্দেহ জাগে নি। কেননা, সমাজতন্ত্র যখন কংগ্রেসের আদর্শ, এবং তিনি যখন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী, তখন তাঁর নেতৃত্বে এবং সরকারী উদ্যোগে সমাজতন্ত্রের পথ নিশ্চয় তৈরী হচ্ছে। এমন সহজবোধ্য ব্যাপার নিয়ে এর চেয়ে বেশি মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

দুর্গাপ্রসাদ যখন সমাজতন্ত্রী দলে ভিড়ল, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভাবলেন, ছেলেটার বুদ্ধি আছে। কয়েকমাস বিরোধী দলে কাজ করলে লোকের নজরে পড়বে, জনপ্রিয় হবে। তা ছাড়া এ-কালে তরুণদের রাজনীতি করতে গেলে কিছুটা "প্রগতিবাদী" হওয়া দরকার। তাই বাধা দেবার প্রয়োজন মনে করেন নি। কিন্তু মাস ছয়েক পরে একদিন দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি দেখলেন, ছেলের মতিগতি একেবারে ভাল নয়। সে কংগ্রেসে যোগ দিতে রাজী নয়।

কারণ?

কারণ, কংগ্রেস নাকি আদর্শচ্যুত! তার মুখে কংগ্রেস সরকারের —যার মাথা তিনি নিজে—যে তীব্র নিন্দা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শুনতে পেলেন বিরোধী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় তার কাছে নরম হাতবুলানি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্ব'লে গেল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের।

"তুমি সন্তান হয়ে পিতৃনিন্দা করছ! তুমি কুসন্তান।"

দুর্গাপ্রসাদ চুপ ক'রে গিয়েছিল।

"বল, তুমি কংগ্রেসে আসবে কি না?"

"না।"

"তোমার ভবিষ্যৎ ভাল হ'ত।"

"অমন ভালয় আমার লোভ নেই।"

"তিন বছরে আমি তোমায় উপমন্ত্রী করতে পারতাম।"

"তা অত্যন্ত অন্যায় হত।"

"যে পার্টিতে তুমি আছ তার ভবিষ্যৎ কি?"

"সংগ্রাম।"

"তুমি মূর্খ। দেশে আজ, আরও অনেকদিন, কোনও সংগ্রামের সম্ভাবনা নেই। যে সংগ্রাম আমরা করেছি তার পলিমাটি দেশকে উর্বর করেছে। দেশ এখন গঠনের পথে, সংগ্রাম ক'বে তোমরা কিছু বদলাতে পারবে না।"

"তবু করব।"

"জেলে যেতে হবে।"

"যাব।"

"তবে তাই যেয়ো।" চেঁচিয়ে উঠেছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

কথাবার্তা সেদিন আর এগোয় নি।

দুর্গাপ্রসাদ কিছুদিনের মধ্যে আবার অঘটন ঘটিয়ে বসল।

এমনি এক প্রভাতী জলযোগের সময় হঠাৎ সে ঘরে ঢুকল। এ বাড়ীতেই সে থাকত, কিন্তু সচরাচর তাকে পারিবারিক আসরে দেখা যেত না। সকালবেলা বেরিয়ে যেত, ফিরত অনেক রাত্রে।

পুরি মুখে দিতে গিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুহূর্তের জন্য থেমে গেলেন।

দুর্গাপ্রসাদ এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

"আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল, পিতাজী।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন।

"আমি একটা শুভকাজে আপনার অনুমতি চাইছি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুরিতে কামড় দিলেন।

"আমি আগামী কাল বিবাহ করছি, পিতাজী।"

নিস্তব্ধ ঘরের নৈঃশব্দ্য চূর্ণ ক'রে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ

"কি করছ ?"

"বিবাহ, পিতাজী। সুরেশ তেওয়ারীকে আপনি চেনেন। তাঁর মেয়ে কমলাকে।"

"সে ত বিধবা।"

"মাত্র এক বছর তার স্বামী জীবিত ছিল।"

"সে ত তোমাদেব পার্টিতে বেলেল্লাপনা ক'রে দিনরাত ঘুরে বেড়ায়।"

"কমলা খুব ভাল কর্মী, পিতাজী।"

"তুমি তাকে বিবাহ কবছ ?"

"জী, পিতাজী।"

"তাইতে আমার মত চাও ?"

"আপনি অনুমতি দিলে ভাল হয়।"

"না দিলে ?"

"কমলাকে আমি কাল বিবাহ করছি, পিতাজী।"

"তোমার মা'র মত পেয়েছ ?"

"মত পাই নি। তবে তাঁর অমতও নেই।"

হঠাৎ কিছু বলতে পারলেন না কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। পুবিখানা চিবিয়ে খেলেন। তারপর চায়ের পাত্রে চুমুক দিলেন।

এবার বললেন, "তুমি আজই, এখুনি, এই মুহূর্তে আমার বাড়ী থেকে বিদায় নেবে। একটা অসচ্চরিত্র বিধবাকে পুত্রবধূ আমি করতে পারি না। তুমি কদাপি আমার সামনে আসবে না।"

পাঁচ ছেলের মধ্যে তাই চারজন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সঙ্গে বাস করে। মাত্র একজন, দুর্গাপ্রসাদ, এ বাড়ীর কেউ নয়। শহরের বাইরে যে অঞ্চলে তিনটে কাপড়ের কল, সেখানে ছোট্ট দোতলা বাড়ীর এক-তলায় সে বাস করে। সে আর তার স্ত্রী কমলা আর তাদের একটি কন্যা, সুভদ্রা।

আজ প্রভাতী জলযোগে যোগদান করতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উপস্থিত হয়ে দেখলেন, চার পুত্র ইতিমধ্যে আসন গ্রহণ করেছে। অম্বিকা-প্রসাদের স্ত্রী রাধাও এসে বসেছে। ঠাকুর-বেয়ারা প্রাতরাশ সাজিয়ে রেখেছে বৃহদাকার টেবিলে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঘরে ঢুকে একবার চতুর্দিকে তাকিয়ে নিলেন; এটা তাঁর অভ্যাস। কোনও ঘরে, সভায়, আসরে, আলোচনায় উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে তিনি চতুর্দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতিটা বুঝে নেবার চেষ্টা করেন।

আজ খাবার ঘরের পরিস্থিতি অনুভব ক'রে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিশেষ খুশী হলেন না। নিঃশব্দে টেবিলের মাঝখানে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসলেন। রাধা এক গ্লাস সাম্ভরার রস এগিয়ে দিল। নিঃশব্দে পান করলেন।

কর্ণ ফ্লেক্‌স্ মিলিয়ে এক বাটি দুধ পান করেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রাতরাশের সময়। দুধ সামনে রেখে তিনি প্রথম কথা বললেন:

"অম্বিকাপ্রসাদ?"

"পিতাজী।"

"তোমার চাকরি কি পার্মানেণ্ট, না এখনও টেম্পোরারী?"

"গত বছর পার্মানেণ্ট হয়েছি। কিন্তু—"

"কিন্তু এখনও সেই লেকচারারই রয়ে গেছ।"

"জী। কিছুতেই রীডারের পোস্টটা দিচ্ছে না।"

"পাবার যোগ্যতাও তোমার নেই।"

অম্বিকাপ্রসাদ চুপ করে গেল।

"দিচ্ছে না কে?"

"দুর্গাভাই।"

"হু। শক্ত মানুষ। তাঁর ছেলেকে তিনি আজ পর্যন্ত কোনও রকমের মদদ করেন নি।"

"আপনার নতুন ক্যাবিনেটে দুর্গভাই যোগ দেবেন ?"

বিষণ্ণ হাসলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। "আমার নতুন ক্যাবিনেট জন্মাবে কি না তার ঠিক নেই, অম্বিকাপ্রসাদ। তাই দেখে নিতে চাই, তোমরা কে কোথায় দাঁড়াতে পেরেছ। আমার আর কি ? বৃদ্ধ বয়সে এ সব ঝামেলা আর ভাল লাগে না। একমাত্র দেশের প্রয়োজনে, উদয়াচলের প্রয়োজনে, রাজকার্যের গুরুভার অকৃতজ্ঞ দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য বহন করা।"

কথাগুলি বেশ শোনাচ্ছিল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কানে। হঠাৎ মনে হ'ল, কেউ বুঝি শুনছে না। দেখতে পেলেন, রাধা ঠাকুরকে নির্দেশ দিচ্ছে; অম্বিকাপ্রসাদ সংবাদপত্র পাঠ করছে; শ্যামাপ্রসাদ, সূর্যপ্রসাদ ও চন্দ্রপ্রসাদ চুপি চুপি কিছু একটা অলোচনায় রত।

গলা চড়িয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলে উঠলেন, "লেকচারারও তুমি হ'তে পারতে না, তোমার বাবা মুখ্যমন্ত্রী না থাকলে।"

চমকে উঠে অম্বিকাপ্রসাদ চুপ ক'রে গেল।

"কত মাইনে পাও ?"

"তিন শ বত্রিশ টাকা।"

"তোমার ত তিনটি সন্তান, না ?"

.অম্বিকাপ্রসাদ রাধার দিকে তাকিয়ে বলল, "জী"

রাধা চতুর্থবার মা হ'তে চলেছে!

"তোমার দিন চ'লে যাবে। এ দরিদ্র দেশে তিন শ বত্রিশ টাকা কম নয়। খাতাপত্র দেখেও ত কিছু পেতে পার।"

এবার মনযোগ পড়ল শ্যামাপ্রসাদের ওপর।

"ব্যবসা কেমন চলছে ?"

"মন্দ নয়।"

"বাপের রাজত্ব চলে গেলে এ রকম চলবে ?"

"না।"

"উঠে যাবে ?"

"মনে হয় না।"

"আমি তোমাকে ব্যবসা গড়তে কোনও সাহায্য করেছি?"

"না।"

"কাউকে বলেছি তোমায় সাহায্যের জন্যে?"

"না।"

"পারমিট পাইয়ে দিয়েছি তোমাকে?"

"না।"

"সরকারী ধার পাইয়ে দিয়েছি?"

"না।"

"তা হলে আমি মুখ্যমন্ত্রী না থাকলে তোমাব ব্যবসার ক্ষতি হবে কেন?"

"বা রে! হবে না?"

শ্যামাপ্রসাদ এর বেশি কিছু বলল না। পিতাজীকে সে জানে। আর কিছু বলা তিনি পছন্দ করবেন না।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "সুখনলাল কটন মিলসের এজেন্সী পেয়ে গেছ?"

"বছর খানেক হল।"

"তাহলে তোমার ভালই চলে যাবে।"

"যদি এজেন্সী ধ'রে রাখতে পারি।"

"হ্যাঁ। যদি নিজের যোগ্যতায় কিছু ক'রে উঠতে পারো।"

এর বেশি এগোলেন না। হঠাৎ নজর পড়ল চতুর্থ পুত্রের ওপর।

"সূর্যপ্রসাদ?"

"পিতাজী!"

"তোমার খবর কি?"

"খবর কিছু আছে।"

"বল?"

"এখানেই বলব ?"

"বলতে পার। এমন কিছু খবর তুমি সংগ্রহ করতে পারবে বলে মনে করি না যা তোমার ভাই-রা জানলে আমার বিশেষ ক্ষতি হবে।"

সূর্যপ্রসাদের গৌরবর্ণ মুখ অপমানে রক্তিম হ'ল।

সে বলল, "দুর্গাভাইজী দিল্লীতে এক জরুরী পত্র পাঠিয়েছেন।"

মৃদু হেসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "জানি।"

সূর্যপ্রসাদ দমে গেল। তবু বলল, "পত্রের বিষয়বস্তু জানেন ?"

"জানি। মুসাবিদা আমিই করে দিয়েছি।"

সূর্যপ্রসাদের মুখে আর কথা এগোল না।

"একটা খবর তুমি আমায় দিতে পার, সূর্যপ্রসাদ ?"

"কিসের খবর, পিতাজী ?"

"হরিশংকর ত্রিপাঠীর বাড়ীতে পরশু রাত্রে একটি গোপন বৈঠক হয়েছিল, জান ?"

"জানি।"

"কারা কারা উপস্থিত ছিলেন জান ?"

"সবাকার নাম জানি না।"

"ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের একটি মেয়ে ওখানে এসেছিল জান ?"

"জানি।"

"সরোজিনী সহায় তার নাম ?"

"তা জানি না।"

"পার্টি না ভাঙ্গতেই মেয়েটি বিদায় নেয় ?"

"জানি না।"

"সুদর্শন দুবের গাড়ীতে সে চ'লে যায়।"

"আচ্ছা।"

"সে গাড়ীতে তিনজন পুরুষ ছিলেন। সুদর্শন দুবে, হরিশংকর ত্রিপাঠী, এবং আর একজন।"

সূর্যপ্রসাদ চুপ ক'রে রইল।

হঠাৎ টেবিলে টোকা মেরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলে উঠলেন: "এই যে তৃতীয় ব্যক্তি—দি মিসিং থার্ড ম্যান—ইনি কে ছিলেন বার করতে পার?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে চোখে সূর্যপ্রসাদের চোখে তাকিয়ে রইলেন সে দৃষ্টি চতুর্থ পুত্র সহ্য করতে পারল না। চোখ নামিয়ে কিছুক্ষণ সে ব'সে রইল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

বক্র হাসির সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "চেষ্টা করে দেখ। ছ'ঘণ্টা সময় আছে! ছ'ঘণ্টা পরে মাধব দেশপাণ্ডে আমার কাছে আসবেন। তার আগে খবরটা আমার চাই।"

সূর্যপ্রসাদ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যেতে, তিনি তাঁকে ডাকলেন।

"শোন।"

সূর্যপ্রসাদ কিছুটা এগিয়ে এল।

"তোমার অগ্রজ দুর্গাপ্রসাদকে মনে আছে।"

সূর্যপ্রসাদ মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

"সেই-যে আমারই ছেলে দুর্গাপ্রসাদ, তোমার বড় ভাই! যে আমার বিরুদ্ধে দিনরাত প্রচার করছে; যার কুলটা স্ত্রী কাপড়-কলের মজদুরদের ক্ষেপিয়ে হরতালের চেষ্টা করছে। তাকে মনে আছে?"

"জী।"

"উদয়াচলে মন্ত্রীসভার নেতৃত্ব যাতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের হস্তচ্যুত হয় এ জন্যে আজ তারা মজদুরদের মিছিল বার করবে।"

"জানি।"

"মিছিল বার হবে বারোটার সময়। শহরের বড় বড় রাস্তা ঘুরে গান্ধী পার্কে সন্ধ্যাবেলা তাদের সভা হবে।"

"জানি, পিতাজী।"

"আরও নিশ্চয় জান, এ মিছিলের পেছনে সুদর্শন দুবের সমর্থন ও সহায়তা আছে?"

"শুনেছি।"

"মজত্বদের মিছিল ও সভাকে আমি ভয় করি না। কিন্তু সুদর্শন ত্বেব গোপান চেষ্টায় জনসভায় কিছু সাধারণ মানুষের আগমন হ'তে পারে।"

"শুনেছি, এ সভার মারফৎ ওঁরা হাইকমাণ্ডকে জানিয়ে দিতে চায় যে উদয়াচলের জনসাধারণ—।"

"বলতে গিয়ে থামলে কেন? জনসাধারণ আমাকে চায় না, এই ত?"

"জী।"

"জনসাধারণ কাকে চায়?"

সূর্যপ্রসাদ চুপ করে রইল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলে চললেন: "জনসাধারণ কে, কারা, কোথায় তাদের অস্তিত্ব? কারখানার মজুর? মাঠের চাষী? ছাপোষা কেরাণী? স্কুলের শিক্ষক? কলেজ-পালান ছেলে-ছোকরাদের দল? তারা রাজনীতির কি জানে? তারা পারবে রাজত্ব করতে? তারা জানে কি তারা চায়, কাকে তারা চায়? তারা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে কতটুকু জানে? সুদর্শন ত্বেকে কি তারা একটুও চেনে? না, মাধব দেশপাণ্ডেকে, বা হরিশংকর ত্রিপাঠীকে? তারা চাক্ কি না চাক্, রাজত্ব আমরাই করব—হয় আমি, নয় হরিশংকর ত্রিপাঠী, নয় মাধব দেশপাণ্ডে, নয় সুদর্শন ত্বে। আর নয়ত সবাই একসঙ্গে, যেমন এতদিন ক'রে এসেছি।"

সূর্যপ্রসাদ বলল, "ঠিক কথা।"

"জনসভা, অতএব, জনমত নয়। জনমতে রাজত্ব চলে না।"

"তবু গণতন্ত্রে—"

"তোমার সঙ্গে রাজনীতি আলোচনার সময় নেই আজ। তা ছাড়া, তুমি এসব বুঝবেও না। এম. এল. এ. হয়েছ বাপের জোরে; আজ আমার গদি গেলে ওটুকুও তোমার থাকবে না। জীবনে এর চেয়ে বেশি কিছু করতেও পারবে না।"

সূর্যপ্রসাদ মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

"যা বলছি শোন। মোহান্ত গণেশপ্রসাদের বাড়ী চলে যাও। তাঁকে বলো আমার সঙ্গে ছুটোর সময় যেন দেখা করেন। নিজে গিয়ে বলবে। টেলিফোন করবে না।"

"জী।"

"আর বলবে, মিছিল ভাঙ্গবার দরকার নেই। মিছিল, সভা, সব নির্বিঘ্নে, শান্তিপূর্ণ ভাবে হয়ে যাক্।"

"যে আজ্ঞা, পিতাজী।"

"আরও বলবে, পরশুদিন পাল্টা মিছিল ও জনসভা হবে। তার ব্যবস্থা অনেকখানি এগিয়েছে। মোহান্তজীকে সব দায়িত্ব নিতে হবে।"

হাত-ঘড়িতে চোখ রেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রাতরাশ শেষ করলেন। উঠে ঘর থেকে বার হবার সময় কনিষ্ঠপুত্র চন্দ্রপ্রসাদকে দেখতে পেলেন।

"কি হে, রাজকুমার?"

চন্দ্রপ্রসাদ উঠে দাঁড়াল।

"হুকুম করুন, মহারাজ।"

হেসে ফেললেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

"কেমন চলছে?"

"অন্তিম মুহূর্তটা মন্দ কাটছে না।"

"কিছু কাজকর্ম করবে?"

"না।"

"চলবে এমনি করে?"

"চলবে, পিতাজী, চলবে।"

তার হাসিখুশি আমুদে মুখখানা দেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ভাল লাগল। ছোট ছেলেটা কোনও কাজের নয়! দিন-রাত অকাজ-কুকাজ ক'রে বেড়ায়। তবু ছেলেদের মধ্যে ওর প্রতি কেমন দুর্বলতা

বোধ করেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। তৃতীয় সন্তান দুর্গাপ্রসাদ বিদায় নেবার পব সে দুর্বলতা বেড়ে গেছে।

তিনি পা বাড়াতে চন্দ্রপ্রসাদ আবও বলে বসল—

"নিশ্চিন্ত হোন, পিতাজী। উদয়াচলেব গদিতে আপনাকে সবিযে বসতে পারে এমন কেউ নেই।"

চলতে চলতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "একজন আছেন।"

"তিনি গদিতে বসবেন না, পিতাজী।" চন্দ্রপ্রসাদ চটপট জবাব দিল, "আপনাব কোনও ভয নেই।"

কৃষ্ণদ্বৈপাযন পাশেব দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হবার মুখে চন্দ্রপ্রসাদ আবাব বলল, "আপনাব কোনও কাজে আমি লাগতে পারি না, পিতাজী?"

কৃষ্ণদ্বৈপাযন প্রশ্ন কবলেন, "তুমি?"

"আশ্চর্য কথা বলে ফেলেছি, পিতাজী।"

"তোমাব ভাইদেব মধ্যে একমাত্র তুমিই মুখ্যমন্ত্রীব ছেলে। আব সবাব কিছু একটা পবিচয আছে। তোমাব এ ছাড়া অন্য পবিচয় নেই।"

"তাই ত, পিতাজী, আপনাব মুখ্যমন্ত্রীত্বে আমাব স্বার্থ সবচেয়ে বেশী।"

"কি সাহায্য তুমি আমাব কবতে পাব? তোমার একমাত্র কাজ দোকানে ঘুবে জিনিস কেনা—আব বিলে সই মেরে চ'লে আসা।"

"সে সব বিল আপনার কাছে আসে, পিতাজী?"

"আসে নিশ্চয়। দোকানদার বিনি পয়সায় তোমাকে জিনিস দেবার লোক নয়!"

"বড় দুঃখ পেলাম, পিতাজী। আমাব ধারণা ছিল, ওসব বিলেব বেশিব ভাগই আপনার কাছে আসে না।"

এ প্রসঙ্গ চাপা দিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

বললেন, "তোমাদের চার ভাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছ না কেন?"

"পা কমজোর, পিতাজী। আকাঙ্ক্ষার বোঝা বইতে পারে না।"

"শোন, চন্দ্রপ্রসাদ।"

"বলুন!"

"তোমার কি মনে হয়?"

"আমার?"

"হ্যাঁ, তোমার।"

"আমি ত রাজনীতি বুঝি না, পিতাজী।"

"তাই ত তোমাকে জিজ্ঞেস করছি!"

"একটা কথা আমি বুঝি। বলতে পারি, যদি শুনতে চান।"

"বল।"

"মুখ্যমন্ত্রী থাকা আপনার দরকার। এবং আপনাকে থাকতে হবে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তড়িৎদৃষ্টিতে চন্দ্রপ্রসাদের দিকে তাকালেন। মুখে তাঁর খুশির ঝিলিক্ খেলে গেল। কঠোর সংকল্পে তখ্‌ন মুখ কঠিন হ'ল।

"একটা কাজ করবে তুমি?"

"বলুন।"

"পাণ্ডেজীকে খবর দেবে, কাল সকালে যেন আমার সঙ্গে দেখা করেন।"

"রাজ জ্যোতিষীকে?"

"আটটা পনের মিনিটে।"

"রাজনীতিতে জ্যোতিষশাস্ত্রও চলে নাকি পিতাজী?"

"রাজনীতিতে সব চলে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঘর থেকে দ্রুত পদক্ষেপে বেরিয়ে বারান্দা অতিক্রম ক'রে লন পেরিয়ে দপ্তর ঘরের দিকে হেঁটে চললেন। প্রতি পদক্ষেপে বিজয়ের সংকল্প।

তিন

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বিশেষ তাগাদা না থাকলে, পূজা ও প্রাতরাশের আগে খবরের কাগজ পড়েন না। মাঝে-মধ্যে পড়তে হয়, যখন প্রাদেশিক অথবা জাতীয় রাজনীতি অত্যন্ত গরম হয়ে ওঠে। তখনও, সাধ্যমত, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেডলাইন বা মোদ্দা খবরের চেয়ে বেশি আমদানী ক'রে প্রভাতী-মনের ক্ষণস্থায়ী স্থৈর্য্য নষ্ট করতে চান না।

সারাজীবন রাজনীতি চর্চার ফলে এ নিয়ে আন্তরিক উত্তেজনা তাঁর কম; এজন্যে রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী, বন্ধু ও শত্রুরা তাঁকে বলে, "কোল্ডেষ্ট কাষ্টমার", সবচেয়ে ঠাণ্ডামাথা খদ্দের। মনের অনেকখানি জুড়ে একটি রসিক শিল্পী ব'সে আছেন, তাই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে অনেক সময় দরিদ্র, নগ্ন ফাঁকি দেখতে পান, নিজের পতন সম্ভাবনাও সব সময়ে তাঁকে অস্থির করে না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেন, "পতিতাবৃত্তির পর রাজনীতি মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন পেশা। আমাদের উত্তরাধিকার নিষিদ্ধ-ফল-তৃপ্ত আদম সাহেবের থেকে বহুধারায় প্রবাহিত। এ রকম পুরাতন খেলা আর দ্বিতীয় নেই। এ খেলায় কোন নিশ্চিত পথ নেই, নির্ধাবিত নিয়ম নেই। রোজকার পথ, নিয়ম, নীতিরীতি রোজ তৈরী করতে হয়। এ খেলায় যে সর্বদা হাসিমুখে হার খেতে তৈরী নয়, সে জিততে পারে না।"

বলেন বটে, কিন্তু হাসিমুখে হারতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রস্তুত নন। আজ যে রাজনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে তিনি যুধ্যমান, তার সমাধান করবার জন্যে যতখানি, যত রকমের সংগ্রাম দরকার তার বেশিই তিনি ক'রে যাচ্ছেন। কিন্তু অন্তরের গভীরে তাঁর অন্ততর এক সত্তা পরাজয়ের সম্ভাবনা স্বীকার ক'রে চতুর্দিকের ভবিষ্যৎ অবস্থা

বুঝে নেবার নিরুত্তেজক কাজে ব্যস্ত। হেরে গেলে, পরাজয় থেকেও কতখানি জয় আদায় করা যেতে পারে তারও হিসেব হচ্ছে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অন্যতর সত্তায়।

মন্ত্রীসভায় ভাঙ্গন ধরার প্রথম দিনগুলিতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রভাতী সংবাদপত্রের জন্যে আগ্রহ বোধ করতেন। এখন সে আগ্রহ অনেকখানি স্তিমিত। এখন তিনি জানেন, কোন্ কাগজ কি খবর ছাপবে, কি মন্তব্য লিখবে। শহরে দুখানা ইংরেজী দৈনিক। একখানা তাঁর নিজের, অন্যখানা বাইরে থেকে অদলীয় হ'লেও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানেন আসলে তার কর্ণধার মাধব দেশপাণ্ডে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ইংরেজী দৈনিক "মর্ণিং টাইমস্" ; মাধব দেশপাণ্ডের দৈনিকের নাম "পিপল্"। তা ছাড়া বিলাসপুরেই আটখানা হিন্দী অথবা মারাঠী দৈনিক আছে ; সমস্ত উদয়াচলে দৈনিকের সংখ্যা ছাব্বিশ। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর প্রদেশ উদয়াচল। কোনও দৈনিকেরই বিক্রী খুব বেশি নয়। সবচেয়ে প্রভাবশীল হিন্দী পত্রিকা "উদয়াচল সমাচারের" কাট্তি দশ হাজারের কাছাকাছি। অতএব, এদেশে বাইরের সংবাদপত্র এখনও আভিজাত্য দাবি করে। বোম্বাই থেকে, দিল্লী, এলাহাবাদ ও কলকাতা থেকে বিমানে কাগজ এসে পৌছয়; অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা সে সব কাগজ পাঠ করে।

আপিস-বাড়ীতে মন্থর পদক্ষেপে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এসে যখন পৌছালেন তখন তার বেশ-বাসে, মুখের চেহারায়, চোখের দৃষ্টিতে উদ্বেগ-অনিশ্চয়তার বিশেষ চিহ্ন নেই। ধব্‌ধবে খদ্দরের মিহি ধুতির সঙ্গে রং মেলান কুর্তা ; পায়ে হরিণ-চামড়ার চটি। মাথায় গন্ধীটুপি। দাড়িকামান মুখে সযত্নে সজ্জিত নিশ্চিন্ত প্রশান্তি। চোখের দৃষ্টিতে বরং কিছু কৌতুকবোধ—জীবনের রহস্য না হোক্, জীবন-যাত্রার রহস্য বুঝতে পারার কৌতুক।

দপ্তর-ঘরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ফরাসে বসলেন। নজর পড়ল সুবিন্যস্ত

পত্রিকারাশির ওপর। তাঁর ব্যক্তিগত বেয়ারা দীনদয়াল রোজকার মত সাজিয়ে রেখেছে। সেক্রেটারীদের মধ্যে যার সকালে আসবার কথা সে এখনও আসে নি। তিনি তাকে ন'টার সময় আসতে বলেছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কাগজগুলি টেনে নিলেন।

প্রথমে দেখলেন "পিপ্‌ল"। সবচেয়ে ফলাও ক'রে যে রাজনৈতিক "সংবাদ" পরিবেশিত হয়েছে তা কৃষ্ণদ্বৈপায়নেব মনে বিশেষ রেখাপাত কবল না। সংবাদপত্র যাবা তৈরী কবে তাদের কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ভালই জানেন। "পিপ্‌ল"-এর বিশেষ প্রতিনিধি গতকাল তার কাছে এসেছিলেন। তিনি কিছু "খবর" দিতে পারেন নি। বিধানসভাব কংগ্রেসী দল আগামী কাল মিলিত হবেন নতুন দলাধিপতি নির্বাচনের জন্য। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেছিলেন, "আমি আজীবন কংগ্রেসের দাস। দেশের সামান্য সেবক। আমরা গণতন্ত্রে পূর্ণ বিশ্বাসী। দলের অধিকাংশ সদস্য যদি আমাকে চান তা হলেই আমি পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারি। তাঁবা চান কি না এ প্রশ্ন তাঁদের করুন, আমাকে নয়। আমার ধারণা—আমার ধারণা নয়, নিশ্চিন্ত বিশ্বাস, তাঁরা আমাকে চান। এ ধারণা ভুল না সত্যি আগামী কাল প্রমাণিত হবে।"

এই উক্তিকে ভাঙ্গিয়ে বিশেষ প্রতিনিধি তু' কলম• নিবন্ধ রচনা করেছেন।

"মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল আমাকে বলেছেন, কংগ্রেসী অধিপতি হিসেবে তিনি যে পুনর্নির্বাচিত হবেন সে বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহ নেই। তিনি বলেছেন, দলের অধিকাংশ সদস্য আমাকে চান, এ আমার নিশ্চিন্ত বিশ্বাস। কিন্তু এ বিশ্বাসেব ভিত্তি কি, তা তিনি বল্‌তে রাজী হন নি।

"তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ অবশ্য বলেন, ভিত্তি একমাত্র শ্রীকোশলের রাজ-নৈতিক উচ্চাশা। মুখে তিনি যাই বলুন, গদী ছাড়তে তিনি রাজী নন; গদী যাতে ছাড়তে না হয় সেজন্য যা-কিছু করবার তিনি করছেন।

"তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রীসভার সদস্য শ্রীনিরঞ্জন পরিহার রাজধানীতে গিয়ে হাই কমাণ্ডের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত।

"বিলাসপুরের তপ্ত রাজনৈতিক আবহাওয়া বর্তমানে নেপথ্য-গোপন লেন-দেনের দর কষাকষিতে দূষিত হয়ে উঠেছে। ওয়াকিবহাল মহলে শোনা যাচ্ছে শ্রীকোশল মন্ত্রীত্ব, উপমন্ত্রীত্ব ও অন্যান্য দাক্ষিণ্যের লোভ দেখিয়ে দলের ওপর নিজের নেতৃত্ব কায়েম রাখবাব চেষ্টা করছেন।

"তাঁব প্রতিপক্ষও অবশ্য অত্যন্ত তৎপব হয়ে উঠেছেন। এঁদেব ধাবণা, হাই কমাণ্ড যদি শ্রীকোশলেব পক্ষে হস্তক্ষেপ না করেন, বিধান সভার কংগ্রেসী সদস্যগণ যদি স্বাধীন ভাবে ভোট দিতে পারেন, তা হ'লে শ্রীকোশলকে অন্ততঃ কিছুদিনেব জন্য রাজনৈতিক জঙ্গলে বনবাসী হ'তে হবে, যদি না দিল্লীর বড়কর্তারা উদয়াচলে দীর্ঘকালীন সুশাসনেব পুরস্কার হিসাবে তাঁব জন্যে অন্য কোনও গদী তৈরী করেন।"

মৃদু হেসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অন্য খবরে চোখ রাখলেন। বিশেষ কিছু ঘটছে না কোথাও। প্রধানমন্ত্রী আসাম থেকে আজ দিল্লী ফিরবেন; তাঁর মনে পড়ল, নিরঞ্জন পরিহার নিশ্চয় আজ ট্রাংক কল করবে না। গতকাল তাঁর রিপোর্ট প'ড়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিরাশ হন নি। কাল প্রত্যূষে এয়ারপোর্ট থেকে সোজা সে তাঁর কাছে আসবে।

"পিপ্‌ল"-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে চোখ বুলিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বেশ মজা লাগল।

"আর কতদিন?" শিরোনামায় বিরোধী পত্রিকা তাঁকে সবিনয়ে অনুরোধ জানিয়েছে তিনি যেন স'রে দাঁড়ান। "শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল সামান্য মানুষ নন; তিনি এখনও, মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পরেও, উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী। দীর্ঘ ছয় বছর তিনি এ আসন

অলঙ্কৃত অথবা কলঙ্কিত ক'রে আছেন। এ ছয় বছরে উদয়াচলের উন্নতি একেবারে কিছু হয় নি, এমন কথা আমরা কখনও বলব না; তবে উদয়াচলের আকাশে প্রভাতেই যে অন্ধকার জ'মে আছে তা নিশ্চয় শ্রীকোশল মেনে নেবেন। এ অন্ধকার নেতৃত্বের অভাব; এ অভাব শ্রীকোশল পূর্ণ করতে চেয়েছেন গোপন ষড়যন্ত্রে, দাক্ষিণ্য বিতরণে, এবং বিভিন্ন উপদলের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে! তার ফলে নিজে তিনি উন্নতি করেছেন, তাঁর সন্তান-সন্ততি আত্মীয়-স্বজনদেরও খুব মন্দ দিন কাটে নি। কিন্তু উদয়াচলের বুকে প্রভাতেই অন্ধকার জমে উঠেছে।·· উদয়াচলের নরনারী কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করছে, আর কতদিন চলবে কে. ডি. কোশলের এই দুর্বিনীত অনাকাঙ্খিত রাজত্ব? আর কতদিন?"

হাসি চেপে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কাগজখানা রাখলেন।

এবার কাছে টানলেন "মর্ণিং টাইমস্"। সবাই জানে, এ তার নিজের কাগজ। এর "মালিক" এবং ম্যানেজিং এডিটর জ্যেষ্ঠপুত্র অম্বিকাপ্রসাদ; সম্পাদক, বর্তমানে, একটি বাঙ্গালী যুবক, সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজে এনেছেন কলকাতার প্রধান সংবাদপত্র থেকে। বছর পঁচিশেক বয়স, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ যুবক। এর আগে রাজনৈতিক চালাকি দেখিয়ে তিনি একজন মারাঠী সম্পাদক রেখেছিলেন বছর তিনেক। রাজ-নৈতিক কারণেই তাঁকে বিদায় দিতে হয়েছে।

"মর্ণিং টাইমস্"-এর রাজনৈতিক সংবাদ পাঠ করে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন খুশী হলেন। চ্যাটার্জী ছেলেটির বুদ্ধি আছে! রিপোর্টারদের দিয়ে কয়েকজন "সাধারণ মানুষে"র মুখে মুখ্যমন্ত্রীর অকুণ্ঠ প্রশস্তি সংগ্রহ করেছে। প্রথম পৃষ্ঠায় যে ছবি ছেপেছে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জীবনে তা প্রকাণ্ড মূলধন। বহুদিন আগে একদা তিনি পুলিসের লাঠি মাথায় নিতে গিয়েছিলেন, মাথায় না লেগে হাতে লেগেছিল। সৌভাগ্যবশতঃ কে যেন সে দৃশ্যের ফটো তুলে নিয়েছিল,

জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে তা ছাপান হয়েছিল। চেষ্টাচরিত্র কবে চ্যাটার্জি সে ছবি খুঁজে বাব কবেছে, বোম্বাই-এ বড় ছাপাখানায তার থেকে ব্লক তৈবী কবিয়েছে। এ ছবি আজ বেশ বড কবে ছাপিয়েছে সে কাগজেব প্রথম পৃষ্ঠায।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চোখেব সবটুকু জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে ছবিটা দেখলেন। পুলিসেব লাঠি যাব দেহে পড়েছে, তাকিয়ে দেখলেন, সে প্রায়-চল্লিশেব মানুষকে! সে যেন অনেক দিনেব, অনেক পুবাতন, অনেকখানি বিস্মৃত দিনেব আধ-অজানা অন্য-কোনও মানুষ!

চার

অন্যদিনেব, অন্যকালের, অন্যযুগের সে লোকটিকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আজ সকৌতুক মনোযোগে বার বার দেখলেন। প্রথমে মনে পড়ল না এ ছবির সঙ্গে কোনও দিন তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। তারপর স্মবণ হ'ল, বহুদিন আগে এই ভারতবর্ষে কোন জীয়নকাঠির যাদুস্পর্শে বিচিত্র নেশায় লক্ষ লক্ষ মানুষের স্তিমিত প্রাণ হঠাৎ আলোর বন্যায় জেগে উঠেছিল; বহু শত বছরের পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভেদ ক'বে সে বন্যা দেশকে পরম গৌরবে উদ্ভাসিত কবেছিল। সে আলোক-বন্যার বহুধা প্রবাহিত ধারায় বহু মানুষের অনেক কলঙ্ক কালিমা ধুয়ে সাফ হয়ে গিয়েছিল; জেগে উঠেছিল তাদের অন্তরে শুভ্র মনুষ্যত্বেব ঝিলিক্। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মনে পড়ল, কি ভাবে তিনি একদিন এ বন্যা স্রোতে ভেসে গিয়েছিলেন; কি ক'রে সেই বন্যা তাঁর জীবনকে ধুয়ে-মুছে সাফ ক'রে দিয়েছিল।

বিলাসপুব রাজধানী, কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম ও প্রথম নিবাস এখানে নয়। পিতা রামচরণ ছিলেন আসলে উত্তর প্রদেশের লোক; চাকুবী নিয়ে এসেছিলেন ছত্রিশগড়ের কোনও এক রাজ্যে। ক্রমে ক্রমে সহকারী দেওয়ানের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। সেই রাজ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম ও শিক্ষা। বি. এ. পাশ করে ওকালতি পড়বার জন্মে তিনি প্রথম বিলাসপুরে আসেন; পাঠান্তে কুষাণপুর শহরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। কুষাণপুর জিলা শহর, খুব বর্দ্ধিষ্ণু না হ'লেও, উদয়াচল প্রদেশের অন্যতম বড় শহর। কুষাণপুর থেকে পিতার কর্মক্ষেত্র দেশীয় রাজ্য বেশি দূরে নয়; উভয়ের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের আদান-প্রদান প্রশস্ত। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আইন ব্যবসা শুরু হ'ল কিছু কিছু ব্যাপারীদের নিয়ে, যারা কোনও না কোনও কারণে তাঁর পিতার কাছে অনুগত।

ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সদর আদালতে নাম করলেন ; পসার বাড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক উচ্চাশার জন্ম হ'ল। পিতার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে জিলা বোর্ডের সভাপতি হবার জন্যে প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রামে নামলেন। খুব একটা লড়তে হ'ল না। আগে থেকে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাঁর সমর্থন সংগ্রহ করেছিলেন।

জিলা বোর্ডের সভাপতি হয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বুঝতে পারলেন, ইংরেজ রাজত্বে রাজশক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করলে পুরস্কারের অভাব নেই। বুদ্ধিমান, সুদর্শন, অক্লান্তকর্মী ব'লে তাঁর সুনাম হ'ল, খাতির বাড়ল। পাঁচ বছর জিলা বোর্ডের সভাপতি থাকার পর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হ'তে চাইলেন। অনেক অর্থ-বিনিয়োগ, সরকারী সমর্থন, যথেষ্ট সুপরিকল্পিত ও সুচালিত নির্বাচন সগ্রাম সত্ত্বেও এবার তাঁর পরাজয় হ'ল। তিনি হেরে গেলেন কংগ্রেস দলের মনোনীত প্রার্থী ভবতরাম চৌবের কাছে।

এই পরাজয় কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জীবনধারাকে অনেকখানি বদলে দিল। যতটুকু বুদ্ধি তাঁর ছিল তাতে বুঝলেন যে, পরিবর্তনশীল ভারতবর্ষে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে প্রকৃত ক্ষমতা অর্জন করতে হ'লে ইংরেজের দাক্ষিণ্য ত্যাগ ক'রে জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত হ'তে হবে ; তাদের সংগ্রামের নেতৃত্ব করতে হবে। বুদ্ধিতে বুঝলেও হঠাৎ কোনও কিছুতে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত চপল বাষ্পাকুল হৃদয় তাঁর কোনওদিন ছিল না। সব সময় তিনি কাজ করবার আগে ভাবতেন, বিচার-বিশ্লষণে কর্মপন্থা স্থির ক'রে নিতেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বুঝলেন, রাজনৈতিক নেতৃত্বের জীবন গঠন করতে হ'লে আগে অনেক বিচার-বিশ্লেষণ দরকার। সবচেয়ে বেশি দরকার সময় ও সুযোগের নিপুণ নির্বাচন। তাঁর কবি-মন সায় দিল। পৃথিবীকে আমরা নাট্যশালা বলি ; প্রতি মানুষ নট বা নটী। অথচ জীবন-গঠনে নাটকীয় কলাকুশলতা যে কতখানি ফলপ্রসূ, তা ভেবে দেখি না।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জিলা বোর্ডের সভাপতি রয়ে গেলেন। কিন্তু দেখা গেল, ধীরে ধীরে তিনি অন্য কর্ম-পরিধি খুঁজছেন।

একবার জিলা শহর থেকে অন্যতম মহকুমা শহর পর্যন্ত রাস্তা তৈরী নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে রাস্তা চলবে, কিন্তু গ্রামবাসীব তাতে আপত্তি। বাস্তাব যে প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে তাতে তাদের চাষবাসের ক্ষতি হবে। রাস্তা চলবে চাষের মাঠ ও অদূববর্তী খালেব মাঝখান দিয়ে; বাস্তা তৈবী হ'লে চাষীরা সহজে খালের জল মাঠে টেনে আনতে পারবে না। এসব বিচার-বুদ্ধি চাষীদেব মাথায় নিশ্চয় খেলত না, যদি না জনৈক দেশ-কর্মীকে সরকাব এ গ্রামে অন্তরীণ ক'রে রাখতেন। অন্তরীণ থেকেও এই যুবকটি—নাম মোহনলাল সকসেনা—চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে চেষ্টা করছিল। চাষীদের নিয়ে জিলা বোর্ডে স্মারকলিপি পাঠাল রাস্তা-তৈরীর প্ল্যানে প্রতিবাদ জানিয়ে। স্মারকলিপিতে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, যদি তাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও রাস্তাব প্ল্যান বদলান না হয়, তা হ'লে চাষীরা সত্যাগ্রহ করবে।

জিলা বোর্ডের কয়েকটি সভায় চাষীদের স্মাবকলিপি নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। প্রায় সব সদস্য এবং ভাইস-চেয়ারম্যান রামকান্ত মিশ্র রাস্তাব প্ল্যান বদলাবার বিরুদ্ধে। তাঁরা বললেন, ইঞ্জিনীয়ররা প্ল্যান তৈরীর আগে সব দিক্ নিশ্চয় বিবেচনা করেছেন; এক গান্ধীমার্কা ছোকরার হুমকিতে সে প্ল্যান বদল করলে রাজত্ব অচল হয়ে যাবে।

একদিন দেখা গেল, জিলা বোর্ডেব সীমানা ছাড়িয়ে এ সমস্যা অনেক দূর চ'লে গেছে। বিলাসপুরের অন্যতম সংবাদপত্রে দ্বন্দ্বের খবর ছাপা হ'ল। কিছুদিনের মধ্যে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও সংবাদপত্রের মাধ্যমে এ দ্বন্দ্ব প্রচারিত হয়ে গেল। বিলাসপুর থেকে কুষাণপুর রাজ-পুরুষদের যাতায়াত বেড়ে গেল। সত্যাগ্রহ-সাহসী গ্রাম-খানাকে প্রয়োজনে শায়েস্তা করবার জন্যে বাড়তি বন্দুকধারী

পুলিস এল। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে বার বার সভা বসল। জিলা পুলিসেব অধিকর্তা ঘোষণা করলেন, কংগ্রেসপন্থী গ্রাম খানাকে অবিলম্বে উচিত শিক্ষা না দিলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখা কঠিন হয়ে উঠবে।

জিলা বোর্ডের সভাপতি হিসেবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এ ব্যাপারেব সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত। চাষীদের ভয় যে অবাস্তব নয়, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু এমন ভাবে সমস্যা জটিল হয়ে উঠল, রাস্তা হ'ল গৌণ, বড় হ'ল রাজশক্তি ও জনদাবীর আসন্ন সংঘাত, তিনি জোব দিয়ে নিজের মত প্রকাশ করবার সাহস পেলেন না। চাষীদের বিরুদ্ধে কঠিন ভাবে দাঁড়ানও তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না। সহজাত কূটনৈতিক বুদ্ধিতে তিনি বুঝলেন, এ পবিস্থিতিতে কোনও পথে সোজাসুজি না দাঁড়িয়ে মধ্যপন্থা গ্রহণ কবা বাঞ্ছনীয়।

অনেক ভেবেচিন্তে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একদিন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে উপস্থিত হলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট উত্তব প্রদেশের লোক। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন জানতেন, এই জটিল পরিস্থিতিতে তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। অনেকটা কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরই মত।

দু'জনে কথাবার্তা হ'ল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "কুষাণপুরে আজ পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দুর্ঘটনা ঘটে নি। এখন যদি এই রাস্তা নিয়ে সংঘাত হয়, রক্তপাত হয়, তা হ'লে কুষাণপুবের সুনাম নষ্ট হবে। তা ছাড়া, যারা সংঘাতের জন্যে তৈরী, যাদের নীতি হ'ল সংঘাত বাড়ান ; তাদের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে চলা প্রকৃষ্ট রাজনীতি। প্রতিপক্ষকে তার মুখ্য অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ দিতে নেই ; সে অস্ত্র যদি না কেড়ে নিতে পার, অন্তত তাকে অকেজো ক'রে রাখ।"

কথাটি জিলাধিপতির মনে লাগল। ভাবলেন, লোকটাকে যত বোকা ভেবেছি তত বোকা নয়। বুদ্ধি আছে দেখছি কিছু।

বললেন, "সংঘাত হ'লে ওরা অতি সহজে হেরে যাবে। চাষীদের

এ ধরনের সংগ্রাম করতে দেওয়া বিপজ্জনক। কুঁড়ি উপড়ে না ফেললে পরিণাম বিষময় হবে ?”

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জবাব দিলেন, “সংঘাত কবব সংঘাত যখন অনিবার্য, যখন না ক'রে উপায় নেই। তখন এমন ভাবে করব, প্রতিপক্ষ যাতে একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়ে। যে বিবাদ সংঘাত ছাড়া মেটান সম্ভব সেখানে সংঘাত ডেকে আনা শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, বিপদজনক। হিংসা নতুন হিংসা সৃষ্টি করে। আমবা মারলে ওরাও মাববে, অন্তত মারতে শিখবে। আজ মার খাবে, হারবে, কিন্তু অন্যদিন মেরে জিতবাব জন্যে মনের গোপন অন্ধকাবে হিংসাব ছুরিতে লুকিয়ে শান দেবে। স্বদেশীওয়ালারা ত চায় যে আমরা আঘাত করি। ওরা আশা ক'রে আছে আমরা আঘাত ক'রে, মেরে, দেশের ঘুমন্ত জনতাকে জাগিয়ে দেব। ওদেব জালে যদি ধরা পড়তে চান তবে অবশ্য আমার কিছু বলার নেই!”

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, “আপনি কি উপায় নির্দেশ করছেন ?”

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিবেদন করলেন, “আমার প্ল্যান পেশ করবার আগে আর-একটা কথা বলে নি, যদি অনুমতি করেন। আপনি নিশ্চয় জানেন, গ্রামবাসীদের দাবীর পেছনে যুক্তি আছে ?”

“এখন শুনছি, রাস্তা তৈরী হ'লে, চাষের কিছু ক্ষতি হ'তে পারে।”

“যা বললেন তাকে মিত-ভাষণ বললে দয়া ক'রে নারাজ হবেন না। রাস্তা হচ্ছে, খুব ভাল কথা। কিন্তু রাস্তা তৈরী হ'লে গ্রাম-গুলির খাদ্য উৎপাদন বোধহয় অর্ধেক কমে যাবে।”

“আমি অবাক হয়ে যাই, ইঞ্জিনীয়ররা এসব কথা আগে থাকতে ভাবেন না কেন ?”

“প্রয়োজন নেই ব'লে। ওঁদের কি এসে যায় দু-পাঁচখানা গ্রামে চাষ শুকিয়ে গেলে ? সরকার যখন রেলপথ তৈরী করলেন, দেশের লোকেদের খাদ্য ও স্বাস্থ্য কি ইঞ্জিনীয়র সাহেবদের বিবেচনায় খুব

বড় স্থান পেয়েছিল ? কত কম খরচে রেলপথ তৈরী হ'তে পারে এ কথাটাই তাদের কাছে মুখ্য ছিল।"

"এবার আপনার প্ল্যান শুনি।"

"আপনার মত বুদ্ধিমান, দরদী ম্যাজিস্ট্রেট আমরা খুব বেশি পাইনে। তাই আপনাকে পরামর্শ দেবার স্পর্ধা। আপনি যদি বিলাসপুর থেকে বড় ইঞ্জিনীয়র ও কৃষি-পারদর্শী এনে ব্যাপারটাকে নতুন ভাবে বিচার করান ত খুব ভাল হয়। তাতে গ্রামবাসীরা বুঝবে, তাদের চাষবাসের সমস্যা সম্বন্ধে সরকার সহানুভূতিশীল ; তাদের ন্যায্য নালিশ সরকার বিবেচনা করতে সর্বদা প্রস্তুত। নতুন ইন্‌ভেষ্টিগেশন শুরু হ'তে সময় লাগবে ; আন্দোলন চাপা পড়বে, আগুন যাবে নিভে। তখন প্রচার করতে হবে যে রাস্তার প্ল্যান কিছুটা বদলে দেওয়া হচ্ছে, সরকার নিজে থেকেই চাষীদের মঙ্গল সাধনে এগিয়ে এসেছেন। ইতিমধ্যে ঐ স্বদেশী যুবকটির নেতৃত্ব ভেঙ্গে দিতে হবে ; গ্রামের লোকেরাই ওর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠবে—এ এমন কঠিন কাজ নয়। তখন একদিন হয় তাকে সরকারী অতিথিশালায় নিয়ে আসুন, নয় অন্যত্র পাচার করে দিন। তারপর রাস্তা তৈরী করুন, ইনভেষ্টিগেটিং কমিটির সুপারিশ যতটা সম্ভব মানুন। এই হ'ল সংক্ষেপে আমার প্ল্যান।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্ল্যান মোটামুটি গৃহীত হয়েছিল। এ ঘটনা তাঁর জীবন-রথের চাকাকে নতুন পথে চালিত করেছিল।

দু বছরের মধ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কৃষাণ-নেতা হয়ে উঠেছিলেন। কৃষাণপুর কৃষাণসভার সভাপতি। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গোড়াপত্তন।

আঠারো বছর বয়সে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিবাহ হয়েছিল। ধর্মপত্নী পদ্মাদেবী কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ ঘরের কন্যা। বিবাহের সময় বয়স ছিল আট। চার বছর পিতৃগৃহে কাটিয়ে বারো বছর বয়সে তিনি স্বামীর

ঘরে আসেন। চৌদ্দ বছরে তাঁর গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রথম পুত্র জন্ম নিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যখন কুষাণপুর কৃষাণসভার সভাপতি, ওকালতি ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত, জিলা বোর্ডের প্রায় পার্মানেণ্ট প্রেসিডেণ্ট, তখন তাঁর চার পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে গিয়েছে—জীবন পথে চলতে চলতে তিনি সার্থকতার নাতিক্ষুদ্র দুর্গে পৌঁছে গেছেন। পদ্মাদেবী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে, অনেকখানি শুচি ও নির্মলতা নিয়ে স্বামীর ঘরে পদার্পণ করেছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, সমীহ করতেন, কিন্তু প্রেমের উদ্বেল আনন্দ কোনও দিন পান নি স্ত্রীর সঙ্গ থেকে।

তাঁর ব্যক্তিত্বের যে বিরাট অংশে সার্থক নেতৃত্বের দুর্বার লোভ প্রথম থেকে অঙ্কুরিত ছিল, যেখানে তমোরসের প্রচণ্ড প্রভাব, জটিল আকাঙ্ক্ষা, কুটিল নীতিবিমুখতার সাহায্য নিয়ে যেখানে নিরন্তর সাফল্যের পথ-অন্বেষণ, সেখানে ধর্মপত্নী পদ্মাদেবীর স্থান ছিল না। অথচ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ব্যক্তিত্বের অন্য অংশে, অবয়বে ক্ষীণ হলেও যার প্রভাব একেবারে কম নয়, স্ত্রীর জন্যে নির্দিষ্ট শ্রদ্ধাস্নিগ্ধ স্থান ছিল। তিনি জানতেন, ভাল কাজ, বড় কাজ, সৎ ও মহান্ কাজের আহ্বানে সায় দেবার সময় সবচেয়ে বড় সমর্থন ও সহায়তা পাবেন পদ্মাদেবীর কাছে। তেমনি, অনুশোচনায় অনেকখানি ধুয়ে যাওয়া অন্যায় কর্মের মুখোমুখি হয়েও তিনি জানতেন, তার প্রধানতম আশ্রয় পদ্মাদেবী।

স্বামী-স্ত্রীর এ সম্পর্ক সুখের নয়, আনন্দের নয়। জীবনে ব্যবহারিক ও রাজনৈতিক সার্থকতার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ক্রমে ক্রমে বদলে যাচ্ছিলেন; পদ্মাদেবীর কাছ থেকে দূরে সরছিলেন। তাঁর সময়কার পারিবারিক জীবনে স্ত্রীর স্থান ছিল প্রধানত অন্দরে, স্বামী-সন্তান-আত্মীয়-কুটুম্ব পরিচর্যায়, সংসার রক্ষণাবেক্ষণে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন থাকতেন নিজের বহির্জগতে বেশি সময়, ওকালতি, জিলাবোর্ড এবং রাজনীতি-জননীতি-ক্ষমতানীতির বর্ধমান পরিসরে।

দুপুরে আহারান্তে বিশ্রামের সময় এবং রজনীর স্বল্পালোকিত নির্জনতায় স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, তবু তাঁদের মধ্যে জীবনের কিছুটা মূল্যায়ন হ'ত। তখনও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের "রাজনীতি"তে ক্ষমতার উন্মাদন বিশেষ ছিল না; স্ত্রীর সঙ্গে দ্বন্দ্বের পরিধি ছিল সীমিত।

- কুষাণপুর কৃষাণ সভার সভাপতি হবার পর পরিধি প্রসারিত হ'ল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চাষী ছিলেন না; চাষীর পুত্রও ছিলেন না। তথাপি গ্রামীন সমাজের লোক তিনি, গ্রামবাসীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। চাষবাসের মোদ্দা সমস্যাগুলি তিনি জানতেন, বুঝতেন; গ্রামের সমস্যা তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু এ সমস্যাব যে কোনও আলাদা রূপ থাকতে পারে, সামাজিক বিবর্তনে চাষীব যে কোনও স্বকীয় সত্তা থাকতে পারে, জমিব মালিক ও জমিব চাষীর মধ্যে যে দুনিবার সংঘাতের অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনা থাকতে পারে, এ কথা তাব মনে কখনও জাগে নি। তার গ্রামীন দৃষ্টি ছিল জমিদার-কেন্দ্রিক; চাষীর কল্যাণ করবে জমিদার, এবং চাষী থাকবে সে কল্যাণ-বিতরণে মোটামুটি সন্তুষ্ট। অর্থাৎ, গ্রামের দরিদ্র জনতাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ক্ষুদ্রভাগ্য সন্তান মনে করতে পারতেন; তাদের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল পিতৃকল্প। উদার দৃষ্টি সম্পন্ন কল্যাণকামী জমিদার দ্বারাই গ্রামের মঙ্গল সাধিত হ'তে পারে, গ্রামের উন্নতি সম্ভব, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ তাঁর ছিল না। সুতরাং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যখন কৃষাণ সভা প্রতিষ্ঠা করে তাঁর সভাপতি হলেন, কুষাণপুরের জমিদারগণ আতঙ্কিত হবার কারণ দেখলেন না। অপর পক্ষে, উপরি-উক্ত গ্রামের দাবী গৃহীত হবার জন্যে, চাষী মহলেও তাঁর প্রতি খানিকটা আস্থা জন্মাল। জিলা কর্তৃপক্ষও ব্যাপারটাকে ভালভাবে নিলেন। তখন ভারতবর্ষের নানাস্থানে অস্বস্তিকর চাষী আন্দোলন মাথা তুলতে শুরু করেছে। অপেক্ষাকৃত

প্রশান্ত উদয়াচলে অশান্তির ঝিলিক অবশ্য দেখা দেয় নি। এ সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মত দায়িত্বশীল নেতারা এগিয়ে এসে কৃষাণদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলে রাজশক্তির ভয় পাবার কারণ ছিল না।

প্রথম ভয় পেলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-পত্নী পদ্মাদেবী। একদিন দুপুরে আহারান্তে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিশ্রাম করছেন, পদ্মাদেবী পাশে বসে পাখার হাওয়া দিচ্ছেন। তিনি বললেন, "একটা গুজব শুনছি। মন ভারী হয়ে আছে।"

"কিসের গুজব ?"

"গুজবটা মোহনলালকে নিয়ে।"

"কোন্ মোহনলাল ?"

পদ্মাবতী অবাক হলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মোহনলালকে চিনতে পারছেন না, এ তো স্বাভাবিক নয় !

"মোহনলাল নামটা অবশ্য খুব সাধারণ। কিন্তু মোহনলাল বলতে কুষাণপুরে ত একটি মানুষকেই বোঝায় !"

"আমি দশটা মোহনলালকে চিনি," কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কণ্ঠে উষ্মা।

"মোহনলাল সক্‌সেনা।"

"ও। তাকে নিয়ে অনেক গুজব। গুজব কেন, কেচ্ছা। তার অনেকগুলিই সত্যি।"

"তুমি খুব ভাল করেই জান তার একটাও সত্যি নয়।"

কথাটা এমন শান্ত জোর দিয়ে পদ্মাদেবী উচ্চারণ করলেন, এমন কমনীয় নিরুত্তাপ প্রত্যয়ে, যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রীতিমত নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রাগতে লাগলেন।

পদ্মাদেবী বললেন, "এসব গুজব রটিয়ে অমন ভাল ছেলেটির সর্বনাশ কারা করছে ?"

"মোহনলাল সক্‌সেনা লোক মোটেই ভাল নয়," কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অধৈর্য রুক্ষতার সঙ্গে বললেন।

"কেন? সে কি করেছে? কি তার অপরাধ?"

"সে চাষীদের ক্ষেপিয়ে তুলছে জমিদারের বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে!"

"শুধু এই?"

"তার চরিত্র খারাপ।"

"মিথ্যে কথা।"

"গ্রামের লোকেরা তাই বলছে।"

"না। তোমরা বলছ। তোমরা ওর নামে মিথ্যে কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছ।"

এবার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভয়ানক রেগে গেছেন। "তুমি যা জান না বা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বলতে এস না।"

"জানি ও বুঝি বলেই বলছি।" পদ্মাদেবীর কণ্ঠস্বরে রাগ নেই। শুধু বেদনা। "তুমি কৃষাণসভার সভাপতি হয়েছ। গ্রামের লোকেদের উপকার করেছ। কিন্তু এই আদর্শবাদী স্বদেশী ছেলেটির বিরুদ্ধে তুমি কেন লেগেছ বুঝতে পারছি না। সে ত নিজের ইচ্ছায় এখানে আসে নি। সরকার তাকে এখানে আটকে রেখেছে। শহরে পর্যন্ত সে সপ্তাহে দু'দিনের বেশি আসতে পারে না, তাও পুলিসের অনুমতি নিয়ে। তুমি খুব ভাল করেই জান দুশ্চরিত্র সে নয়, সে হ'তে পারে না। বাপ-মায়ের একমাত্র পুত্র, ভাল ঘরের ছেলে; ধন-দৌলত, স্নেহ-প্রেম সব ত্যাগ করে সে স্বদেশী করছে, জেল খাটছে, পুলিসের হাতে মার খাচ্ছে, পাপ তাকে স্পর্শ করবে কেমন করে? তাকে এখান থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে দাও তোমরা—কিন্তু তার নামে এ ধরনের দুর্নাম রটিয়ে তোমাদের লাভ কি? এ কি ধর্মের কাজ?"

"তুমি তার এত কথা জানলে কি করে?"

"শুধু কি আমি জানি? তুমি জান না? তুমিও ত জান!"

"ভুট্টাসিং-এর মেয়ে হরপেয়ারীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জান?"

"শুনেছি। একেবারে মিথ্যে। হরপেয়ারীকে সে জমিদারের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।"

"ও রকম সবাই বাঁচায়। রক্ষক পরে ভক্ষক হয়।"

"মোহনলাল সে জাতের লোক নয়।"

"তুমি যে তার বিরাট ভক্ত হ'য়ে উঠলে! জান, সে আমার শত্রু?"

পদ্মাদেবী চমকে উঠলেন। "শত্রু? সে কেন তোমার শত্রু হ'তে যাবে? সে ভিন্‌দেশী। আজ আছে কাল নেই।"

"তবু সে আমার শত্রু।" কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কণ্ঠ হিংস্র হ'য়ে উঠল। "আমার প্রতিপক্ষ।"

"প্রতিপক্ষ হ'লেই শত্রু? আমিও ত অনেক বিষয়ে তোমার প্রতিপক্ষ!"

"সে আমার ভয়ানক শত্রু। কৃষাণসভার বিরুদ্ধে সে প্রচার শুরু করেছে। আমি নাকি জমিদারদের বন্ধু, সরকারের তাঁবেদার! চাষীদের কল্যাণ আমার কাম্য নয়, তাদের হাতে রেখে জমিদারের স্বার্থ রক্ষা ও সরকারের শক্তি সংরক্ষণই আমার কাম্য।"

পদ্মাদেবী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বললেন, "অত কঠিন বিষয় আমি সহজে বুঝতে পারি নে। কিন্তু তোমার কথা সত্যি হ'লেও তার চরিত্রে মিথ্যে কলঙ্ক চাপিয়ে তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। তোমরা চাষীদের বুঝিয়ে দাও যে মোহনলাল যা বলছে তা সত্যি নয়। তোমার বিরুদ্ধে সে পারবে কেন?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "রাজনীতি বড় কঠিন খেলা। এখানে সত্য, মিথ্যা, ন্যায়, অন্যায়, পাপ-পুণ্যের স্থান নেই। সব মিলে-মিশে জগা-খিচুড়ি। রাজনীতির গোড়ার কথা প্রতিপক্ষকে হারাতে হবে, নির্মূল করতে হবে। মোহনলাল সকসেনা শুধু একজন মানুষ নয়, সে একটা আইডিয়া, আদর্শ, শক্তি। তার ও আমার আদর্শে,

আইডিয়ায় ও শক্তিতে সংঘাত ঘটেছে। তাকে নির্মূল করতে হবে। আজ যদি সে মান-সম্মান গৌরব অটুট রেখে গ্রাম থেকে বিদায় নেয়, তার আইডিয়া পেছনে প'ড়ে থাকবে, বহু উর্বর মনে অঙ্কুরিত হবে, একদিন মহাবল দানবের মত আমাদের বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়াবে। মোহনলালের আইডিয়া ধ্বংস করতে হ'লে তার মান-সম্মান-মর্যাদা ধ্বংস করতে হবে। গ্রামের লোক বুঝবে যে তারা ভুল মানুষকে, ভুল ধারণাকে মারাত্মক মোহে অন্তরে স্থান দিয়েছিল ; বুঝতে পেরে তারাই মোহনলালকে তাড়াবে। আমি জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ব'লে দিয়েছি সরকার যেন মোহনলালকে অন্যত্র অন্তরীণ করার মত বিরাট ভুল এড়িয়ে চলেন। গ্রামবাসীই দাবী করবে মোহনলালের নির্বাসন।"

পদ্মাদেবী সেদিন আর কথা বাড়ান নি। নীরবে পাখা চালিয়ে গেছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নও কিছুক্ষণের মধ্যে নিশ্চিন্ত দিবানিদ্রায় ঘনীভূত হয়েছেন। গৌরবর্ণ মুখে নিঃসন্দেহ সাফল্যের প্রত্যয় তৃপ্তির মৃদুহাস্যে মিলে এমন এক অব্যয় অভিব্যক্তিতে রূপায়িত হয়েছে যা দেখে পদ্মাদেবী বারবার আতঙ্কে শিহরিত হয়ে উঠেছেন।

মোহনলাল সক্সেনা মান-সম্মানে বিদায় নিতে পারে নি। যে গ্রামবাসীদের সে সত্যাগ্রহের জন্যে সংগঠিত করছিল তাদেরই অনেকে একত্রিত হয়ে তার নির্বাসন দাবী করে অপঠিত স্মারকলিপিতে টিপসহি দিয়ে একদিন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হাতে তুলে দিয়েছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সে আবেদনপত্র কুষাণপুর কৃষাণসভার সভাপতি হিসেবে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পেশ করেছিলেন। অবিলম্বে মোহনলালকে গ্রেপ্তার করে বিচারালয়ে হাজির করা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন যে, গ্রামের একটি সুন্দরী বালবিধবার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের অভিযোগে তাকে শাস্তি দেওয়া সহজ হবে না। বীরত্বের চেয়ে সুবিবেচনাকে বড় স্থান দিয়ে সরকার বিচার চলবার

কালেই মোহনলালকে আর একটা গুরুতর রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে অনেক বেশি নাটকীয় বিচারের জন্যে এলাহাবাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এ ব্যাপারেও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হাত ছিল। যাতে তাঁর একেবারেই হাত ছিল না তা হ'ল রেল স্টেশনে বিদায়ী মোহনলালকে সম্মান দেখাবার জন্যে শহরের পঁচিশজন মহিলার আকস্মিক আবির্ভাব। মহিলাগণ মোহনলালের কপালে চন্দন লেপে দিয়েছিলেন, গলায় মালা পরিয়েছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুরন্ত ক্রোধে অস্থির হয়েছিলেন জানতে পেরে যে এই বিদায়-অভিনন্দনের পেছনে ছিলেন তাঁরই ধর্মপত্নী পদ্মাদেবী।

যে মিথ্যা কলঙ্ক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মোহনলালের ওপর চাপিয়েছিলেন, একদিন, বেশি দিন পরে নয়, তা সত্যি হয়ে তাঁর নিজের জীবনে দেখা দিয়েছিল। গ্রামের বালবিধবা হরপেয়ারী নয়, কুষাণপুর শহরের মেয়ে-ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী কৌশল্যা। অপূর্ব সুন্দরী, লাস্যময়ী, মার্জ্জিতা তরুণী। জীবনে তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের উত্থান-পর্ব; ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব-নেতৃত্ব-পরিধিতে মেয়ে-ইস্কুলের সভাপতিত্ব এসে গিয়েছিল। জীবনেরই অমোঘ অলিখিত দুর্বার অনিয়মে তিনি কৌশল্যার আকর্ষণে ধরা পড়েছিলেন। বলিষ্ঠ উষ্ণবীর্য পুরুষ-জীবনের যে বিরাট অংশে পদ্মাদেবীর পত্নীত্ব এক নির্জন নিরাত্মীয় শূন্য সৃষ্টি ক'রে রেখেছিল, কৌশল্যা হঠাৎ, বিনা নোটিসে, তা পূর্ণ ক'রে তুলেছিল। তার প্রখর উত্তাপ পদ্মাদেবীর স্নিগ্ধ অস্তিত্বকে প্রবল ধাক্কায় বহু দূরে সরিয়ে দিয়েছিল; জ্বলন্ত জীবনের আগুনে দগ্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাতে খুব বেশি ব্যথা পান নি। বরঞ্চ এ সময়ে তাঁর কবি-প্রতিভা হঠাৎ যাদুর স্পর্শে ফুটে উঠেছিল। কোন্ অজ্ঞান সম্মোহনের তন্ময় প্রভাবে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য "কৃষ্ণলীলাকাহানী" এই দুর্বিনীত নির্লজ্জ উল্লসিত অধ্যায়ে রচনা করেছিলেন।

পরিণত-প্রায় জীবনে বিগলিত তামসের ঝল্লরীতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিছুদিন সব কিছু ভুলে রইলেন। কিন্তু অদৃষ্ট-দেবতার অদৃশ্য চালনে, সর্বনাশের আগেই একদিন তিনি জাগলেন। মুক্তির পথও পেয়ে গেলেন।

কৌশল্যাকে নিয়ে ঝড় উঠেছে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বুঝতে পারছেন। কৌশল্যা যতই রূপবতী হোক, যত দুর্নিবার হোক তার আকর্ষণ, যত উন্মাদক তার প্রেম, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানতেন তাঁর জীবন কৌশল্যার থেকে অনেক বড়, অনেক বেশি মূল্যবান। সহজাত বাস্তববুদ্ধিতে তিনি বুঝেছিলেন যে, কৌশল্যা-কলঙ্ককে ঢাকবার জন্যে এমন কোনও আলোর প্রয়োজন যা জনচক্ষে তাঁর জীবনকে অভিনব গৌরবে উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে। "কৃষ্ণলীলাকাহানী" রাধার কলঙ্ক নিয়ে তিনি নিজেই লিখেছিলেন: "চাঁদের কলঙ্ক তার গৌরব, তেমনি রাধারও।" আবার তেমনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকেও চাঁদের মতই আলোক-উজ্জ্বল হ'তে হবে; কলঙ্ক গৌরব না হোক, অগৌরবের কালিমায় জীবনকে অন্ধকার সে করতে পারবে না।

সে আলোক-প্রবাহ গ'ড়ে তোলবার সুযোগ একদিন এসে গেল। উনিশ শ' একত্রিশের জাতীয় আন্দোলনের বন্যা কুষাণপুরেও এসে পৌঁছেছে। স্কুল-কলেজের ছাত্ররা মিছিল ক'রে আবগারী দোকানে সত্যাগ্রহী হয়েছে। একদিন পুলিস তাদের উপর লাঠি চালাল। পরের দিন শহরবাসী বিস্মিত শ্রদ্ধায় দেখতে পেল বিরাট ছাত্র মিছিলের পুরোভাগে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। পরনে মোটা খদ্দরের ধুতি, কুর্তা, নগ্ন পা। রাস্তায় লোকের ভিড় জমে গেল। মিছিল চলল সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থানে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে। যে আদালতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ওকালতি করেছেন, সেখানে আজ উকিলদের ব্রিটিশ বিচারশালা পরিত্যাগ করবার আবেদন জানাতে হবে। সদর কাছারির ময়দানে সশস্ত্র পুলিসের লাইন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিজয়ী বীরের মত এগিয়ে গেলেন

পুলিসের অধিকর্তার কাছে। দাবী করলেন: কাছারি প্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকারের। দাবী নামঞ্জুর হ'ল। তখন মিছিলের যুবক-জনতা নিয়ে সেখানেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সভা করলেন। তাঁর ভাষণ সবার মন গভীরভাবে স্পর্শ করল। তিনি শুধু স্বাধীনতার আহ্বানে সবাইকে সাড়া দিতে বললেন না, নিজের অক্ষমতা কর্তব্য বিমুখতা, দুর্বলতার জন্যে কুষাণপুরবাসীর নিকট প্রকাশ্যে মার্জনা চাইলেন। "আজ এই মহান জন-সঙ্কল্পে যোগদান করবার আগে আমি নিজের জীবনের চেহারা ভাল করে একবার দেখতে চেষ্টা করলাম। দেখে গর্ব ত দূরের কথা, লজ্জা ও ক্ষোভে আমার মাথা নত হয়ে গেল। কত স্বার্থবুদ্ধি, কত অন্যায়, দুর্বলের প্রতি কত অবিচার, সবলের প্রতি অক্ষম আনুগত্য, কত লোভ, লালসা, পাপ—কত জঞ্জালে ভরা আমার জীবন! তবু লোকের চোখে আমি সার্থক পুরুষ; খ্যাতি, ক্ষমতা, যশ আমার সার্থকতার সরঞ্জাম। কেবল আমিই জানি এই সার্থকতার মধ্যে কতখানি ফাঁক ও ফাঁকি লুকিয়ে রয়েছে। তাই আজ মনে হ'ল, সমস্ত পাপ-অন্যায়, স্খলন-পতন এবং সার্থকতা নিয়ে একমাত্র দেশমাতৃকার পদতলে এসে দাঁড়ান যায়; মায়ের কাছে সন্তানের লজ্জা থাকে না, মা সব অন্যায় ক্ষমা ক'রে তাকে কোলে তুলে নেন। আমরা ছোট ছোট মানুষ, কিন্তু বড় আদর্শের আলো যখন এসে আমাদের উপর পড়ে তখন আমরাও কিছু বড় হয়ে যাই, আমাদের জীবন উদ্ভাসিত হয়, কলঙ্ক-কালিমা, দুর্বলতা হঠাৎ কেটে যায়। আজ আমাদের সবাকার সামনে বড় হবার অপূর্ব সুযোগ। মানে, সম্মানে, ঐশ্বর্যে, ক্ষমতায় বড় হওয়া নয়—ত্যাগে, দুঃখে, বেদনায়, বীর্যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোয়, দেশের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করার মহান সাহসে বড় হওয়া···।"

পুলিস সেদিন লাঠির আক্রমণে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করেছিল। লাঠি পড়েছিল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বলিষ্ঠ উঁচু দেহে। কে যেন সে সময়ে ছবি তুলে নিয়েছিল। পত্রিকায় সে ছবি ছাপা হয়েছিল সমস্ত দেশে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গ্রেপ্তার হয়ে একদিন হাজতে ছিলেন। পরের দিন তাঁর বিচার হ'ল। ছ' মাসের সশ্রম কারাদণ্ড।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কংগ্রেসের সভ্য হলেন জেলে যাবার আগে। তাঁর কারাবাসের দ্বিতীয় দিনে তিনি কুষাণপুরে জিলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। জীবনের গতি একেবারে বদ্‌লে গেল।

পাঁচ

দপ্তর ঘরে নিজের নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিন বার ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করলেন। এক পাশে সযত্নে কয়েকটি অত্যন্ত জরুরী ফাইল রাখা ছিল, রাজকার্যের কয়েকটি সমস্যা, যাতে অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। তার প্রথমটির চর্মাবরণ খুলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মনোনিবেশ করলেন। ফাইলের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করবার প্রয়োজন হ'ল।

নম্বর ডায়াল করে কয়েক সেকেণ্ড কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অপেক্ষা করলেন। অন্যপ্রান্তে কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হ'লে বললেন :

"আপনি কখন আসছেন ?"

"দশটায় এসে হাজির হব, স্যর।"

"তার আগেই একটু আসুন।"

"গভর্ণর সাহেব তলব করেছেন। সাড়ে ন'টায় পৌঁছতে হবে।"

"তা হ'লে সোওয়া ন'টায় এখানে আসুন।"

"আচ্ছা, স্যর।"

"আর একটা কথা।"

"বলুন, স্যর।"

"এখনও এ প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল।"

"নিশ্চয়, স্যর।"

"কথাটা মনে রাখবেন।"

টেলিফোন নামিয়ে রেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মৃদু হাসলেন। ফাইলটি সযত্নে বন্ধ ক'রে একপাশে সরিয়ে রাখলেন। দ্বিতীয় ফাইল খুলে মিনিট দশেক পড়লেন। তারপর তাতে নিজের মন্তব্য লিখলেন।

টেলিফোন বাজল।

"নমস্তে দেশপাণ্ডেজী," সবিনীত কণ্ঠে মধু-স্বাদ বাক্য উচ্চারণ

করলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। "এই সকাল বেলা আপিস-ঘরে এসে প্রথমেই আপনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আজ দিন ভালো যাবে মনে হচ্ছে।"

অন্যপ্রান্তে মাধব দেশপাণ্ডে।

"বিনয়েও আপনি অজেয়, কোশলজী।"

"অজেয় আর কোথায়, দেশপাণ্ডেজী?" কৃষ্ণদ্বৈপায়নের স্বরে পরাজয়ের চিহ্নমাত্র নেই। "আমার যা কিছু বল ছিল, সবই আপনি, বিশেষ ক'রে আপনার সাহায্যে। আজ বড় কমজোর লাগছে।"

"বলেন কি কোশলজী! আপনার মত শার্দুলের মুখে এমন কথা শোভা পায় না। আপনি আমাদের নেতা। আমি আগেও যেমন, এখনও তেমনি, আপনার সঙ্গে আছি।"

"দেশপাণ্ডেজী, আপনি অসত্য বলতে পারেন, কিন্তু অপ্রিয় কদাচ বলেন না। আমার কালিদাসের একটি শ্লোক মনে পড়ছে। 'অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব—'। তেমনি গভর্ণমেণ্ট বস্তুও পরকীয়। কাশ্যপ মুনি বলেছিলেন, কন্যা পরের সম্পত্তির মত। আজ তাকে স্বামীগৃহে পাঠিয়ে দিয়ে গচ্ছিত সম্পদ্ ফেরৎ দিলে যেমন হয় আমার আত্মা তেমনি শান্ত হয়েছে।" সুন্দর স্বরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আবৃত্তি করলেন, "জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা।" তারপর বললেন, "আমিও এই সরকার কোনও যোগ্য ব্যক্তির হাতে সঁপে দিয়ে শান্তচিত্ত হ'তে চাই, দেশপাণ্ডেজী"

মাধব দেশপাণ্ডে অবাক্ হলেন।

"বলেন কি কোশলজী? আপনি ছাড়া এ দায়িত্ব বহন করবে কে?"

"পৃথিবীতে কেউ চিরস্থায়ী নয়, দেশপাণ্ডেজী; কারুর স্থান খালি থাকে না। কোনও অভাবই অপূরণীয় নয়। মা মরে গেলে ক'দিন পরে সন্তান মাতৃশোক ভুলে যায়। সন্তানহারা জননীর

মুখেও কালে হাসি ফিরে আসে।” হঠাৎ তাঁর কণ্ঠস্বর বড় ক্লান্ত শোনাল। বললেন, “বহুদিন এ বোঝা বয়েছি, ফুলের মালা পেয়েছি, ইট-পাটকেলও কম পাই নি। এবার আর ভাল লাগছে না। দেহটাও যেন কেমন বিকল মনে হচ্ছে। তাই কাল থেকে ভাবছি, এবার কারুর হাতে সঁপে দিতে পারলে হয়। আজ সকালে সুদর্শনজী এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গেও কথাবার্তা হ’ল। তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা। তাঁরই দায়িত্ব উপযুক্ত লোক ঠিক করা।”

মাধব দেশপাণ্ডে কয়েক মুহূর্ত চুপ ক’রে রইলেন।

“আপনি নিশ্চই তামাশা করছেন, কোশলজী।”

“না মাধব-ভাই, তামাশা নয়। বয়স অনেক হ’ল। কাল থেকে আমার মহাভারতের কয়েকটি শ্লোক বার বার মনে পড়ছে। বনপর্বে পাণ্ডবগণ নরনারায়ণের রমণীয় আশ্রমে উপনীত হয়েছেন। ‘মনোজ্ঞে কাননবরে সর্বতু-কুসুমোজ্জ্বলে’। সেই মনোজ্ঞ কানন, সকল ঋতুর কুসুমে উজ্জ্বল, গাছে গাছে ফুলের বাহার, ফলের ভারে বৃক্ষকুল অবনত। ‘দিব্যপুষ্প সমাকীর্ণাং মনঃপ্রীতিবিবর্ধনীম্’। মনে পড়ছে, মাধবভাই, আর ভাবছি, এবার ত যমরাজ একদিন শিয়রে এসে হাজির হবেন, তার আগে কিছুদিন অন্তত নিরালা একটু ঈশ্বরচিন্তা করে নি।”

মাধব দেশপাণ্ডে উত্তেজিত হলেন।

“এ হ’তে পারে না, কোশলজী। আপনি যদি অবসর নেন, মুখ্যমন্ত্রীত্ব যাবে সুদর্শন দুবের হাতে।”

“না, না, দেশপাণ্ডেজী। আপনি থাকতে সুদর্শন দুবে কেন মুখ্যমন্ত্রী হ’তে পারবেন?”

“আপনি খুব ভাল ক’রেই জানেন, উদয়াচলে মারাঠা রাজত্ব চলবে না।”

“কেন চলবে না? উদয়াচলে হিন্দী-মারাঠী রেষারেষি দূর করতেই হবে।”

"দূর করতে হবে সবাই বলে। আবার সবাই রেষারেষি বাড়িয়ে দেয়। আসল কথা তা নয়। আপনার সঙ্গে আমার মতবিরোধ আছে। কিন্তু তা ব'লে সুদর্শন দুবেকে মুখ্যমন্ত্রী হ'তে দেব না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিস্মিত হলেন।

"সে কি দেশপাণ্ডেজী! সুদর্শন দুবে ত বললেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হ'লে আপনি অর্থমন্ত্রীত্বের দাবি করবেন, এবং সে দাবি তিনি মেনে নেবেন।"

মাধব দেশপাণ্ডে বললেন, "কোশলজী! এ কথা আর টেলিফোনে হয় না। আমি আপনার কাছে আসছি। এখন সময় হবে আপনার?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "সাড়ে দশটায় আসুন। এগারোটায় ত ক্যাবিনেটে মিটিং। আধ ঘণ্টা আগে আসুন।"

টেলিফোন নামিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সাফল্যের হাসি হাসলেন। মাধব দেশপাণ্ডের উচ্চাশা যত, বুদ্ধি তার চেয়ে অনেক কম। তা হ'লেও তিনি জানেন, সুদর্শন দুবে মুখ্যমন্ত্রী হ'লে উদয়াচলের মারাঠা-রাজনীতিতে তাঁর নেতৃত্ব বেশিদিন থাকবে না। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে তিনি তাড়াতে চান না। সুদর্শন দুবের সঙ্গে আঁতাতের ভয় দেখিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছ থেকে অর্থমন্ত্রীত্ব আদায় করা তাঁর অভিপ্রায়।

নটা বাজতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পার্সনাল সেক্রেটারী জগন্মোহন তিওয়ারী হাজির হ'ল। বয়স ছেচল্লিশ, জোয়ান, টাক-মাথা, বেঁটে-খাটো চেহারা, বেশ সযত্নে সাজান বড় একজোড়া গোঁফ। তিওয়ারীকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দীর্ঘদিন পোষণ করছেন। সেই কুষাণপুরে ওকালতি করবার সময় থেকে। মুখ্যমন্ত্রী হবার পর তাকে সরকারী পদে বহাল ক'রে নিজের সঙ্গে রেখেছেন। একাধারে তিওয়ারী তাঁর দেহরক্ষী, বিবেক-রক্ষী, ও বিশ্বস্ত অনুচর।

ঘরে ঢুকে তিওয়ারী প্রণাম জানিয়ে ফরাসে বসল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তার মুখের দিকে তাকালেন।

তিওয়ারী বলল, "দুর্গাভাই।"

অত্যন্ত অবাক হয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রশ্ন করলেন, "ঠিক জান?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দুর্গাভাই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"সঙ্গে আর কেউ ছিল?"

"না।"

"গাড়ী কোথায় গিয়ে দাঁড়াল?"

"হরিশংকর ত্রিপাঠীর বাড়ীতে।"

"সলা-পরামর্শ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কতক্ষণ পর্যন্ত?"

"রাত দুটো।"

"সরোজিনী এখন কোথায়?"

"সুদর্শনজীর বাড়ীতে।"

"আজ সারাদিন থাকবে?"

"রাত্রে যাবার কথা।"

"কোথায় যাবে?"

"এলাহাবাদে।"

"ট্রেনে?"

"না গাড়ীতে?"

"কার গাড়ী?"

"সুদর্শনজীর।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিছুক্ষণ ভাবলেন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ নাসিকা আরও

কঠিন দেখাল। প্রশস্ত কপালে চিন্তার কুঞ্চন। কয়েক মিনিট পরে টেলিফোনে ডায়াল করলেন।

অন্তপ্রান্তে আওয়াজ হ'লে বললেন, "আমি কে. ডি. কোশল বলছি। দুর্গাভাই আছেন?

"এখনও পূজার ঘরে রয়েছেন।"

"এত দেরিতে?"

"কাল অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরেছিলেন। সকালে উঠতে দেরি হ'য়ে গেছে।"

"শরীর ঠিক আছে ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। বাবাকে বলব আপনাকে ফোন করতে।"

"না, না। আমিই আবার করব।"

মৃদু হেসে টেলিফোন রাখলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। তিওয়ারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "গুড্ওয়ার্ক। এবার আর একটা কাজ কর।"

তিওয়ারী নীরবে আদেশের অপেক্ষা করল।

"ভারত টাইমসের গোপালকৃষ্ণণকে বল বারটায় আমার সঙ্গে দেখা করতে।"

তিওয়ারী বিদায় হ'ল।

সওয়া ন'টায় উদয়াচলের চীফ সেক্রেটারী সি. কে. শ্রীবাস্তব আই-সি-এস এসে হাজির হলেন। তাঁকে বসতে দিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "বেশিক্ষণ আপনাকে আটকে রাখব না। গবর্ণর সাহেবের সঙ্গে আপনার যখন কাজ আছে। এই যে ফাইলটা—এটা আমার কাছে আসবার আগেই হরিশংকর ত্রিপাঠীজীর কাছে গেল কি ক'রে?"

শ্রীবাস্তব ফাইলে চোখ বুলিয়ে বললেন, "হোম সেক্রেটারী পাঠিয়েছেন মনে হচ্ছে।"

"না। প্যাটেল পাঠায় নি, আমি জানি।"

"তা হ'লে—"

"আপনার পরামর্শে রামকৃষ্ণণ পাঠিয়েছে।"

"আমার পরামর্শে ?"

"হ্যাঁ। আপনি তা খুব ভাল ক'রে জানেন। তাই আপনাকে বলছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী এখনও আমি, অন্য কেউ নন। একথা মনে রাখবেন।"

একটু থেমে : "আপনার বদলির জন্যে দিল্লীতে আমি লিখেছি। এ ধরনের রাজনীতি ক'রে আপনি এখানে থাকতে পারবেন না। চীফ সেক্রেটারী কদাচ রাজনীতি করবে না। এ সাধারণ কথাটা আপনার জানা থাকা উচিত।"

গলা নামিয়ে : "আরও একটা কথা বলি। নতুন মন্ত্রীসভা তিনদিনের মধ্যে তৈরী হবে। আর, মুখ্যমন্ত্রী হব আমিই। আপনি এখন আসতে পারেন।"

শ্রীবাস্তব উঠে দাঁড়াবার পর : "আশা করছি মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণের পরের দিনই আমি নতুন চীফ সেক্রেটারী নিযুক্ত করব। আপনি বদলির জন্যে তৈরী থাকুন।"

চীফ সেক্রেটারী বিদায় নিলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুনরায় রাজকার্যে মনোনিবেশ করলেন। পনের মিনিটে তিনি বাকী বিশেষ জরুরী ফাইলগুলি সেরে ফেললেন। দু'বার টেলিফোনে কথাও বললেন। ইতিমধ্যে তাঁর নিজস্ব সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীগণ এসে গিয়েছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন খুব বেশি লোককে এখানে এনে ভিড় বাড়ান নি। তাঁর তিনজন ষ্টেনোগ্রাফার-সেক্রেটারী, পাঁচজন টাইপিষ্ট, আটজন অফিসার নিয়ে এই আংশিক সেক্রেটারিয়েট।

দোতালায়, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের যেখানে ফরাস পাতা দপ্তর, খুব কম লোক আনাগোনা করে। আগন্তুকদের একতলায় বসানো

হয়; নেম-কার্ড বা স্লিপ পাঠান হয় ওপরে; কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একে একে তাঁদের ডেকে পাঠান। কদাপি-কখনও বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তিকে স্বাগত করবার জন্যে তিনি নিজেই নীচে নেমে আসেন; তাঁদের বিদায় দেবার সময়ও তিনি মুখ্যমন্ত্রীভবনের প্রধান দ্বার পর্যন্ত এসে গাড়ী ছাড়ার অপেক্ষা করেন। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করা ব্যাপারে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কয়েকটা বিশেষ নিয়ম আছে। সকালের দিকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া কাউকে তিনি দর্শন দেন না। যথাসম্ভব যাঁরা যেমন আসেন তেমন তিনি তাঁদের ডেকে পাঠান; অনেকক্ষণ কাউকে বসিয়ে রাখেন না। কিন্তু এরই মধ্যে নিয়মের ব্যতিক্রম তিনি ক'রে থাকেন। সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের মধ্যে লেখক, শিক্ষক, সমাজকর্মীদের তিনি কিছু আলাদা খাতির দেখিয়ে থাকেন। বিরোধী দলগুলির নেতাদের নিজে এসে ওপরে নিয়ে যান, দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেন বিদায় নেবার সময়। কংগ্রেসী নেতাদেরও তাই। তাঁর সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং চীফ সেক্রেটারী এক সময় হাজির হ'লে, রাজকার্যের অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন না থাকলে, তিনি সম্পাদককে আগে ডেকে পাঠান।

পেশাদার রাজনীতির সবচেয়ে কঠিন অংশ হ'ল দলরক্ষা, দলের নেতৃত্ব আয়ত্তে রাখা। এ জন্যে বহু রকম বহু চরিত্রের মানুষের সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দেখা করতে হয়, আলোচনা, গল্প, দলনীতি, কূটনীতি চলিয়ে যেতে হয়। যতটা সম্ভব এ জাতীয় লোকেদের সঙ্গে তিনি সন্ধ্যাবেলা সাক্ষাৎ করেন।

খাস-বাড়ীর একতলায় বিরাট্ বসবার ঘরে তিনি সন্ধ্যাবেলা সমাসীন থাকেন। একে একে, বা দু-চারজনের দলে দলে এঁরা সব আসতে শুরু করেন। বারান্দায় সারি-বাঁধা বেতের চেয়ারে উপবিষ্ট হন। যাঁরা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের "আপনার" লোক, তাঁরা অন্যদের তুলনায় সহজ ভাবে চলাফেরা করেন; অন্যরা এঁদের দেখে খানিকটা দমে যান।

"আপনার" লোকেরা বাড়ীর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ান, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ছেলেদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ গল্প করেন, তিওয়ারীর সঙ্গে নিচু-গলা সলা-পরামর্শ। মাঝে মাঝে এক-একজন আলাপ-রত কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সামনে সটান চলে গিয়ে হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম ক'রে বারান্দায় এসে উপবিষ্ট হন: মুখে তৃপ্তির ও অহঙ্কারের হাসি ফুটে ওঠে। মাঝে মাঝে আবার একদল "আপনার" লোক হৈ-হল্লার সঙ্গে বাড়ীতে ঢুকে সোজা বসবার ঘরে চলে যান; কৃষ্ণদ্বৈপায়নও আরব্ধ বাক্যালাপ অসমাপ্ত রেখে উঠে দাঁড়ান, "নমস্তে-র আদান-প্রদান হয়, হাসি-হল্লায় ঘর মুখরিত হয়ে ওঠে, বারান্দায় এসে মুখ্যমন্ত্রী এঁদের আসনে বসিয়ে পুনরায় অপ্রতিভ, সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে খণ্ডিত আলাপের অবিস্মৃত সূত্র পুনর্ধারণ করেন।

এ সব সাক্ষাৎপ্রার্থীর মধ্যে একদিকে যেমন রাজনৈতিক খেলার সব রকম খেলোয়াড়—ছোট, মাঝারী, বড়, আদর্শবাদী, আদর্শহীন, ভ্রষ্টাদর্শ; ঐকান্তিক কর্মী ও ঐকান্তিক স্বার্থান্বেষী; দলীয় ষড়যন্ত্রে হাত-পাকা বিশ্বস্ত অনুচর, সতত বিশ্বাসভঙ্গে অভ্যস্ত বিনীত-মুখোস অপরিহার্য সাঙ্গেত; আবার অন্যদিকে কনট্রাক্টার, জমিদার, গাড়ী-লরী-বাসের লাইসেন্স প্রার্থী, শিল্পপতি, কৃষাণ-শ্রমিক-আন্দোলনের নেতা; এক-কথায় উদয়াচলের মানব-সমাজের সব প্রকার প্রতিনিধি।

এঁদের চেহারা বহু বছর ধ'রে প্রতিদিন দেখে দেখে, প্রতিদিন এঁদের সঙ্গে কথা ব'লে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এঁদের নাড়ী-নক্ষত্র চিনে গেছেন। এঁরা হাঁ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এঁদের পেটের কথা বুঝতে পারেন; মুখের দিকে তাকালেই বেশির ভাগ সময় এঁদের অভিপ্রায়, প্রার্থনা, মতলব, ব্যথা-বেদনা-নালিশ তাঁর কাছে ধরা প'ড়ে যায়।

রাজনৈতিক খেলায় যাঁরা নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ, তাঁদের প্রত্যেকের চরিত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ভাল ক'রে জানা হয়ে গেছে; তাঁদের দুর্বলতা, স্খলন-পতন, আবার দৃঢ়তা ও শক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয়

ঘনিষ্ঠ। তিওয়ারীর তত্ত্বাবধানে তিনি নিজস্ব সংগোপন সংবাদ সরবরাহের একটি কার্যকরী চ্যানেল তৈরী করেছেন ; প্রকৃত বা সম্ভাবিত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা দল রাখতে গেলে যাদের গতিবিধি, কার্যকলাপ, চিন্তাধারার ঘনিষ্ঠ পরিচয় অপরিহার্য, তাদের প্রায় সবকিছু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রয়োজনের পূর্বাহ্নেই জানতে পারেন। দুষ্ট লোকেরা বলে থাকে তিনি তাঁর একান্ত নিজস্ব গোয়েন্দা-বিভাগ জানসাধারণের পয়সায় এ প্রদেশের সর্বত্র প্রসারিত ক'রে রেখেছেন।

কিন্তু তিনি জানেন, রাজকার্যের জন্যে এই ধরনের সংবাদ সরবরাহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়! প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের গতিবিধি, স্খলন-পতন, ত্রুটী-বিচ্যুতি সম্বন্ধেও তিনি নিজস্ব সংবাদ-দাতাদের কাছ থেকে নিয়মিত খবর পেয়ে থাকেন।

প্রত্যেক উচ্চপদস্থ অফিসারের সম্বন্ধে তাঁর নিজের একটি ক'রে "ডোসিয়র" আছে, তিওয়ারীর সুদক্ষ হাতে তৈরী। প্রয়োজন না হলে তিনি এ সব অস্ত্র ব্যবহার করেন না। অফিসারদের হেনস্তা করা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের স্বভাব নয় ; বরং তিনি মনুষ্য-চরিত্রের শত-সহস্র দুর্বলতা জানেন, বোঝেন, মার্জনাও করেন! কিন্তু তিনি এ কথাও জানেন যে, ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অফিসারদের ওপর পুরা কর্তৃত্ব বজায় রাখা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সহজ নয়। অথচ এই অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদন করতে না পারলে শাসনযন্ত্র বিকল হতে বাধ্য। তাই তিনি নিজস্ব পরিচালনা-নীতি আবিষ্কার করে তার নিপুণ ব্যবহারে দিনে দিনে পারদর্শী হয়ে উঠেছেন।

চিফ সেক্রেটারী বিদায় নিলে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিওয়ারীকে ডাকলেন।

"শ্রীবাস্তব হরিশংকর ত্রিপাঠীর সঙ্গে গতকাল দেখা করেছিল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ওর ধারণা হরিশংকরজী নতুন মুখ্যমন্ত্রী হবেন।"

তিওয়ারী তাচ্ছিল্য-হাসি হাসল।

"শ্রীবাস্তবের ফাইলটা আমাকে দিয়ো।"

"আজ্ঞে।"

"দিল্লী যেতে হতে পারে একবার।"

"কবে যেতে চান?"

"যেতে চাই নে। পর্শু তবু যেতে হতে পারে।"

"প্লেনে রিজার্ভ ক'রে রাখব।"

"আর একটা কথা।"

"আজ্ঞা করুন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

তিওয়ারী দেখল তাঁর গৌরবর্ণ কঠিন মুখখানা হঠাৎ বেদনা-গম্ভীর।

"দুর্গাপ্রসাদ শহরে আছে?"

"তিলকগড় গিয়েছিল। গতকাল ফিরেছে।"

"তাকে একবার ডেকে আনতে পার?"

তিওয়ারী চুপ করে রইল।

দু'বছর কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সঙ্গে পুত্র দুর্গাপ্রসাদের দেখা হয় নি।

রুক্ষ ব্যঙ্গ স্বরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "তাকে বোলো, আমার তার কাছে বড় দরকার। আমি, তার পিতা, সাক্ষাৎপ্রার্থী।"

একটু পরে টেলিফোন বাজল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রিসীভর তুলে বললেন, "কোশল।"

অন্য প্রান্তে দুর্গাভাই কৃপাশঙ্কর দেশাই।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "নমস্তে দুর্গাভাইজী। আপনি কেন ফোন করতে গেলেন? আমি নিজেই এক্ষুণি আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম।"

দুর্গাভাই বললেন, "আপনি যখন তলব করলেন তখনও আমার

পূজা শেষ হয় নি। এক্ষুণি পূজা সেরে ঘরে এসেছি। বলুন, কি হুকুম?"

"লজ্জা দেবেন না, দুর্গাভাইজী। আপনাকে হুকুম করতে পারে উদয়াচলে এমন ব্যক্তি জন্মায় নি।"

"তা হ'লে, বলুন কি প্রয়োজন?"

"এগারটায় ক্যাবিনেট মিটিং। তার আগে আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।"

"বলুন।"

"গোবর্ধন বাঁধ পরিকল্পনায় দুটো ব্রীজের কন্‌ট্রাক্ট ব্যাপারটা আজ ক্যাবিনেটে আসছে শুনছি।

"হুঁম্।"

"উদয়াচল কনষ্ট্রাক্‌শন এ কনট্রাক্টটা চাইছে।"

"হুঁম্।"

"ওদের টেণ্ডার ত দেখছি ভালই।"

"আমি দেখি নি। পুরো ফাইল আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"ওদের দিতে আমার আপত্তি নেই।"

"আমার আছে।"

"কেন বলুন ত?"

"কোশলজী, মন্ত্রীদের বোধ করি সবচেয়ে বড় সমস্যা তাদের সন্তানরা। আমি জানতাম না উদয়াচল কনষ্ট্রাকশনের সঙ্গে আমার ছেলে শঙ্করের কোনও সম্পর্ক আছে। দিন সাতেক আগে আমি জানতে পেরেছি। অন্য যে কেউ কনট্রাক্ট পাক না কেন, উদয়াচল কনষ্ট্রাকশন কিছুতেই পাবে না।"

"দুর্গাভাইজী," কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নরম সুরে বললেন, "আপনার এই লৌহকঠিন সততাকে আমি শ্রদ্ধা করি। সারা ভারতবর্ষে আপনার মত চরিত্রবান্ কংগ্রেস নেতা বেশি নেই। তবু আমার একটা কথা আছে।"

"বলুন।"

"মন্ত্রীর ছেলে হওয়া কি অন্যায়? মন্ত্রীর সন্তানরা সৎভাবে ব্যবসা করতে গেলেও তাদের সুযোগ দেওয়া যাবে না?"

দুর্গাভাই বললেন, "কোশলজী, মন্ত্রী হওয়াটাই ভয়ানক অন্যায়! মন্ত্রী হয়ে আমরা যদি সাধারণ মানুষের মত বাস করতে পারতাম, অন্যায়টা কম হ'ত। মন্ত্রীর ছেলেদের এমন কিছু করতে যাওয়া উচিত নয়, আমার মতে, যাতে বাপের মন্ত্রীত্বের বিন্দুমাত্র অপব্যবহারের সুযোগ থাকতে পারে। শঙ্কর, যতদূর জানি, খুব সচ্চরিত্র নয়। দু'একবার আমার নাম ভাঙ্গিয়ে ছোটখাট সুবিধে সে আদায় করতে চেয়েছে ব'লে খবর পেয়েছি। আপনি কবি মানুষ, জানেন ত শেক্সপীয়র বলেছেন, সুনাম একবার গেলে মানুষের আর কিছুই বাকী থাকে না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "আপনি খুব খাঁটি কথা বলেছেন। আপনাকে বলতে দ্বিধা নেই, শঙ্করভাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি তার কাগজপত্র দেখেছি—ব্যবসায় সে যথাসম্ভব সততা দেখিয়ে এসেছে। ব্রীজ দুটোর জন্যে এদের টেণ্ডার সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক। আমি ভেবেছিলাম ন্যায্যভাবে কনট্রাক্ট উদয়াচল কনষ্ট্রাকশন পেতে পারে। তবু একবার আপনাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখব ভাবছিলাম।"

দুর্গাভাই জবাব দিলেন, "ক্যাবিনেটে এ ব্যাপারটা টেনে আনবার দরকার ছিল না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "একেবারেই না।"

"তবে এল কি করে?"

"ত্রিপাঠীজী চাইলেন, তাই।"

"হরিশংকরজী?"

"তিনি আমার কাছে নোট পাঠালেন গোবর্ধন বাঁধের যাবতীয় কনট্রাক্ট সম্বন্ধে ক্যাবিনেটে আলোচনার দাবী জানিয়ে!"

হুঁম্।"

"আচ্ছা, দুর্গাভাইজী। আপনাকে কষ্ট দেবার অপরাধ মার্জনা করবেন। আপনি যা ঠিক করেছেন আমার তাতে পুরো সায় আছে। কনট্রাক্টটা বোধ করি হনুমান নেশনবিল্ডিং কোম্পানী পাবে।"

দুর্গাভাই কিছুক্ষণ চুপ রইলেন; তারপর বললেন, "ওটা কার কোম্পানী আপনি ভালই জানেন।"

"আপনি যতটা জানেন আমি তার চেয়ে বেশি জানি না।"

"তা হ'লে ওদের দেবেন কেন?"

"দেবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে খুব জোর দিয়ে আমি কিছু করতে চাই না। তবে আপনি যদি আপত্তি করেন, আমি আপনার পেছনে দাঁড়াতে পারি।"

দুর্গাভাই বললেন, "দেখা যাক।"

সাড়ে দশটায় মাধব দেশপাণ্ডের গাড়ী মুখ্যমন্ত্রী ভবনের দ্বারে উপস্থিত হ'ল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিচে নেমে এসে মাধব দেশপাণ্ডেকে স্বাগত করলেন। বহু দিনের অভ্যাসমত দু'জনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। হাসিমুখে কুশলমঙ্গল বিনিময় হ'ল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মাধব দেশপাণ্ডেকে নিয়ে নিজের অফিস ঘরে ঢুকলেন। সযত্নে তাঁকে বসিয়ে দু'চারটে মামুলী কথার পর দলীয় রাজনীতিতে নিমগ্ন হলেন।

ছয়

অনেক বছর আগে ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসন থেকে স্বাধীনতায় মুক্ত করবার সম্মোহনী সংগ্রামে আরও অনেকের মত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল যখন অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই ভাবেন নি, একদিন তাঁকে সমগ্র এক প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করতে হবে।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে তাঁরা নিজেদের দেশের সেবক মনে করতে শিখেছিলেন; সেবক যে শাসক হবে, শাসনের মধ্যে যে সেবার চরম বিন্যাস থাকতে পারে একথা মহাত্মা যত্ন ক'রে তাঁর শিষ্যদের শেখান নি।

আজ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁর সৃষ্টিশীল মনের নির্জন ভাবচর্চায় বুঝতে পারেন, নেতৃত্ব নামক রহস্যময় ভূমিকা সেদিন থেকেই কতগুলি অনুচ্চারিত কারণে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। কুষাণপুরে তিনি যে অল্পায়াসে কংগ্রেসের নেতা হ'তে পেরেছিলেন তার কারণ ছিল তাঁর শিক্ষা, সামাজিক প্রতিপত্তি, বংশগৌরব, পসার, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দল গঠনের নিপুণ কলা-কৌশল জ্ঞান। জিলা বোর্ডের সভাপতিত্ব করবার বছরগুলতে নানারকম মানুষের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ তার হয়েছিল। মনুষ্যচরিত্রকে বুদ্ধি ও কৌতুকের সঙ্গে বিচার করবার প্রশস্ত সুযোগ আদালতে আইন-ব্যবসা করতে গিয়েও তিনি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। পরবর্তী জীবনে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজের নেতৃত্বকে কুষাণপুরের সুগঠিত দলায় কাঠামোয় দৃঢ় প্রতিষ্ঠার পর প্রাদেশিক ক্ষেত্রের বৃহত্তর পরিধিতে প্রসারিত করবার সার্থক প্রচেষ্টায় জিলা বোর্ড ও আদালতের পরিপক্ক অভিজ্ঞতার তিনি সুচারু ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।

তথাপি, দীর্ঘকাল উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রীত্ব করবার সময়, তার কবি-মনে বার বার অসহ্য অস্থিরতার সঙ্গে যে প্রশ্ন জেগেছে, যার

উত্তর তিনি কখনও খুঁজে পান নি, তা হল: এই আট কোটি মানুষের সবরকম ভাল-মন্দের ভার বিধাতা আমার উপরে কেন ন্যস্ত করলেন? এ ভার বইবার যোগ্যতা আমার কোথায়? কোন্ রহস্যকাঠির ছোঁয়ায় সাধারণ মানুষ অসাধারণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়? কেন হয়? ইতিহাস যখন তাঁর বিচার করে, তখন কি তার স্মরণ থাকে যে, আরও দশজনের মত অসাধারণ মানুষও অতি সাধারণ, তার দৃষ্টি অনিবার্য কারণে সীমিত; মাংস তার ক্ষুধার্ত, চিত্ত দুর্বল ও চঞ্চল; মন স্নেহাতুর, প্রলুব্ধ; শক্তি পরিমিত; বুদ্ধি-বিবেচনা অসমাপ্ত? রাজার চেয়ে প্রজার শাসন শ্রেয়তর হতে পারে, কিন্তু অনেক বেশি কঠিন। রাজার সব আছে, তাই কিছুতে তাঁর আকাঙ্ক্ষা নেই। শাসন তাঁর রক্তের বীজ। প্রজার কিছু নেই, তাই আকাঙ্ক্ষা তার অপরিমিত, শাসনে তার প্রতিরোধ মজ্জাগত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মাঝে মাঝে উপলব্ধি করেছেন, শাসন খাটে একমাত্র দুই শ্রেণীর লোকেদের; রাজা ও ঋষি। তাই সবচেয়ে সার্থক শাসক রাজর্ষি। যে রাজা নয়, ঋষিও নয় অথচ শাসক, ইতিহাস তাকে কঠিন বিচারে কঠোর দণ্ড দেয়, কারণ পদে পদে তাব স্খলন অনিবার্য, তার ভুলের সীমা থাকতে পারে না, তার দুর্বলতা বিধবার ভোগলিপ্সার মত নিন্দনীয় হ'লেও স্বাভাবিক।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ব্যক্তিত্বে রাজনৈতিক নেতা ও কবি এই দুই ধারা সমান্তরাল প্রবাহিত। তাই তিনি শাসন করতে পেরেছেন, পেরেছেন দল গঠন ক'রে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে, পুষ্ট করতে। রোম নগরী জ্বলে ছারখার হবার সময় যে-নীরো বেহালা বাজিয়েছিলেন তিনি সম্রাট-শাসক ছিলেন না, ছিলেন কবি, শিল্পী। জ্বলন্ত রোমের আর্ত চীৎকার সুরসাগরে নিমগ্ন নীরোর কানেও পৌঁছায় নি। ইতিহাস নীরোকে যতই মন্দ বলুক, সেই ভয়ংকর মুহূর্তে তিনি ছিলেন অপরাজেয়, ইতিহাসের অনেক দূরে, যেখানে সুর ও সৌন্দর্য আনন্দ-ঐক্যতানে প্রেমাচ্ছন্ন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনেক বার মনে

হয়েছে, রাজ্য যাদের চালাতে হয় তাদের প্রত্যেককে নীরো হওয়া একান্ত দরকার। যখন রাজকার্য অথবা দলীয় রাজনীতিতে ভয়ংকর কোনও গোলমাল বেধেছে, নীরোর মত তিনিও চেয়েছেন সবকিছু থেকে পালিয়ে কোথাও গিয়ে বেহালা বাজাতে। অর্থাৎ কবিতার ও সাহিত্যের রসে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে, অথবা যে-কোনও আনন্দে ডুবে থাকতে। কখনও বা পেরেছেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পারেন নি : ঘটনা-দুর্ঘটনার উত্তাল তরঙ্গে তাঁকে বিধ্বস্ত হ'তে হয়েছে। কিন্তু সামলে যে উঠতে পেরেছেন তার কারণ, তিনি জানেন, তার নেতৃত্ব-গুণের চেয়েও কবিমন, যেখানে নিজের দুর্বলতাকে তিনি মানবজীবনের বৃহত্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেরেছেন। অন্যের দুর্বলতাকেও। সেখানে সর্বদা মৃদু উচ্চারণে বিশ্ব-বিবর্তনের অমর সাক্ষী তাঁকে অনুক্ষণ ব'লে গেছে : এই অনন্ত ভাঙ্গা-গড়া, ভোগ-ত্যাগ, জীবন-মৃত্যু, উত্থান-পতনের অমীমাংসিত রহস্যের কোনওদিন মীমাংসা হবে না ; তুমি যাই করো, যতই করো, একদিন সব লোপ পেয়ে যাবে। তুমি মানুষ, তোমার দুর্বলতা অশোধনীয়। তোমার শক্তির মধ্যে লুক্কায়িত অশক্তি, ক্ষমার মধ্যে প্রতিহিংসা, প্রেমের মধ্যে ঘৃণা, ত্যাগের মধ্যে লোভ, মৈত্রীতে বৈরিতা, বন্ধুত্বে বিশ্বাসঘাতকতা। তুমি ক্ষত্রিয় নও, ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও : তুমি একসঙ্গে সব।

দুর্গাভাই-এর সঙ্গে টেলিফোনে বাক্যালাপ শেষ ক'রে মাধব দেশপাণ্ডের আগমন প্রতীক্ষার স্বল্পক্ষণে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মনে এসব পুরাতন ভাবনা পুনরায় খেলে গেল। রাজনীতি যাঁদের পেশা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মনে মনে বললেন, তাঁদের প্রথম পরিহার্য হ'ল রাজনীতিকে নেশায় পরিণত করা। অন্য দশটা পেশার মত রাজনীতিকেও যথাসম্ভব নিরাবেগ চিত্তে গ্রহণ করা দরকার। রাজনীতিতে উত্তেজনা নিশ্চয় আছে, বৈচিত্র্যও ; কিন্তু আবেগহীন

দূরদৃষ্টি ছাড়া এ খেলায় জয় কঠিন। পাকা রাজনৈতিক যদি অসূয়াহীন না হন, যদি তাঁর অন্তরের গভীরে সবকিছু নিয়ে, এমন কি নিজেকে নিয়েও, কৌতুকবোধের ক্ষমতা না থাকে, তা হ'লে শেষ পর্যন্ত তার পরাজয়ের সম্ভাবনা। আমি জিতব, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, কেননা আমি নিরাবেগ, 'সিনিক'; দুর্গাভাই হারবেন, কারণ তিনি রাজনীতিকে বড় বেশি বিরাট ক'রে দেখেন। আর মাধব দেশপাণ্ডে? কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঠোঁটে হাসির বক্ররেখা খেলে গেল।

দুর্গাভাই মেহতা উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী হ'তে পারতেন। হন নি, তার একমাত্র কারণ, তিনি রাজনীতি খেলতে জানেন না। গুজরাট অঞ্চল থেকে দুর্গাভাই-এর বাবা বহু বছর আগে উদয়াচলে চ'লে আসেন। চাল ও বজরার ব্যবসা করতেন। বিলাসপুরে পাঠ সমাপ্ত ক'রে দুর্গাভাই ওখানকার সরকারী কলেজে অধ্যাপক হয়েছিলেন। ছোটখাট সুদর্শন চেহারা, গমের মতো চকচকে তামাটে গায়ের রং; মুখে-চোখে আদর্শবাদের প্রশান্ত দীপ্তি।

ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত নীতিপরায়ণ। সত্যভাষী, সহজ-সোজা আদান-প্রদানে বিশ্বাসী। উনিশ শ' ত্রিশ সালে গান্ধীজীর শিষ্য হয়ে একত্রিশের সত্যাগ্রহের সময় সরকারী কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দেন। পত্নী মনোরমা ও চার পুত্রকন্যার অর্থাভাব হ'ত না, যদি দুর্গাভাই পিতার সঙ্গে সদ্ভাব রাখতেন। ব্যবসা-ধনী কৃষ্ণলাল-ভাই ইংরাজ সরকারের সুনজরে প'ড়ে রায় বাহাদুর হয়েছিলেন। পুত্র ইংরাজের বিরুদ্ধে গান্ধীর খাতায় নাম লিখিয়ে লড়াই করবে, এতে তাঁর গভীর আপত্তি ছিল। তাতে দুর্গাভাই-এর স্বার্থহানি হ'ত না যদি-না তিনিও পিতার রায়-বাহাদুরিতে আপত্তি ক'রে বসতেন। বাপ চাইলেন, ছেলে স্বদেশী ছাড়ুক; ছেলে চাইলেন, বাপ রায়-বাহাদুর খেতাব বর্জন করুন। গোলমাল বাঁধল। আদর্শবাদী মনের মস্ত দোষ নীতিতে একগুঁয়ে বিশ্বাস এবং আত্ম-

নিপীড়নে গোপন পরিতৃপ্তি। দুর্গাভাই সপরিবার পিতার সংসার ত্যাগ করলেন। সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে যখন তাঁর জেল হ'ল, কৃষ্ণলালভাই মনোরমা ও নাতি-নাতনীদের ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। মনোরমার ইচ্ছে ছিল ফিরে যান। স্বামীর স্বদেশীতে তাঁর অন্তরের সায় ছিল না। কিন্তু ফিরে গিয়ে স্বামীর অপমান করার সাহস তাঁর হ'ল না। বছর দুই বেশ কষ্টে কাটাতে হ'ল।

জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দুর্গাভাই অন্য মানুষ। দেশসেবা তখন নেশায় দাঁড়িয়েছে। আদর্শের সঙ্গে মিশেছে অপূর্ব উত্তেজনা। দুই অতল প্রবাহের মায়া-মিশ্রণে তখন তিনি আত্মহারাঃ দেশপ্রীতির প্রবাহ, গান্ধীবাদের প্রবাহ।

তখনকার কংগ্রেসী কর্মপন্থা অনুযায়ী প্রথম দুর্গাভাই চেষ্টা করলেন বিলাসপুরে ন্যাশনাল কলেজ স্থাপন করতে; অর্থাভাবে ও যথেষ্ট শিক্ষিত লোকের উৎসাহের অভাবে, সফল হলেন না। তখন তিনি গান্ধী-পন্থায় একটি স্কুল তৈরী করলেন। পত্নী মনোরমাকে নিলেন কর্মসঙ্গিনী করে।

স্কুলে ছাত্র বেশি হ'ত না, বেতন ছিল সামান্য, তাই অর্থকষ্ট দুর্গাভাই-এর নিত্যসহচর হ'ল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁর কাজ এগিয়ে গেল। স্কুলের সঙ্গে তৈরী হ'ল আশ্রম, আশ্রমের ভিত্তিতে গ'ড়ে উঠল সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন কর্মপন্থা। চরকা কিনে আশ-পাশের গ্রামে, শহরের বস্তিতে বিলি করা হ'ল; গ'ড়ে উঠল অনেকগুলি চরকাকেন্দ্র। ছাত্র সমাজে দুর্গাভাই-এর নেতৃত্ব প্রসারিত হ'ল। যুবক-যুবতীদের নিয়ে তিনি একটি কর্মিষ্ঠ দল গঠন করতে পারলেন। এ দলের আদর্শ হ'ল পরিপূর্ণ গান্ধীবাদ। মদের দোকানে পিকেটিং করা; গ্রামবাসী, বস্তিবাসীদের মধ্যে স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করা; চরকা-সূতোর কাপড় তৈরী করা; বিদেশী পণ্য বর্জনে জনমত তৈরী করা।

দুর্গাভাই উদয়াচলে গান্ধীজীর প্রধান মন্ত্রশিষ্য ব'লে সম্মানিত হলেন।

এ সম্মান আরও বেড়ে গেল দুর্গাভাই যখন ১৯৩৭ সালে উদয়াচলে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীত্বের মুকুট সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। শুধু ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের পুলকিত নেশায় মগ্ন; এই দৃঢ়বিশ্বাসে যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজের হাতে হাত মিলিয়ে শাসন করা স্বদেশ-প্রেমের অবমাননা ছাড়া আর কিছু নয়। গান্ধী কংগ্রেসী মন্ত্রীত্বের সপক্ষে ছিলেন না প্রথমে, পরে যখন তিনি নেতাদের সমবেত ইচ্ছায় সায় দিলেন, দুর্গাভাই সেই প্রথম গুরুর সঙ্গে একমত হ'তে পারলেন না। তাঁর ভিন্ন মত গান্ধীর কাছে তাঁকে প্রিয়তর করল।

১৯৩৮ সালে দুর্গাভাই সুভাষ বসুর সমর্থক হয়ে উঠলেন; সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বানে প্রাণ তাঁর নেচে উঠল। ১৯৩৭ সালে যদি তিনি সরে না দাঁড়াতেন, উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রীত্ব কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের কবলিত হ'ত না। দুর্গাভাই মন্ত্রীত্ব গ্রহণ নীতির বিরোধী হওয়ায় শাসন দায়িত্বের ভার পড়ল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শক্তিমান্ হাতে। পরে, সুভাষ বসুর কংগ্রেস সভাপতিত্ব সমর্থন ক'রে দুর্গাভাই গান্ধাজীর কিঞ্চিৎ বিরাগভাজন হ'লেন। অবশ্য গান্ধীজীর নেতৃত্বে ও গুরু-ভূমিকায় গভীর আস্থা তাঁকে সুভাষ বসুর সঙ্গে একত্র রাজনীতির রাজনৈতিক আত্মহত্যা থেকে বিরত রাখল। ত্রিপুরী কংগ্রেসে তিনি গান্ধীপন্থীদের দলে যোগ দিলেন। তারপর এল বিশ্বযুদ্ধ এবং কংগ্রেসের শেষ "ভারত ছাড়" সংগ্রাম। দুর্গাভাই ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুজনেই কারাবরণ করলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে এক বছর কারাবাসের পর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুক্তি পেলেন। দুর্গাভাই জেল থেকে বেরোলেন কংগ্রেসী নেতাদের শেষ দলের সঙ্গে।

অনেক বাক্-বিতণ্ডা, আলোচনা, কলহ, মারামারি-কাটাকাটির মধ্যে ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হ'ল। দুর্গাভাই দেখতে পেলেন, ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭-এর মধ্যে কংগ্রেসের নেতাদের মনে দারুণ পরিবর্তন এসেছে। সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা স্তিমিত, সংগ্রামে অনুচ্চারিত

আতঙ্ক। লড়বার বদলে ইংরাজের সঙ্গে আপোষ-মীমংসায় শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতার হস্তান্তরে আগ্রহ। উদয়াচলে, দুর্গাভাই দেখতে পেলেন,আসন্ন শাসন-ক্ষমতা-হস্তান্তরের অপেক্ষায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দলীয় রাজনীতির ওপর আপন নেতৃত্ব সুগঠিত ক'রে নিয়েছেন। তাঁর অন্তরে বিদ্রোহের নিনাদ বেজে উঠল, কিন্তু বাস্তব বিচারে তিনি বুঝলেন, কংগ্রেস নেতারা যে-পথ বেছে নিয়েছেন তার বিপরীত পথে দেশবাসীকে চালিত করবার না আছে সংগঠন, না নেতৃত্ব। বামপন্থী দলগুলির মধ্যে সাম্যবাদীরা দুর্বল, অস্থির-চিত্ত, বিক্ষিপ্ত-মতি ; যুদ্ধের সময় বার বার নীতি-পরিবর্তনে দেশবাসীর আস্থা থেকে বঞ্চিত ; সমাজতন্ত্রীরা কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে আসলে মোটামুটি একমত। দেশের ইতিহাসকে ভিন্নপথে পরিচালিত করতে পারতেন কেবল একজন ; তিনি, সেই সুভাষচন্দ্র বসু, হয় মৃত, নয় দেশান্তরিত। সতের বছরের সংগ্রাম-তপ্ত দুর্গাভাই দুর্বল আতঙ্কে প্রথম বুঝতে পারলেন, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়বার পথ শেষ ; আপোষের পথ শুরু। বুঝলেন, চান কি না চান, আপোষ-বিবর্তনে যোগ না দিলে রাজনীতির পথ এবার শেষ।

রাজনীতি যে করতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা দুর্গাভাই-এর ছিল না। গান্ধীজীর কাছে গিয়ে তিনি নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের হিসাব-নিকাশ করলেন। গান্ধীজীর তখন ভয়ংকর মানসিক সঙ্কট। যে পথে তিনি এতদিন জাতীয় সংগ্রাম চালিত করেছেন, সেই পথের বাস্তব পরিণতি দেখে তাঁর চিত্ত শঙ্কিত। ভারতবর্ষের যে মূর্তি তাঁকে আজীবন সংগ্রামের প্রেরণা জুগিযেছে সে ছিল শান্ত, বিভব-বিকশিত ; আজ সে সংহারী, আত্মসংহারী। অথচ বিকল্প পথের সন্ধান জানা নেই এই ঐতিহাসিক মানুষের ঃ ইতিহাস তৈরী করতে গিয়ে অন্তিম অধ্যায়ে তিনি ইতিহাসের হাতে বন্দী। "ভারত ছাড়" সংগ্রাম আরম্ভ করবার সময়ে তিনি বলেছিলেন, "যদি আমাদের সর্বনাশের মধ্যেও ছেড়ে যেতে হয়, তবু, তুমি ইংরেজ, বিদেয় হও।"

তখন তাঁর আশা ছিল সর্বনাশ থেকে ভারত নিজের মুক্তির পথ বার করবে। ইংরেজ যাবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই যে ভারত দ্বি-খণ্ডিত হবে, আর তাও ধর্মের ভিত্তিতে, এবং দ্বি-খণ্ডনের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ পাশবিক অত্যাচারের আগুনে নিজেরা জ্বলবে, দেশকে জ্বালাবে, গান্ধীজী তা সত্যিকারের ভেবে দেখেন নি। কিন্তু ঘটনা প্রবাহ এমন ত্বরিত-গতিতে প্লাবনের মত ধাবিত, যে তিনি নিঃসহায় বেদনায় ক্লান্ত।

দুর্গাভাই গান্ধীজীর কাছে উদ্দীপ্ত পথ-নির্দেশ পেলেন না। তখন তার একমাত্র ব্রত. সাম্প্রদায়িক হত্যার কলঙ্ক থেকে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানকে উদ্ধার করা। দুর্গাভাই চাইলেন গান্ধীজীর সহচর হতে। কিছুদিন তাঁর সঙ্গে কলকাতায় ও বিহারে ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু উদয়াচলের আহ্বান এল। যাঁরা দুর্গাভাই-এর কাছে দেশসেবার দীক্ষা নিয়েছিলেন তারা দাবি করলেন, তাঁকে মন্ত্রীত্ব করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী হ'তে হবে। দুর্গাভাই সহজে রাজী হলেন না। গান্ধীজী তখন থেকেই কংগ্রেসকে রাজনৈতিক দল হিসেবে ভেঙ্গে দেবার কথা ভাবছিলেন। তাঁর অন্তরঙ্গদের সঙ্গে এ নিয়ে কিছু আলাপ-আলোচনাও হয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর নেতারা গান্ধীজীর পরিকল্পনায় উৎসাহ দেন নি; সবচেয়ে নিরুৎসাহ ছিলেন জবাহরলাল নেহেরু। গান্ধীজী ভাবছিলেন, কংগ্রেস তার কাজ, ভারতের স্বাধীনতা-অর্জন অসমাপ্ত ভাবে সমাপ্ত করেছে। তার ঐতিহাসিক ভূমিকা শেষ হয়েছে। এবার ১৮৮৫ সালে প্রারব্ধ সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল বিয়োগান্ত নাটকে যবনিকা পড়ুক। যারা রাজনীতি করতে চায়, দেশ-শাসনের নেতৃত্ব যাদের ওপর বর্তেছে, তারা এক বা একাধিক দল গঠন করুক : জবাহরলাল হোক বামপন্থী দলের নেতা; বল্লভভাই দক্ষিণপন্থী দলের নেতা। তা হ'লে ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা চলবে সংগঠিত শক্তিতে। নইলে, বর্তমান ব্যবস্থায়, কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ক্ষমতার ব্যাপক, দীর্ঘ সম্ভোগে দুর্বল, কলুষিত, আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়বে। তার মধ্যে না থাকবে মতের ঐক্য, না পথের।

গান্ধীজী আরও ভাবছিলেন, যাঁরা ক্ষমতার ও রাজনীতির বাইরে থেকে দেশসেবা করতে চান, তিনি তাদের নিয়ে নতুন সংগঠন তৈরী করবেন। কংগ্রেসের ঐতিহাসিক ভূমিকায় গান্ধী-যুগের বিবর্তনের তাঁরা হবেন উত্তরাধিকারী। তারা মন্ত্রীত্ব নেবেন না, ক্ষমতা তাদের দম্ভ বাড়াবে না। তাঁরা গ্রামে গ্রামে ভারতবর্ষের আসল লোকদের সর্বোদয়ে মনোনিবেশ করবেন।

দুর্গাভাই-এর ইচ্ছা ছিল গান্ধীজীর সঙ্গে গ্রামের সর্বোদয়ে কাজ করবার। কিন্তু তাও হ'ল না।

প্রথম বাধা এল গান্ধীজীর কাছ থেকে। তিনি বললেন, তার পরিকল্পনা এখনও ভ্রূণাবস্থিত; কার্যকরী হবে কি না অনিশ্চিত। ইতিমধ্যে প্রদেশে প্রদেশে যথাসম্ভব বলিষ্ঠ মন্ত্রীসভা গঠন করা দেশের কল্যাণের জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয়। উদয়াচলের রাজনৈতিক চেতনা প্রখর নয়। মন্ত্রী হবার যোগ্যতা রয়েছে এমন লোক কংগ্রেসে বেশি নেই। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল দলের ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে রয়েছেন। তাঁকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়ত দুর্গাভাই হতে পারবেন না। কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ক্ষমতা যদি কেউ বেশ কিছুটা শাসনের মধ্যে রাখতে পারেন তিনি হলেন দুর্গাভাই। সুতরাং, গান্ধীজীর অভিমত, দুর্গাভাই বর্তমানে উদয়াচলের দাবি মেটান; পরে, তাঁর নতুন সংগঠন পরিকল্পনা যদি কার্যকরী হয়, মন্ত্রীত্ব ছেড়ে বনবাসী হবার পথ ত খোলাই থাকবে।

দুর্গাভাই বিলাসপুর ফিরে এলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং রেল-স্টেশনে এসে তাকে সম্বর্ধনা করলেন। তখন তিনি উদয়াচল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

দুর্গাভাই-এর ইচ্ছে হ'ল, কিছুদিন উদয়াচলের কংগ্রেস-রাজনীতি ভাল ক'রে বুঝে নেন। সময় হ'ল না। মন্ত্রীসভা গঠন আসন্ন। যেদিন তিনি বিলাসপুরে এসে পৌছলেন, সেদিন রাত্রেই একদল

কংগ্রেসী সহকর্মী তাঁর বাড়ী এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের সমবেত অনুরোধ ও দাবি, দুর্গাভাইকে মুখ্যমন্ত্রী হ'তে হবে।

দুর্গাভাই দেখতে পেলেন, এঁদের সবাই তাঁব মন্ত্রশিষ্য নন। এমন কয়েকজন আছেন যাঁদের তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের লোক বলে জানতেন। তাঁর একদা-অনুগতদের মধ্যে চারজনকে তিনি খুঁজে পেলেন না। বুঝলেন, মন্ত্রীত্ব গঠন নিয়ে নববিধান আরম্ভ হয়েছে। এ এক নতুন লড়াই। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে নয়। ক্ষমতার লড়াই, নিজেদের মধ্যে, ভাই-এ ভাই-এ। বন্ধুতে বন্ধুতে। সহকর্মীর সঙ্গে সহকর্মীর। এই হ'ল অন্তর্বিরোধের শুরু। আত্মঘাতী অন্তর্যুদ্ধ, যার থেকে নিস্তার নেই, পলায়ন নেই।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরুদ্ধে এদের নালিশ অনেক। তিনি সত্যিকারের কংগ্রেসী নন। একদা ইংরাজের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল, তিনি জমিদারের বন্ধু। তিনি ক্যাপিটালিষ্টদের টাকায় রাজনীতি করেন। গান্ধীজীর আদর্শে, কর্মপন্থায় তাঁর বিশ্বাস নেই। তিনি সুবিধাবাদী। তাঁর চরিত্র অকলঙ্ক নয়। তিনি সাম্প্রদায়িক। মুখ্যমন্ত্রী হলে নিজের দলকে তিনি পুষ্ট করবেন। তাঁর ক্ষমতাপ্রিয়তা সীমাহীন।

তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন উদয়াচলে একমাত্র দুর্গাভাই। প্রদেশের প্রতি, দেশের প্রতি এ তাঁর প্রধান কর্তব্য।

দুর্গাভাই এঁদের কথা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন :

"কোশলভাই-এর বিরুদ্ধে আমি দাঁড়ালে আপনারা আমায় সমর্থন করবেন?"

সবাই বললেন, "নিশ্চয়।"

"নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের বেশির ভাগ কোশলভাই-এর অনুরাগী। তাই নয় কি?"

"তাঁরা আপনার অনুরাগী হবেন, যদি আপনি আমাদের নেতা হন।"

"মাধবভাই, আপনি ত কৃষ্ণদ্বৈপায়নজীর বিশেষ বন্ধু।"

মাধব দেশপাণ্ডে বেশি কথা বলেন নি। হাঠৎ কিছু বলতেও পারলেন না।

তুর্গাভাই পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "আপনি তাঁকে ত্যাগ করছে কেন ?"

মাধব দেশপাণ্ডে এবার বললেন,"মারাঠা-সম্প্রদায় কোশলজীকে চায় না। আমাদের স্বার্থ তাঁর হাতে নিরাপদ নয়।"

তুর্গাভাই মনে মনে বললেন, তাহ'লে বিবর্তন-চক্র পূর্ণ ঘুরেছে। এখন অখণ্ডিত ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের বিপরীত স্বার্থের পর খণ্ডিত স্বাধীন ভারতের উদয়াচল প্রদেশে মারাঠা-হিন্দীরও বিপরীত স্বার্থ।

বললেন, "আপনি মনে করেন মারাঠা সম্প্রদায়ের স্বার্থ আমার হাতে নিরাপদ থাকবে ?"

মাধব দেশপাণ্ডে বললেন, "আপনি অন্য মানুষ। আপনি নেতা হ'লে আমরা সুবিচারের আশা করতে পারব। কি উপায়ে আমাদের স্বার্থ নিরাপদ করা যেতে পারে তা নিয়ে অবশ্য বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে।"

তুর্গাভাই মনে মনে বললেন, অর্থাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল যে দাম দিতে রাজী আছেন, আমাকে তার চেয়ে বেশি দাম দিতে হবে।

নজর পরল সুদর্শন তুবের ওপর। সুদর্শন তুবে উদয়াচল কংগ্রেসের সেক্রেটারী।

তুর্গাভাই বললেন, "সুদর্শন, তুমি মন্ত্রী হ'তে চাও না, শুনেছি।"

সুদর্শন তুবে বললেন, "ঠিকই শুনেছেন।"

"তুমি কেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরুদ্ধে যাচ্ছ ?"

"কংগ্রেসের বৃহত্তর স্বার্থে।"

"বুঝিয়ে বল।"

"আপনি কোনওদিন কংগ্রেসের সংগঠনে বিশেষ সংযোগ রাখেন নি। অনেকটা বাইরে থেকে দেশের কাজ করেছেন। সংগঠনের

মধ্যে যে সব দুর্নীতি দুরাচার বাসা বেঁধেছে তার খবর হয়ত আপনার জানা নেই।"

"তোমরাই ত কংগ্রেসকে চালিয়ে এসেছ। যদি দুর্নীতি দুরাচার বাসা বেঁধে থাকে তা হ'লে তোমাদের জন্যই হয়েছে।"

"কোশলজা যতদিন কংগ্রেসের সভাপতি থাকবেন, ততদিন কিছু করার উপায় নেই।"

"তুমি ত সেক্রেটারী!"

"আমার কোনও ক্ষমতা নেই।"

"শুনেছি তুমি এবার সভাপতি হ'তে চাইছ।"

মাধব দেশপাণ্ডে বললেন, "আমাদেরও তাই ইচ্ছে।"

"মন্ত্রী হ'তে চাও না কেন, সুদর্শন?"

"রুচি নেই, দুর্গাভাইজা। আমি কংগ্রেসকর্মী হয়েই থাকতে চাই।"

"কর্মী নয়, সুদর্শন," ক্লান্ত হেসে দুর্গাভাই মন্তব্য করলেন "কর্মী আর তোমরা কেউ হ'তে চাও না, নেতা হ'তে চাও।"

রাত্রি গভীর হ'ল যখন এঁরা সব বিদায় নিলেন। বিছানায় শুয়ে দুর্গাভাই মনোরমাকে প্রশ্ন করলেন: "তুমি জান ওরা কেন এসেছিল?"

মনোরমা বললেন, "জানি।"

"তুমি চাও আমি মুখ্যমন্ত্রী হই?"

"আমি চিরদিন তোমার অনুসরণ করে এসেছি। স্বদেশী করবার আগে ত কোনওদিন জানতে চাও নি আমি চাই কি না চাই।"

"করি নি, তার কারণ আমি জানতাম তুমি চাও নি।"

"তবে আজ কেন জিজ্ঞেস করছ?"

"আজ বড় মজা লাগছে, বড় বিস্ময় লাগছে। আজ সবাই চাইছে, কেউ আর না চাওয়ার দলে নেই। সবাই পেতে চাইছে;

কেউ দিতে চাইছে না। ক্ষমতা চাইছে, শক্তি চাইছে। সেবার জন্যে, ত্যাগের জন্যে আর কেউ রাজী নয়।"

"জমানা বদলে গেছে।"

"নিশ্চয়।"

"দেশ স্বাধীন হয়েছে। তাকে চালাতে হবে। শাসন করতে হবে।"

"সেবা করতে হবে না?"

"শাসনের মধ্য দিয়ে সেবা করা যায় না?"

"যায়। তার জন্যে শ্রীরামচন্দ্রের মত রাজা চাই। যুধিষ্ঠিরের মত রাজা চাই।"

"বাজে কথা।"

"হয়ত তাই। আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না?"

"এ প্রশ্ন তোমার। জবাব তুমিই দেবে। প্রশ্ন আমার নয়।"

দুর্গাভাই দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে নীরব হ'লেন। মনোরমা সতের বছর আগে যা ছিল আজ আর তা নেই। সতের বছর আগে গান্ধীর শিষ্যত্ব নেবার সময় তিনি পত্নীর অনুমতি চান নি। জানতেন, চাইলে মনোরমা অনুমতি দেবে না। পিতার ঐশ্বর্য, সরকারী কলেজের সম্মানিত অধ্যাপনা সব কিছু ছেড়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামের বন্ধুর বিপজ্জনক পথে স্বামীকে এগিয়ে দেবার কোনও তাগিদ তার ছিল না। অনুমতি চেয়ে না পেলেও দুর্গাভাইকে পথে বেরিয়ে পড়তে হ'ত। পত্নীর সঙ্গে সে সংঘাত তিনি চান নি।

পরবর্তী কালে মনোরমা তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু প্রতিবাদ অন্তরে গোপন রেখে। শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে বিরোধ তিনি চান নি, স্বামী যে কৃচ্ছ্রসাধনা স্বেচ্ছায় ডেকে এনেছেন, তাকে গ্রহণ করেও তার মাহাত্ম্যে তিনি বিচলিত হন নি। স্বামীর কাজে যোগ দিয়েছেন, পাশে দাঁড়িয়েছেন ভয়ে ও কর্তব্যবোধে, প্রেমে বা আদর্শ-উত্তাপে নয়। দুর্গাভাই-এর কারাবাসের বছরগুলি মনোরমা কেমন ক'রে কাটিয়েছেন তার বিস্তারিত খবর স্বামীকে জানাবার

প্রয়োজনবোধ করেন নি। তা হ'লেও দুর্গাভাই জানেন, পিতার অর্থে তিনি নিজে নির্লোভ হ'তে পারেন, কিন্তু মনোরমা নন। মনোরমা তাঁর পুত্রকন্যাদের শ্বশুরালয়ে রেখেছেন, নিজেও মাঝে-মধ্যে গিয়ে থেকেছেন। সন্তানরা দরিদ্র হোক তিনি কখনও চান নি, সহ্য করতে পারেন নি। মনোরমা তাঁর প্রশ্নের জবাব না দিলেও দুর্গাভাই জানেন, পত্নীর ইচ্ছে তিনি রাজসম্মান পান, উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এত বছরের স্বেচ্ছাকৃত দুঃখকষ্টের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করুন।

সারারাত দুর্গাভাই-এর ভাল ঘুম হ'ল না। নানা চিন্তার জটাজালে আবদ্ধ হয়ে তিনি ছটফট করলেন। ভোর না হ'তেই উঠে পড়লেন। তখনও বিনিদ্র রজনীর জটিল চিন্তা কাটে নি, দেহমনে ক্লান্তি ও অবসাদ জড়িয়ে আছে। গৃহে ফিরে স্নান সেরে নিত্যকার চেয়ে অনেক বেশি সময় পূজায় বসলেন। তথাপি মন শান্ত হ'ল না। পূজান্তে যৎসামান্য প্রাতরাশ ক'রে বসবার ঘরে এসে দিনের করণীয় কাজকর্মের মানসিক পর্যালোচনা করছেন এমন সময় বাইরে গম্ভীর আওয়াজ হ'ল।

"দুর্গাভাই আছেন?"

দরজা খুলে দুর্গাভাই দেখলেন দ্বারপ্রান্তে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল।

দুর্গাভাই ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের চেহারায় প্রচণ্ড অমিল। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন দীর্ঘাঙ্গ, দুর্গাভাই ছোট্ট মানুষ। দুজনেই ফর্সা, কিন্তু দুর্গাভাই-এর রং গমবর্ণ, গৌরকান্তি নয়। মাথা ভরতি টাক। কপালে গভীর কুঞ্চন, চোখের প্রান্তেও। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাসিকায় প্রদীপ্ত দম্ভ, দুর্গাভাই-এর নাক চাপা, চওড়া। নাকে ও চিবুকে কেমন এক কোমলতা। তাঁর ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা নম্র; বিনীত: কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মত প্রদীপ্ত নয়। কথা বলেন আস্তে, হাসেন

লাজুক অপ্রতিভতায়। অথচ এমন একটি সুদৃঢ় স্থৈর্য তাঁর আয়ত্ত যা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নেই। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নের মত প্রখর। দুর্গাভাই প্রভাতের মত প্রশান্ত।

দেশসেবায় দুজনের মধ্যে দীর্ঘকালের পরিচয়। দুজন দুজনকে জানেন-চেনেন বিলক্ষণ। পবিচয় কদাপি গভীর বন্ধুত্বে উত্তীর্ণ হয় নি। কিন্তু দুজনেই, বিপরীত কারণে, দুজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানেন দুর্গাভাই-এর এমন অনেক গুণ আছে যা তাঁর নেই। দুর্গাভাই জানেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শাসন করার জন্মগত শক্তি আছে, যা তাঁর নেই।

দুজনের মধ্যে আরও একটি বন্ধনসূত্র আছে, যা খুব বেশি লোকে জানে না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানেন, দুর্গাভাই জানেন, তাঁদের পত্নীরা জানেন।

একটি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির বন্ধন আছে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-পত্নীর সঙ্গে দুর্গাভাই-এর। আশ্রম ও বিদ্যালয় তৈরীতে দুর্গাভাই সবচেয়ে বেশি অর্থ পেয়েছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-পত্নীর কাছ থেকে। তাতে মনোরমা খুশী হন নি। কৃষ্ণদ্বৈপায়নও না। তথাপি দুই দুর্গের মধ্যে একটি সেতু তৈরী হয়েছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানেন প্রয়োজন হ'লে তার ব্যবহার তিনি করতে পারবেন।

দুর্গাভাই কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সাদরে ঘরে বসালেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "কাল আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন, নইলে রাত্রিতেই আসতাম। কিছু জরুরী কথা আছে আপনার সঙ্গে।"

"আমিও ভাবছিলাম একটু পরে আপনার কাছে যাব।"

"তা হ'লে দেখুন, এমন কিছু আছে, যা আমাদের, পরস্পরের নিকটে টেনে আনছে," কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে বললেন।

"তাই ত মনে হচ্ছে।"

"আমাকেই টানছে বেশি, তাই আপনি যাবার আগে আমি এসেছি।"

"আপনি নেতা, গৌজন্যেও আপনারই নেতৃত্ব।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দু'চারটে অন্য কথার পর কাজের কথা পাড়লেন।

"আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজকের নয়। আমাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য ও মতানৈক্য আছে, তবু, আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন, আমরা দুজন দুজনকে চিনি।"

দুর্গাভাই নিঃশব্দে, নিশ্চল সায় জানালেন।

"সুতরাং আমি আপনার সঙ্গে পরিষ্কার কথা বলতে চাই।"

"সেই ভাল।"

"আপনি আমি দুজনেই সাধ্যমত দেশের সেবা করেছি। নানা কারণে উদয়াচলে কংগ্রেসী সংগঠনের নেতৃত্ব আমার হাতে ন্যস্ত হয়েছে। আপনি কখনও দলের সঙ্গে খুব বেশি জড়িয়ে পড়েন নি।"

"ঠিক।"

"দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা আর দল গঠন করা এক জিনিষ নয়, দুর্গাভাইজী।" কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখে বাঁকা হাসি ফুটল;

"তা আমি জানি।"

"আপনি প্রজ্বলিত দীপশিখার মত শোভা পেয়েছেন, আলো দিয়েছেন; প্রদীপের পাদদেশে পুঞ্জীভূত অন্ধকার নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হয় নি।"

"এবার আপনি কবির মত বলছেন। আপনার কথা ঠিক। তা হ'লেও একটা কথা বলব। প্রদীপের নীচের অন্ধকারে তার নিজের তামসও মিশে থাকে।"

"থাকে বৈ কি দুর্গাভাইজী। আমি হাজার বার আপনার কাছে মানব যে আমার তামস অন্য কারুর অন্ধকারের চেয়ে কম কালো নয়।"

"বুদ্ধির বা বাক্-চাতুর্যের লড়াইএ আপনাকে কাবু করা আমার সাধ্য নয়। বলুন কি বলছিলেন।"

"স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হয়েছে; দেশ এখন স্বরাজ পেয়েছে। এবার আমাদের শাসনভার গ্রহণ করতে হবে। উদয়াচলে কংগ্রেস সংগঠন কোনওদিন খুব শক্তিশালী ছিল না। ১৯৪২ সালেও আমরা চারশ ছত্রিশ জনের বেশি কংগ্রেসকর্মীকে জেলে যাবার জন্যে তৈরী করতে পারিনি। কিন্তু কংগ্রেস অপ্রতিদ্বন্দ্বী—অন্য কোনও রাজনৈতিক সংগঠন থেকে আমাদের ভয়ের কারণ নেই। অর্থাৎ নির্বাচনে আমরা স্বল্পায়াসে নিশ্চিন্ত সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারব।"

"আমারও তাই ধারণা।

"কিন্তু এর মধ্যে অনেক কথা আছে। গত কয়েক মাসে কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা কত বেড়েছে জানেন?"

"কত?"

"দশ হাজার।"

"বলেন কি?"

"এরা কারা; এই নতুন সভ্যরা? জমিদার, ব্যবসায়ী তালুকদার, সুদখোর মহাজন কনট্রাকটার, কুলির সর্দার, মিলের গুণ্ডা, চোরা-কারবারী, ঘুষখোর: বোধ করি উদয়াচলে এমন একজনও বাকী নেই যে কংগ্রেসের তহবিলে চার আনা পয়সা জমা দিয়ে সভ্য হয়ে বসে নি।"

"তাতে অবাক্ হবার কিছু নেই।"

"কিন্তু ভয় পাবার আছে। শিক্ষিত যুবকরা বিশেষ কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছে না। কিষাণ বা মজদুরদের সংগঠন উদয়াচলে সামান্য। তাদের মধ্যেও কংগ্রেসের সংগঠিত প্রভাব নেই।"

"তবু তারা কংগ্রেসকে ভোট দেবে।"

"তা দেবে। আমাদের সমস্যা ভোট পাওয়া নয়। কিছু কিছু এলাকায় আমরা হারব। ছত্রিশগড়ের রাজাদের মধ্যে একদল

কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, অন্যদল স্বতন্ত্রপ্রার্থী হিসাবে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁদের কেউ কেউ জিতবেন। আমাদের আসল সমস্যা অন্য। অধিকাংশ এলাকায় জমিদাররা কংগ্রেসের টিকেট চাইছেন। দিলে কংগ্রেস জিতবে; না দিলে নির্বাচন সংগ্রাম লড়বার জন্যে চাই অনেক টাকা, অনেক কর্মী, জমিদারদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে উপযুক্ত সংগঠন। পার্টির তহবিলে বেশি অর্থ নেই। নির্বাচন লড়বার জন্যে যা ব্যয় হবে তার অর্ধেকও আমাদের নেই। তা ছাড়া, লজ্জাকর হলেও একথা সত্যি, সমস্ত উদয়াচল প্রদেশে তিনশ' ছাব্বিশটি নির্বাচন এলাকায় দাঁড় করাবার মত দীক্ষিত কংগ্রেস কর্মী আমাদের নেই।"

দুর্গাভাই কিছু বললেন না।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলে চললেন, "শাসন ক্ষমতা হাতে আসবার সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজনীতি নতুন রূপ নিয়েছে। এখন আর বিদেশীর সঙ্গে ভারতের সংঘাত নয়। এখন ভারতীয়ের সঙ্গে ভারতীয়ের সংঘাত। নানা রকম স্বার্থ সংগঠিত হচ্ছে। শ্রেণী-সংঘাতের চেয়ে গোষ্ঠী-সংঘাত এখন প্রবল। জমিদারে প্রজায় সংগঠিত সংঘাত নেই, কিন্তু ব্রাহ্মণ-কায়স্থে আছে, ছত্রিশগড়ের সঙ্গে অন্যান্য হিন্দী অঞ্চলের আছে, ভাল জাতের সঙ্গে নীচু জাতের আছে, হিন্দু-মুসলমানে আছে, হিন্দী-মারাঠীতে আছে। প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজের দাবি পেশ করছে, বিধান সভায় এতজন সদস্য চাই, এই এই মন্ত্রীত্ব চাই। যার এতটুকু উচ্চাভিলাষ আছে, কিছু অর্থ আর প্রতিপত্তি আছে সেই চাইছে দলপতি হ'তে। এই শহরে রোজ অন্তত চল্লিশটি বৈঠক বসে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য উপদল গঠন, ক্ষমতা দখল। এদিকে জমিদার ও মিল-মালিক, ঠিকেদার ও ব্যবসায়ী, কনট্রাক্টার ও মহাজন কংগ্রেসের নির্বাচন তহবিলে অর্থ দিতে প্রস্তুত। মুখে তারা এখন কিছু বলছে না, কিন্তু নির্বাচনের পরে তাদের দাবি কি হবে তা বোঝা কঠিন নয়।"

দুর্গাভাই বললেন, "গতরাত্রে একদল লোক এখানে এসেছিলেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে বললেন, "জানি। কারা এসেছিলেন তাও আন্দাজ করতে পারি।"

"সুদর্শন দুবে ত আপনার লোক বলে জানতাম।"

"দুর্গাভাইজী," কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিরস হাসির সঙ্গে বললেন, "রাজনীতিতে কোনও আপন-পর নেই। এ বড় কঠিন ব্যাপার। আজ যে বন্ধু, কাল সে শত্রু। আজ যে লক্ষ্মণ, কাল সে বিভীষণ।"

"সুদর্শন দুবে কি চায়?"

"মন্ত্রীত্ব।"

"সে বলল মন্ত্রীত্ব সে চায় না।"

"মন্ত্রীত্ব চায় কেউ কি সরবে? চায় গোপনে।"

"তার কি কোনও আশা নেই?"

"আপনি যদি মন্ত্রীসভা তৈরী করেন, সুদর্শন দুবেকে নেবেন, দুর্গাভাইজী?"

"না।"

"তা হ'লে বুঝুন।"

"মাধব দেশপাণ্ডে কি চায়?"

"নিজের জন্যে অন্যতম প্রধান পোর্টফোলিও, অন্ততঃ শতকরা চল্লিশ ভাগ মারাঠা মন্ত্রী।"

"সর্বনাশ! এ দেখছি জিন্না সাহেবের বুলি।"

"যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর বললেন:

"দুর্গাভাইজী, আমি আপনার কাছে এসেছি এ সব খবর দেবার চেয়েও বড় উদ্দেশ্য নিয়ে। আমি জানি কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে সকলে আমার প্রতি সমান দয়াবান্ নন। সবাকার কৃপা পাবার মত যোগ্যতাও আমার নেই। আমার শক্তিও যেমন আছে,

দুর্বলতারও শেষ নেই। মানুষ হিসেবে, দেশকর্মী হিসেবে আপনি আমার নমস্য। উদয়াচলের আজ যতটুকু সম্মান ও গৌরব তার অনেকখানি আপনার জন্যে। আপনার সবচেয়ে বড় গুণ আপনি নীতিতে কঠোর, আপনি নির্লোভ। না, না, দুর্গাভাইজী, আপনাকে স্তুতি করছি না, তাতে আমার লাভ নেই, স্তুতি আপনাকে বিগলিত করবে না; আমি যা বলছি তা সত্যি। অন্যদিকে, রাজনীতি আপনার চেয়ে আমি বেশি বুঝি; দল রাখবার কলাকৌশলে আপনার চেয়ে আমি অনেক দক্ষ ও অভিজ্ঞ। আপনাকে প্রতারণা করার চেয়ে আমাকে ঠকানো অনেক কঠিন আমি মহতের সঙ্গে মহৎ ব্যবহার করতে পারি; কাঁটা দিয়ে পায়ের কাঁটাও তুলতে পারি। আপনি তা পারেন না।"

দুর্গাভাই কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এই আন্তরিক স্পষ্ট ভাষণে চমৎকৃত হলেন।

"আজ স্বাধীনতার পর উদয়াচলে কংগ্রেসী শাসনপর্বের সূচনা চলছে। দলে অনেক রকম ছোট-বড় সংঘাত বাধবে। কিন্তু একটা সংঘাত কিছুতেই যেন না বাধে দুর্গাভাইজী।"

"কোন্ সে সংঘাত?"

"আপনার আমার।"

দুজনেই কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। কথাটার তাৎপর্য যেন পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করবার সময় নিলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "যদি বাধে, আপনি হারবেন। তার কারণ এই নয়, যে আমি মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্যে দৃঢ়সংকল্প। মন্ত্রীসভা গঠনের কলা-কৌশল আপনি প্রয়োগ করতে পারবেন না। কি ক'রে সুদর্শন দুবেকে হাতে রেখেও তার মন্ত্রীত্বের আশা বিনাশ করতে হবে, আপনার জানা নেই। রাজনীতির নোংরামি আপনার সহ্য হবে না। তথাপি, আন্তরিক ভাবে বলছি," কৃষ্ণদ্বৈপায়নের স্বরে গাম্ভীর্যের সঙ্গে বিনম্র কোমলতা এক সঙ্গে বেজে উঠল, "আন্তরিকতার

সঙ্গে বলছি, আপনি যদি মন্ত্রীসভা গঠনের দায়িত্ব নিতে চান, আপনার হাতে সে ভার ছেড়ে দিতে আমি প্রস্তুত।”

দুর্গাভাই-এর মুখে কথা সরল না।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, “আপনি আমি একত্র না দাঁড়ালে উদয়াচলে কংগ্রেস টিকবে না; সমস্ত প্রদেশের বদনাম হবে। যে আদর্শ নিয়ে আমরা এত দীর্ঘকাল দেশের সেবা করেছি তার কিছুই এবার বাস্তবে পরিণত করা যাবে না। আপনি নেতা হ'লে আমি নেতৃত্ব ছাড়তেই শুধু রাজী নই, আপনাকে যথাশক্তি সাহায্য করতেও রাজী। আরও পরিষ্কার ক'রে বলি। আপনি যদি চান, আপনার অধীনে মন্ত্রী-সভায় যে কোনও পদ গ্রহণ করতে আমি তৈরী। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, মন্ত্রীসভার বাইরে থেকে কংগ্রেসের সংগঠনে আত্ম-নিয়োগেও আমার পূর্ণ সম্মতি থাকবে।”

দুর্গাভাই একেবারে অভিভূত হয়ে গেলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলে গেল। তিনি দু'হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন।

বললেন, “আপনি আমায় নিশ্চিন্ত করলেন।”

“তা হ'লে এ দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করছেন।”

“না। এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন একমাত্র আপনি। রাজ-নীতি, দলনীতি আমি বুঝি নে। এ কাজ আপনার।”

“আপনি ভেবে দেখুন দুর্গাভাইজী”

“অনেক ভেবেছি। কাল সারারাত ঘুমোই নি। যত ভেবেছি, ভয় তত বেড়েছে। তবু মনে গভীর একটা সংশয় ছিল। আপনাকে আমি পুরো জানতে পারি নি। অনেকের অনেক কথা মনে সংশয় এনেছিল। এবার তা দূর হ'ল। যদি কেউ কংগ্রেসী শাসনের সূচনা উদয়াচলে করতে পারে, সে আপনি।”

“কিন্তু আমার দাবী এবং অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে।”

“সাধ্যের অতিরিক্ত না হ'লে নিশ্চয় রাখব।”

"যে মনোভাব নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে কাজ করতে এখনও তৈরী আছি, সে মনোভাব নিয়ে আমার সঙ্গে আপনাকে কাজ করতে হবে।"

"আমাকে মন্ত্রীত্ব থেকে বাদ দিলেই আমি সুখী হব।"

"তাতে উদয়াচলের ক্ষতি হবে।"

"তাই যদি হয়, আমি আপনার সঙ্গে থাকব।"

এবার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুর্গাভাইকে আলিঙ্গন করলেন।

"আপনার এ ঔদার্যের আমি কোনওদিন অসম্মান করব না।"

রাজনীতির প্রথম পর্বে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রকাণ্ড বিজয় নিয়ে সেদিন ঘরে ফিরেছিলেন।

সাত

মারাঠা সম্প্রদায়কে হাতে রাখার রাজনৈতিক চারুকলায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যাঁর কাছে সবচেয়ে সাহায্য পেয়েছেন তাঁর নাম মাধব দেশপাণ্ডে। চিৎপাবন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, রাজনীতি-কূটনীতি এঁদের ধমনীতে হাজার হাজার বছর প্রবাহিত। মাধব দেশপাণ্ডের শীর্ণ দেহে প্রথম অপরাহ্নের বিগলিত দীপ্তি; হঠাৎ দেখলে শুচিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ব'লে শ্রদ্ধা হয়। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের দেহ বিধাতা যেন হাতুড়ি পিটিয়ে মজবুত করেছেন, কোথাও এতটুকু বাড়তি মেদ নেই। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল কদম-ছাঁট, অপ্রশস্ত ললাটে সারি সারি গভীর কুঞ্চন। চওড়া চোয়াল বেখাপ্পা কায়দায় হঠাৎ ভেঙ্গে অনেকটা ত্রিকোণ চিবুকে নেমে এসেছে, তাতে মাধব দেশপাণ্ডের মুখখানা কেমন ছন্দহীন, অযত্নে গড়া। চ্যাপ্‌টা নাক, পাতলা ওষ্ঠাধর, বিড়াল-চোখ।

মাধব দেশপাণ্ডেও একদা আইন পাস ক'রে জিলা আদালতে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। বাপের কিছু পয়সা ছিল, নিজের বাড়তি উৎসাহ ছিল, তাই জিলা শহরেই একদিন এক সাপ্তাহিক মারাঠী পত্রিকার পত্তন করলেন। যেহেতু উদয়াচলের সেই জিলায় মারাঠা সম্প্রদায় ছিল সংখ্যা-গরিষ্ঠ, এবং মাধব দেশপাণ্ডের পত্রিকা "মাতৃভূমি" মারাঠাদের মুখপত্রের ভূমিকা দাবী কবেছিল, সেহেতু কিছুদিনের মধ্যে তা জনপ্রিয় হয়ে উঠল। মাধব দেশপাণ্ডে বোম্বাই-এ মারাঠা নেতাদের কাছে পরিচিত হবার সুযোগ পেলেন। তারপর একদিন দেখা গেল, তিনি জিলা শহর ত্যাগ ক'রে "মাতৃভূমি"-সহ রাজধানী বিলাসপুরে উঠে এসেছেন।

তখন থেকে তাঁর আসল কর্মক্ষেত্র হ'ল "মাতৃভূমি"। সাপ্তাহিককে তিনি দৈনিকে পরিণত করলেন। তিন দশকের অসহযোগ

আন্দোলনে মাধব দেশপাণ্ডে সাবধানী পথ অনুসরণ ক'রে 'মডারেট' নামে পরিচিত হন। তাতে পত্রিকার ব্যবসা পুষ্ট হ'ল, এবং মাধব দেশপাণ্ডেকে কারাবাস করতে হ'ল না। কিন্তু ১৯৩৭ সালে যখন কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করল, তখন মাধব দেশপাণ্ডেও "মাতৃভূমি"র ভূমিকা বদলে দিলেন। "মাতৃভূমি" পুরোপুরি কংগ্রেস-পন্থী হয়ে দাঁড়াল। মাধব দেশপাণ্ডে হাত মেলালেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের সঙ্গে। ১৯২১-এর আন্দোলনে তাঁর সংক্ষিপ্ত কারাবাস হ'ল। ইংরেজ-রাজের 'ভারত-রক্ষা আইনের' প্রতিবাদে "মাতৃভূমি" তিন মাস সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাড়াই আত্মপ্রকাশ করল। দেশসেবার চিরাচরিত দীক্ষা পেয়ে মাধব দেশপাণ্ডে রাজনৈতিক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা পেলেন। "মাতৃভূমি"র লাভ খাটিয়ে মাধব দেশপাণ্ডে একখানা ইংরেজী দৈনিকও শুরু করলেন। নাম দিলেন, 'দি পিপ্‌ল'।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যখন পাকা মন্ত্রীত্ব গঠনে উদ্যোগী হলেন, মাধব দেশপাণ্ডে তখন এক রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ালেন।

মারাঠা সমাজে মাধব দেশপাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রজাপতি শেউড়ে। ১৯৩৭ সাল থেকে বলতে গেলে মাধব কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রাজনৈতিক সহকর্মী। প্রজাপতি শেউড়ে মারাঠা সমাজে মাধবকে হিন্দী-ভাষীদের বন্ধু ব'লে নিন্দা করেন। প্রজাপতি বয়সে অপেক্ষাকৃত নবীন; ছাত্র ও শ্রমিক মহলে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব। কংগ্রেসের মধ্যে থেকেও তিনি উদয়াচলের মারাঠা-প্রধান জিলাগুলি একত্র ক'রে ভিন্ন প্রদেশ গঠনের নীতিতে বিশ্বাসী। এ ধরনের স্বতন্ত্র মারাঠাভাষী প্রদেশ গঠনে মাধব দেশপাণ্ডের অমত নেই, কিন্তু তাঁর ধারণা এ রাজনৈতিক স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবার সম্ভাবনা কম। তাই হিন্দীভাষীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজনীতি করার পথ তাঁর কাছে শ্রেয়তর। প্রজাপতি শেউড়েও জানেন স্বতন্ত্র মারাঠা প্রদেশ উদয়াচলের অঙ্গচ্ছেদ ক'রে তৈরী হওয়া সম্ভব নয়, যদি কখনও হয়, তা হ'লে বোম্বাই-এর মারাঠা অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হয়েই তার জন্ম

সম্ভব। মাধব দেশপাণ্ডে জানেন যে, ঐ রকম সংযুক্ত মারাঠা প্রদেশে তাঁর প্রতিপত্তি খুব বেশী থাকবে না; বোম্বাই-এর মারাঠা নেতারাই নেতৃত্ব করবেন। তাই মারাঠা প্রদেশ আন্দোলনের প্রতি নিরুৎসাহ সমর্থন জানিয়েও তিনি আপাতত হিন্দীওয়ালাদের সঙ্গে একত্রে রাজনীতি করার পক্ষপাতী। প্রজাপতি শেটিয়ে উদয়াচল মন্ত্রীসভায় অন্যতম উপমন্ত্রী; সুতরাং সংযুক্ত মারাঠা প্রদেশ গঠনে তাঁর উৎসাহ অনেক বেশী। ক্ষমতা-ক্ষেত্র প্রসারিত না হ'লে তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাশা ফলবতী হবে না, এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি তিনি রাখেন।

কোশল মন্ত্রীসভা গঠনের উদ্যোগ-পর্বে মাধব দেশপাণ্ডের সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক আঁতাত ছিল। তথাপি দুজন দুজনকে পুরো বিশ্বাস করতেন না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উদয়াচল কংগ্রেসের সাংগঠনিক নেতা ছিলেন; "মাতৃভূমি" তাঁকে মোটামুটি সমর্থন করত। বাইরে দুজনের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব দেখা যেত। কিন্তু মাধব দেশপাণ্ডে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে কখনও ঠিক বুঝতে পারতেন না। এক সময় মনে হ'ত লোকটির কিছুটা রাজনৈতিক সততা আছে, অন্তত খানিকটা দেশপ্রেম আছে; অন্য সময় মনে হ'ত কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সম্বল একমাত্র অসাধারণ আত্মবিশ্বাস, অসামান্য ধূর্ততা, সিদ্ধান্তে ও কর্মে ক্ষিপ্রতা এবং দার্শনিক সুবিধাবাদ। আবার এক-এক সময়, যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাজনীতি এড়িয়ে কাব্য ও জীবন-রহস্য নিয়ে আলাপ করতেন, মাধব দেশপাণ্ডের মনে হ'ত এ যেন একেবারে অন্য মানুষ। রাজনৈতিক চালে নিজেকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে কেমন যেন এ্যামেচার খেলোয়াড় মনে হ'ত: তাঁর দীপ্ত, নাসিকা-শাসিত মুখে তাকিয়ে মাধব দেশপাণ্ডের রক্তপ্রবাহ হঠাৎ মন্থর হয়ে আসত। তিনি জানতেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে উদয়াচলে রাজত্ব করা যাবে না। অথচ তাঁকে আলিঙ্গন যে আত্ম-বিলোপ, এ কথাও বুঝতে পারতেন।

মাধব দেশপাণ্ডের প্রতি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মনোভাব বোঝা যেত

তিনি যখন ঘনিষ্ঠতম রাজনৈতিক সহচরদের বলতেন, "কোনও মারাঠা ব্রাহ্মণকে পুরো বিশ্বাস কোরো না। বিশ্বাসঘাতকতা ওঁদের রক্তে দীর্ঘকাল লুকিয়ে রয়েছে।"

দুর্গাভাই দেশাইকে মুখ্যমন্ত্রী করবার সংক্ষিপ্ত প্রচেষ্টায় মাধব দেশপাণ্ডের সায় ছিল। তিনি আশা করেছিলেন দুর্গাভাই উঁচু দামে তাঁর সহযোগিতা কিনতে রাজী হবেন। দুর্গাভাই সরল ভাল মানুষ, গান্ধীজীর চেলা; তাঁর আদর্শ সুপরিচিত। রাজনৈতিক খেলায় তাঁর কাছে হারবার সম্ভাবনা কম, হারলেও তাতে নিজেকে ছোট মনে হবার জ্বালা থাকবে না। দুর্গাভাইকে মুখ্যমন্ত্রীত্ব নেবার অনুরোধ বহন ক'রে যাঁরা একদিন রাত্রিবেলায় তাঁর বাড়ীতে হাজির হয়েছিলেন, মাধব দেশপাণ্ডে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে বিশেষ দ্বিধা করেন নি। সংশয় ও ভয় যে একেবারে ছিল না তা নয়—দুর্গাভাই অগ্রসর না হ'লে মাধব দেশপাণ্ডেকে এ জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন লাঞ্ছনা করবেন, তিনি ধ'রে নিয়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতিতে যে সতীত্বের দাসখৎ নেই, এ সাধারণ সত্য এ কর্মে যাঁরা অবতীর্ণ তাঁরা সবাই জানেন।

মন্ত্রীত্ব গঠনের সেই প্রথম অধ্যায়েই বার বার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মাধব দেশপাণ্ডেকে চমকিত ক'রে দিয়েছিলেন। যেভাবে তিনি দুর্গাভাই দেশাইকে জয় ক'রে নিলেন তাতে তাঁর পরম শত্রুরাও চমৎকৃত না হয়ে পারেন নি। দুর্গাভাই মুখ্যমন্ত্রী ত হ'তে চাইলেনই না, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রধান সহকর্মী হয়ে নিশ্ছিদ্র সহযোগিতায় তাঁর পাশে দাঁড়ালেন।

এমন যে হবে, মাধব দেশপাণ্ডে একেবারে ভাবেন নি। দুই মহারথীর এই আকস্মিক একতায় উপদলীয় নেতারা অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তার মধ্যে মাধব দেশপাণ্ডের অবস্থা ছিল সঙ্গীন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে তিনি ষড়যন্ত্রকারী, বিশ্বাস-অযোগ্য; দুর্গাভাই দেশাই-এর কাছে স্খলিত-চরিত্র। তা ছাড়া, তাঁর রাজ-

নৈতিক ইতিহাসও দুর্বল ছিল: দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন মডারেট, কারাবাসের গৌরবে প্রায় বঞ্চিত। তাঁর একমাত্র রাজনৈতিক দাবি, তিনি মারাঠা নেতা: এ দাবি সাম্প্রদায়িক হ'লেও দুর্বল ছিল না; মাধব দেশপাণ্ডে বুঝতে পেরেছিলেন, স্বাধীন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের জোর ক্রমে বেড়ে চলবে, কমবে না। আঞ্চলিক দাবিকে মুখর ক'রে, নিম্নতর রাজনৈতিক চেতনার মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে, তাঁর নেতারা দীর্ঘদিন নেতৃত্ব করতে পারবেন।

সুতরাং, কংগ্রেস শাসনের গঠন-পর্বে মাধব দেশপাণ্ডে মনে প্রাণে মারাঠী নেতা হয়ে উঠলেন; "মাতৃভূমি" ও "পিপল্"-এর স্তম্ভে স্তম্ভে মারাঠা-গৌরবের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল। ছত্রপতি শিবাজী, নানা পাতিল, মহামতি গোখলে, বীরবর বালগঙ্গাধর তিলক, মনীষী রাণাডে, বীর সাভারকর: সকলের জীবন-কেতন একসঙ্গে উড়িয়ে দিল তাঁর দু'খানা সংবাদপত্র। শুধু তাই নয়। "মহারাষ্ট্র সংস্কৃতি সংঘ" নামক হঠাৎ-প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের উদ্যোগে বিলাসপুরে মারাঠা কীর্তির অম্লান জ্যোতি প্রকাশ ক'রে ফেললেন মাধব দেশপাণ্ডে। হাজার কয়েক টাকা খরচ হয়ে গেল; কিন্তু তখন অর্থ-ব্যয়ে কার্পণ্য করার সময় নয়।

এতখানি উদ্যোগের পুরো মূল্য আশা করেছিলেন মাধব দেশপাণ্ডে। এই সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে তিনি আর একবার হারলেন।

শোনা গেল, মন্ত্রীসভা গঠনের খসড়া তালিকায় তাঁর নাম একেবারে বাদ পড়েছে। না কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল, না দুর্গাভাই দেশাই লিষ্টে তাঁর নাম রেখেছেন।

শুধু তাই নয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের তালিকায় অন্য একজন মারাঠা নেতার নাম। শঙ্করপ্রসাদ পাতিল। মারাঠা সমাজে বহু-সম্মানিত এই নাম। শঙ্করপ্রসাদ পাতিল রাজনীতি করেন নি। গঠনমূলক কাজে সারাজীবন ব্যস্ত থেকেছেন। উদয়াচলে মারাঠা সমাজে

শিক্ষা-বিস্তারে তাঁর দান অসামান্য। স্কুল, কলেজ, টেকনিকাল ইন্‌ষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন ; বহু প্রতিভাশীল যুবককে উচ্চশিক্ষায় সাহায্য করেছেন।

বুকে কঠিন বেদনার সঙ্গে মাধব দেশপাণ্ডে বুঝতে পারলেন, শঙ্করপ্রসাদ পাতিল মন্ত্রী হ'লে কেবল বোবা হয়ে থাকলেই তাঁর চলবে না, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এই অসামান্য ধূর্ততার ভূয়সী প্রশংসা করতে হবে।

মহারাষ্ট্র সংস্কৃতি প্রদর্শনের জন্যে অনেক টাকা ব্যয়ে মাধব দেশপাণ্ডে তিনদিন ব্যাপী যে জৌলুসের আয়োজন করেছিলেন, তার সভাপতির পদে বৃত হয়েছিলেন শঙ্করপ্রসাদ পাতিল।

হতবুদ্ধি মাধব দেশপাণ্ডে আরও জানতে পারলেন যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের তালিকায় স্থান পেয়েছেন প্রজাপতি শেউড়ে। তরুণ ও নবীন মারাঠা সমাজের নেতা।

মন্ত্রী-তালিকা পাকা হবার আগে সম্ভাব্য সদস্যদের নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজেই সাবধানে সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের কাছে ফাঁস করে দিলেন।

মাধব দেশপাণ্ডে কয়েকদিন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলেন। শঙ্করপ্রসাদ পাতিলকে মন্ত্রীসভায় আহ্বানের প্রচেষ্টা "মাতৃভূমির"র সম্পাদকীয় নিবন্ধে প্রশংসা করতে হ'ল। প্রজাপতি শেউড়ের সৌভাগ্য নিয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য করা স্থগিত রইল ; মাধব দেশপাণ্ডে নিজের স্বাক্ষরে এক প্রবন্ধে সতর্কতার সঙ্গে মন্ত্রীসভা গঠনে উদয়াচলের "দুই গৌরবান্বিত নেতাকে" সদুপদেশ দিলেন। "মারাঠা সমাজ সংখ্যায় লঘু হ'লেও গুরুত্বে লঘু নয়। শতকরা ত্রিশ ভাগকে ঠিক সংখ্যালঘু বলা চলে না। উদয়াচলের জীবন-ধারার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে এ সমাজ জড়িত। প্রদেশের সংগঠনে ও প্রগতিতে এর দান স্বীকৃত। মন্ত্রী নির্বাচনে মারাঠা সমাজকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া ঔদার্য ও বিচক্ষণতার কাজ হবে। না

দিলে নানা রকমের সঙ্কট দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। মন্ত্রীসভায় মারাঠা সমাজের প্রতিনিধি নির্বাচনে উভয় নেতাকে অনেক কিছু ভেবে দেখতে হবে। এ নিয়ে রাজনৈতিক চাল খেলা শেষ পর্যন্ত ক্ষতিকর হ'তে পারে।"

এই প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতেও কোন ফল হ'ল না।

তখন মাধব দেশপাণ্ডে দুর্গাভাই দেশাইর কাছে দূত পাঠালেন। "মাতৃভূমি"র সম্পাদক, তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর, অর্জুন ঘোরপাড়ে। তাতে ফল আরও খারাপ হ'ল।

অর্জুন ঘোরপাড়ে দীর্ঘকাল "মাতৃভূমি"র সম্পাদনা করতে করতে বৃদ্ধ হয়েছেন। বার্ধক্যে তাঁর পূর্বস্মৃতি এত প্রখর ছিল না। এ দৌত্যের পরামর্শ মাধব দেশপাণ্ডেকে তিনিই দিয়েছিলেন।

দুর্গাভাই দেশাই পূর্বস্মৃতি ভোলেন নি। মডারেট পত্রিকা "মাতৃভূমি" একদা তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করত, তিনি ভোলেন নি। সে-নিন্দার শিল্পী ছিলেন অর্জুন ঘোরপাড়ে। তাও তিনি ভোলেন নি।

দৌত্য, অতএব, কার্যকরী হ'ল না। দুর্গাভাই বললেন, "আপনারা কোশলজীর কাছে যান। তিনি দলের নেতা। তিনিই মুখ্যমন্ত্রী। আমি ত জেলে জেলেই জীবন কাটিয়েছি। আপনারা আমার কাজকর্ম বিশেষ সুনজরে দেখেন নি। কোশলজী আপনাদের অনেক ভাল জানেন, চেনেন।"

অর্জুন ঘোরপাড়ের এতক্ষণে স্মরণ হ'ল। বুঝলেন, চালে ভুল হয়েছে। বললেন, "সে ত বহুদিনের কথা। তখন অন্য কাল ছিল। সে-সব কথার আজ কি কোনও মানে আছে?"

দুর্গাভাই বললেন, "আপনাদের কাছে নেই। আমার কাছে আছে।"

অর্জুন ঘোরপাড়ে বললেন, "আপনি মহাপ্রাণ মানুষ—"

দুর্গাভাই রেগে উঠলেন, "আমি মহাপ্রাণ মানুষ নই। আমি

দুর্গাভাই দেশাই। গান্ধীর চেলা। দেশের একজন সামান্য সেবক। আমার কাছে স্তাবকতার দাম নেই।"

অর্জুন ঘোরপাড়ের মুখে কথা সরল না।

দুর্গাভাই ব'লে চললেন, "আমার কাছে স্বাধীনতার কোনও মানে নেই, স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাদ দিয়ে। কেন আমরা স্বাধীনতার জন্যে লড়েছি, কি আদর্শ নিয়ে কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছুতে, কোন্ পথে চলতে, এ সব ভুলে গেলে স্বরাজের কোনও মানে নেই। তখন স্বরাজ হ'ল হঠাৎ পাওয়া ক্ষমতার সুরা: তাকে পান ক'রে মত্ত হবার জন্যে চতুর্দিকে নোংরা কোলাহল। আপনাদের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের মানে নেই, স্বাধীনতার মানে আছে। তাই সংগ্রামের দিনে আপনারা মডারেট, সংগ্রাম শেষে ক্ষমতাপ্রার্থী। এই হ'ল আজকার রাজনীতি। এর মধ্যে আমি নেই। কোশলজী এসব বোঝেন, আপনারা তাঁর কাছে যান।"

অগত্যা মাধব দেশপাণ্ডেকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের দরবারেই দাঁড়াতে হ'ল। সহজে তিনি পারলেন না। লজ্জা বা অসম্মানের চেয়ে ভয় বেশি। রাজনৈতিক চালের ভয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ভয়ংকর ব্যক্তিত্বকে ভয়। তাঁকে না বুঝতে পারার অস্বস্তিকর ভয়।

কোশল দরবারে যাবার রাস্তা খুঁজছেন মাধব দেশপাণ্ডে, এমন সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজেই তাঁকে আহ্বান করলেন।

বিলাসপুর শহরের পূর্বপ্রান্তে প্রাচীন শিবমন্দির। অধুনা মাধব দেশপাণ্ডে প্রতি রবিবারে শিবমন্দিরে পূজা দিচ্ছেন। এক রবিবারে পূজা শেষে মন্দিরের সংলগ্ন বট গাছের ছায়ায় দেখতে পেলেন একটি তরুণ ব'সে রয়েছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কনিষ্ঠ পুত্র, চন্দ্রপ্রসাদ।

সে এসে মাধব দেশপাণ্ডের সামনে দাঁড়াল। নীচু মাথায় প্রণাম করল।

"ভালো আছেন ত, দেশপাণ্ডেজী?"

"মহাদেব যেমন রেখেছেন। তোমাদের খবর কি? পিতাজী সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন ত?"

"কাক্কাজী, কোশল সাহেবের কুশল জানবার অবকাশ আমাদের জোটে না। সে সৌভাগ্য ত আপনাদের। আপনাদের কে কে মন্ত্রীসভায় থাকবেন না থাকবেন তাই নিয়ে পিতাজীর আহার-নিদ্রা বন্ধ।"

মাধব দেশপাণ্ডের দেহ জ্বলে উঠল অথচ মনে অদম্য কৌতূহল বোধ করলেন। এক বখাটে ফাজিল ছোকরার সঙ্গে এমন গুরুতর ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলতে তাঁর রুচি নেই, অথচ এর কাছ থেকে কিছু খবর বার ক'রে নেবার আগ্রহ তিনি চাপতে পারলেন না।

"হাঁ, তা ত হবেই," মাধব দেশপাণ্ডে বললেন, "একটা সমস্ত প্রদেশের শাসনব্যবস্থা কি কম বড় দায়িত্ব? রোজ নিশ্চয় অনেক লোক যাতায়াত করছে, কি বল?"

"অনেক, অনেক, কাক্কাজী। ধরুন, আজই সকালে। দুর্গাভাই দেশাইজী, প্রজাপতি শেটড়েজী, সুদর্শন দুবেজী, হরিশংকর ত্রিপাঠীজী, নিরঞ্জন পরিহারজী, আর"—দাঁতে ঠোঁট কামড়ে, জিভে এক বিচিত্র শব্দ করে—"বাজপাঈজী।"

মাধব দেশপাণ্ডের কৌতূহল বাড়ল।

"সুদর্শনজী এসেছিলেন বুঝি?"

"উনি ত রোজ আসছেন?"

"রোজ আসছেন?"

"কোনও কোনও দিন দুবারও আসেন।"

খবরটা মাধব দেশপাণ্ডের পক্ষে শুভ নয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ও সুদর্শন দুবে একত্র হ'লে হিন্দীওয়ালাদের জোট ভয়ানক শক্ত হয়। মারাঠারা দুর্বল হয়ে পড়ে।

"প্রজাপতিও বুঝি আজ এসেছিল?"

"জী হাঁ। উনিও বেশ ঘন ঘন আসছেন।"

"শঙ্করপ্রসাদভাই আসেন না?"

"একদিন আসতে দেখেছিলাম।" চন্দ্রপ্রসাদ এবার গলা নামিয়ে বলল, "পিতাজীর সঙ্গে খুব উত্তেজিত কথাবার্তা হচ্ছিল।" এবার আরও গলা নামিয়ে: "সকালে চা খেতে ব'সে পিতাজী কি ভয়ানক গম্ভীর হয়ে রইলেন। কারুর সঙ্গে একটা কথাও বললেন না।"

"তাই বুঝি? তাই বুঝি? কেন? কেন?"

"তা কি ক'রে বলব কাক্কাজী? আমার মনে হ'ল—"

"কি মনে হ'ল তোমার?"

"আমার মনে হ'ল শঙ্করপ্রসাদজীর উপর পিতাজী খুব রেগে রয়েছেন।"

"রেগে রয়েছেন?"

"তাই ত মনে হ'ল।"

"কিন্তু, আমি যে শুনছি—যাক্ গে! শঙ্করপ্রসাদজী আর আসেন নি?"

"এসে থাকতে পারেন, আমি দেখি নি।"

"তুমি দেখ নি!"

"আজ্ঞে না। তবে—"

"তবে কি?"

"তাঁর নাকি মন্ত্রী হবার খুব ইচ্ছে।"

"তাই বুঝি? কি করে বুঝলে?"

"মনে হ'ল।"

"হুঁম্। মন্ত্রী হবার ইচ্ছে ত সবারই।"

"সবার নিশ্চয় নয়। দেখুন না, আপনার ত মন্ত্রী হবার ইচ্ছে নেই!"

"আমার? আমার কথা তুমি জানলে কি ক'রে?"

"মালুম করছি। আপনি ত পিতাজীর কাছে আসেন না?"

"মন্ত্রীত্বে আমার লোভ নেই। আমি আজীবন দেশের সেবক।

াধ্যমত দেশের সেবা করেছি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ক'রে যাব। ন্ত্রীত্বে আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই।"

"তা ত সবাই জানে। পিতাজীও তাই বলছিলেন।"

"অ্যাঁ! কোশলজীও তাই বলছিলেন? কি বলছিলেন?"

"কাল সকাল বেলা চায়ের সময় আমিই জিজ্ঞেস ক'রে বসলাম। বললাম, পিতাজী, মহারাষ্ট্র সমাজের সবচেয়ে নামকরা নেতা ত মাধব দেশপাণ্ডেজী। তাঁকে নিশ্চয় আপনি মন্ত্রীসভায় নিচ্ছেন! পিতাজী বললেন, মাধবজীকে তোমরা জানো না। মন্ত্রীত্বে তাঁর লোভ নেই। তিনি দেশকর্মী, দেশের সেবাতেই তাঁর আনন্দ, পরিতৃপ্তি। পিতাজী আরও বললেন, মাধবজীর মত লোক দেশে সবচেয়ে দরকার।"

"তাই বুঝি? তাই বুঝি? তোমার পিতাজী পুণ্যবান্ মহাপ্রাণ নেতা। তাঁর কাছে আমরা নগণ্য।"

"এই দেখুন না কাক্কাজী। মন্ত্রীসভা তৈরী হবে, তাই নিয়ে কি দারুণ কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে! পিতাজীকে আমরা কখনও এত ব্যস্ত, উত্তেজিত, ক্লান্ত, বিমর্ষ দেখি নি। একদিন তিনি বলেছিলেন, মন্ত্রীসভায় যদি দুশো চল্লিশ জনের স্থান হ'তে পারত, তা হ'লে কোনও সমস্যা থাকত না। তা হ'লে প্রত্যেক কংগ্রেস এম. এল. এ-কে মন্ত্রী, উপমন্ত্রী বা কিছু একটা বানিয়ে রাখা যেত।"

মাধব দেশপাণ্ডে উদাস হাসলেন।

"পিতাজীর জন্যে কষ্ট হয়, কাক্কাজী। অনেকেই তাঁকে ভুল বোঝে। আসলে তিনি রাজনৈতিক নেতা নন, কবি। আমাদের ত ভয় হয় এ সব গোলমালে তাঁর স্বাস্থ্য না ভেঙ্গে পড়ে।"

"কেন? তাঁর তবিয়ৎ কি সুস্থ নেই?"

"তবিয়তের কথা হচ্ছে না কাক্কাজী। তাঁর মনের কথা বলছি। একদিন এসে দেখে যান না তাঁকে? আপনি ত আর মন্ত্রীত্ব

নিয়ে লড়বার জন্যে আসবেন না? আপনার সঙ্গে তিনি দু'চারটে অন্য কথা বলে নিশ্চয় আরাম পাবেন।"

"ঠিকই বলেছ তুমি। আমিও ভাবছিলাম একদিন যাব। তবে কোশলজী ব্যস্ত মানুষ, তাই এ সময়ে তাঁর সময় নষ্ট করতে চাই নি।"

"আপনাকে দেখলে পিতাজী নিশ্চয় সুখী হবেন। সেদিন বলছিলেন, মাধবজীর সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই।"

"বলছিলেন বুঝি?"

"বলছিলেন, "তোমরা একটু খোঁজ করো তিনি সুস্থ আছেন কি না? আমার ত এখন মরবার পর্যন্ত সময় নেই। মন্ত্রীসভার কাজ চুকে গেলে আমি একদিন দেখা করতে যাব'।"

মন্দির থেকে বাড়ী ফিরে মাধব দেশপাণ্ডে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে টেলিফোন করলেন। সেদিন রাত্রে দু'জনের সাক্ষাৎকার হ'ল।

এ সাক্ষাৎকারের ফলে মাধব দেশপাণ্ডে কোশল মন্ত্রীসভায় পূর্ত ও বিদ্যুৎ বিভাগের মন্ত্রী হলেন। তাঁর এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মধ্যে বোঝাপড়া হ'ল, তিনি বিনাসর্তে মুখ্যমন্ত্রীর দলীয় রাজনীতির পেছনে দাঁড়াবেন। মারাঠা সম্প্রদায়ের সমর্থন নিয়ে। মাধব দেশপাণ্ডেকে খুশী করবার জন্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রজাপতি শেউড়েকে উপমন্ত্রীত্বে খর্ব করে রাখলেন।

শঙ্করলাল পাতিল নির্বাচিত হলেন বিধান সভার স্পীকার।

দুর্গাভাই একবার আপত্তি করেছিলেন।

"মাধব দেশপাণ্ডে ডাহা সুবিধাবাদী। মাত্র তিন মাস জেল খেটেছে। সব সময় নিজেকে, নিজের স্বার্থকে বাঁচিয়ে চলেছে। আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক'রে আমার কাছে এসে হাজির হয়েছিল। বলেছিল, মারাঠা সমাজ কোশলজীকে চায় না। আর আপনি ওকেই মন্ত্রীত্ব দিচ্ছেন। আপনার রাজনীতি আমি বুঝতে পারি নে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নজী।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে উত্তর দিয়েছিলেন: "তুর্গাভাইজী, রাজনীতির সবচেয়ে বড় প্রেরণা স্বার্থ ও সুবিধা। আদর্শ তার পরে। লক্ষ্য নিয়ে ঝগড়া যত, তার চেয়ে অনেক বেশি পথ নিয়ে। কৌশল নিয়ে, কূটনীতি নিয়ে। তুর্গাভাইজী, আমি বার বার মহাভারত পাঠ করেছি, এখনও ক'রে থাকি। কেবল জীবনরহস্য বুঝবার জন্যে নয়, রাজনীতি-রহস্য জানবার জন্যেও। অত বড় রাজনৈতিক মহাকাব্য পৃথিবীতে আর লেখা হয় নি। উদ্যোগপর্বের কথা স্মরণ করুন। কৌরব পাণ্ডব উভয় শিবিরে যুদ্ধের উদ্যোগ। আর রাজনীতি, কূটনীতির কি নিপুণ খেলা! মদ্ররাজ শল্য, নকুল-সহদেবের মাতুল, বিরাট সৈন্যদল নিয়ে যাচ্ছিলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগ দিতে। মাঝপথে তুর্য্যোধন তাঁর গতিরোধ করলেন। বাহুবলে নয়, বিচিত্র সংবর্ধনায়। দেখুন তুর্য্যোধনের রাজনৈতিক চাল। তুর্যোধনের আদেশে শিল্পীগণ স্থানে স্থানে বিচিত্র সভামণ্ডপ, কূপ, দীঘি, পান্থশালা নির্মাণ করল। খেলাধূলা, আমোদ-আহ্লাদ, খাদ্য-পানীয়ের অকৃপণ আয়োজন। শল্য উপস্থিত হ'লে তুর্য্যোধনেব মন্ত্রীগণ তাঁকে দেবতার ন্যায় পূজা করলেন। সে সম্বর্ধনা-সভার সৌন্দর্য দেখে শল্য ত বিমুগ্ধ। বললেন, কোন্ শিল্পী এমন সুন্দর কাজ করেছে? তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। পুরস্কার দেব। এসে হাজির হলেন তুর্যোধন নিজেই। শল্য অত্যন্ত প্রীত হ'য়ে বললেন, তুমি কি চাও বল, তোমার অভীষ্ট আমি পূর্ণ করব। তুর্যোধন বললেন, আপনি আমার প্রধান সেনাপতি হন। শল্য রাজী হলেন। দেখুন, তুর্গাভাইজী, রাজনীতির এক খেলায় তুর্যোধন জিতলেন। যুধিষ্ঠিরের ভাবা উচিত ছিল যে, শল্যকে পথে তুর্যোধন আটকাতে পারে। তা না ভেবে তিনি রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। কিন্তু তাই ব'লে যুধিষ্ঠিরও কম বুদ্ধিমান্ ছিলেন না। তিনি জানতেন, রাজনীতিতে পুরো জয় বা পুরো পরাজয় কদাপি নেই। সবচেয়ে

বড় জয়ের মধ্যেও পরাজয়ের কালো ছায়া থাকে ; সবচেয়ে বড় পরাজয়কেও অন্তত কিছুটা জয়ে পরিণত করা যায়। যুধিষ্ঠির-শিবিরে উপস্থিত হয়ে শল্য যখন জানালেন, তিনি দুর্যোধনের সেনাপতি হ'তে রাজী হয়েছেন, পাণ্ডবরাজ দুঃখ পেলেও মুখে তা প্রকাশ করলেন না। বললেন, দুর্যোধনের প্রতি তুষ্ট হয়ে আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা ভালই। এখন আমার একটি উপকার করুন। অকর্তব্য হ'লেও এ আপনাকে করতে হবে, কেননা আমাদের মঙ্গলের জন্যে এ কাজ বড় প্রয়োজন। যুদ্ধে আপনি বাসুদেবের সমান! কর্ণ ও অর্জুনে যুদ্ধ হবে। অর্জুনের সারথি হবেন কৃষ্ণ। আপনাকে হ'তে হবে কর্ণের সারথি। কর্ণের সারথি হয়ে দুটো কাজ আপনাকে করতে হবে : অর্জুনকে রক্ষা, আর কর্ণের তেজ নষ্ট। উত্তরে শল্য বললেন, এ কাজ আমি নিশ্চয় করব। যুদ্ধের সময় কর্ণকে আমি এমন সব প্রতিকূল ও অহিতকর বাক্য বলব যাতে তার তেজ নষ্ট হবে এবং অর্জুন তাকে অনায়াসে বধ করতে পারবে। শুধু এই কেন, তোমাদের ভালর জন্যে আরও অনেক কিছু আমি করব।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলে চললেন, "দুর্গাভাইজী, যুধিষ্ঠিরের রাজনীতি একবার ভেবে দেখুন। বিরাট্ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে শল্যের মত অত বড় যোদ্ধাকে দুর্যোধন ভাগিয়ে নিয়ে গেল, এমন পরাজয়ে তিনি একটুও ম্লান হলেন না। খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় খেলে গেল এই বিরাট্ বিপর্যয় থেকে কতটুকু জয় আদায় ক'রে নেওয়া যায়। আর তক্ষুণি এক অতি নিপুণ যুদ্ধকৌশল তিনি ভেবে ফেললেন। যুধিষ্ঠির জানতেন, পাণ্ডবদের যদি কাউকে ভয় করাব থাকে সে হচ্ছে কর্ণ। একমাত্র কর্ণই প্রাণ দিয়ে দুর্যোধনের পক্ষে লড়বে—তার সমস্ত শক্তি দিয়ে, ইচ্ছা দিয়ে, অপমান, হিংসা, ক্রোধ ও মহাবিক্রম দিয়ে। যুধিষ্ঠিরের সবচেয়ে ভয় ছিল অর্জুনকে নিয়ে। কর্ণের হাতে অর্জুন নিহত না হন।

তাই শল্য শত্রুপক্ষের সেনাপতি হওয়ায় যুধিষ্ঠির একার্যে খুশি হলেন। কৃষ্ণের সমান সমান যোদ্ধা শল্য। কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধে কৃষ্ণ হবেন অর্জুনের সারথি। সুতরাং সেনাপতি শল্য কর্ণের সারথি হ'লে দুর্যোধন বা কর্ণ সন্দেহ করবে না। সারথি হ'য়ে রথ চালনার কলাকৌশলে শল্য অর্জুনকে বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবেন। কর্ণ বিরাট্ যোদ্ধা বটে, কিন্তু অত্যন্ত দাম্ভিক, আত্ম-সচেতন ও অহঙ্কারী। শল্য যদি তার অহমিকাকে আঘাত ক'রে কথা বলেন কর্ণ উত্তেজিত হবে, যুদ্ধে তার ভুল হবে, তার তেজ কমে যাবে। এতখানি কূট-রাজনীতি মুহূর্তে যুধিষ্ঠিরের মাথায় খেলে গেল। আর, দুর্গাভাইজী, আপনারা যুধিষ্ঠিরকে খুব ভালমানুষ ব'লে উপেক্ষা করেন, নয়ত ধর্মপুত্র ব'লে পূজা করেন।"

দুর্গাভাই-এর বিস্মিত, প্রভাবিত মুখে দৃষ্টিপাত ক'রে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব'লে চললেন: "মাধব দেশপাণ্ডে সুবিধাবাদী, সবাই জানে। কংগ্রেসের আন্দোলনে তিনি যোগ দেন নি, সত্যিকারের জেলে যান নি, আপনাকে আমাকে তাঁর পত্রিকা 'মাতৃভূমি' বার বার নিন্দা করেছে। সব সত্য। কিন্তু সেদিন ত ইতিহাস। ১৯৪২-এর পরে দেশের অবস্থা বুঝে মাধব দেশপাণ্ডে কংগ্রেসী হয়েছেন। আজ মারাঠা সমাজে তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। 'মাতৃভূমি' প্রভাবশীল সংবাদপত্র। 'পিপ্‌ল'কেও উপেক্ষা করা যায় না। একমাত্র মাধব দেশপাণ্ডেই উদয়াচলের সংবাদপত্র-ম্যাগনেট। মারাঠা সমাজ থেকে মন্ত্রী নির্বাচন সহজ নয়। শঙ্করপ্রসাদ পাতিলকে মন্ত্রীত্ব দেওয়া যায়, কিন্তু শিক্ষা দপ্তর ছাড়া অন্য কিছু তিনি চান না—অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আপনার আমার মতের একটুও মিল নেই। আমরা যে সামাজিক শিক্ষা এবং গ্রামে গ্রামে 'বিদ্যা-মন্দির' প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করছি, তিনি তাকে অর্থ, সময় ও প্রচেষ্টার বিরাট্ অপচয় মনে করেন। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে, আপনিও তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছেন। তা ছাড়া, শঙ্কর

প্রসাদ শিক্ষাবিদ্, রাজনৈতিক নেতা নন। মারাঠা সমাজের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা তাঁকে মন্ত্রীত্ব দিলে মিটবে না। বিধান সভায় মারাঠা সদস্যরা—আমাদের দলের কথাই বলছি—শঙ্কর-প্রসাদের নেতৃত্ব মানবে না। তাদের নেতা মাধব দেশপাণ্ডে, প্রজাপতি শেউড়ে। তাই মাধব দেশপাণ্ডেকে মন্ত্রীত্ব দিতেই হবে।"

"দিতেই যদি হবে ত প্রথম থেকে দিলেন না কেন?"

"তার অনেক কারণ আছে, দুর্গাভাইজী। মাধব দেশপাণ্ডের বুদ্ধি যত স্থূল, উচ্চাশা তত বিরাট। তাঁকে প্রথম থেকে বুঝতে দিন তিনি মারাঠাদের নেতা, দেখবেন তিনি নানা সর্ত নিয়ে হাজির। বলবেন, দশ জনের মন্ত্রীসভায় অন্তত চার জন মারাঠা মন্ত্রী চাই; ছয় জন উপমন্ত্রীর মধ্যে কম ক'রে দু'জন। এককালে লীগ যা করত, এখন আমরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে তা করছি। শুধু তাই নয়। মাধব দেশপাণ্ডে বলবেন, আমি যাঁদের নাম করব তাঁরাই মন্ত্রী হবেন। অর্থাৎ মারাঠাদের এক ও অদ্বিতীয় নেতা হিসেবে মাধব দেশপাণ্ডের প্রতিষ্ঠা আপনি নিজের হাতে ক'রে দিলেন। তার পর একদিন দেখতে পা:বেন, আপনাকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হবার দুরন্ত উচ্চাশায় মাধব দেশপাণ্ডে গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছেন।"

"তাই বুঝি আপনি তাঁকে ভেঙ্গে টুকরো ক'রে আবার জোড়া লাগালেন?"

"তা বলতে পারেন, দুর্গাভাইজী। মাধব দেশপাণ্ডের সবচেয়ে ভুল হয়েছিল আপনার দরজায় আমার বিরুদ্ধে গিয়ে হাজির হওয়া। তার প আমার কাছে আসবার সৎসাহস তাঁর আর হয়নি। মন্ত্রী হবার জন্যে তিনি যে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছি:েন আমি জানতাম। এজন্য কোন দাম দিতেই তাঁর আটকাবে না, তাও জানতাম। দরকার ছিল মাধব দেশপাণ্ডের অহমিকা চূর্ণ করবার। তাঁকে বুঝিয়ে দেবার যে, মারাঠা সমাজে কংগ্রেসী নেতা তাঁর মত আরও অনেক আছেন, মন্ত্রী হবার দাবি তাঁদেরও আছে।"

"তাঁকে আপনার খাস কামরায় আনলেন কি ক'রে?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে বললেন, "একটু কৌশল করেছিলাম, দুর্গাভাইজী। তা আর আপনাকে নাই বললাম। আপনি আদর্শবান্, পুণ্যপ্রাণ মানুষ। শুনলে দুঃখ পাবেন, আমার ওপর আপনার যেটুকু শ্রদ্ধা আছে তাও কমে যাবে।"

নীরব দুর্গাভাই-এর চোখে ক্লান্ত উদাস দৃষ্টি রেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আরও বলেছিলেন, "মহাভারতের কয়েকটি শ্লোক মনে পড়ছে, দুর্গাভাইজী। শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম সদুপদেশ দিচ্ছেন। বলছেন, 'যে চ মূঢ়তমা লোকে যে চ বুদ্ধেঃ পরং গতাঃ। তে নরাঃ সুখমেধন্তে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥' যারা মূঢ়তম, যাদের বুদ্ধি নেই, অর্থাৎ যারা বোকা, এবং যারা পরমবুদ্ধি লাভ করেছে, জগতে তারাই সুখভোগ করে। যারা মধ্যবর্তী, তারাই দুঃখ পায়। দুর্গাভাইজী, রাজনীতিতেও তাই। মাধব দেশপাণ্ডের মত মূঢ় এবং আপনার মত পরম বুদ্ধি, আপনাদের দুঃখ অনেক কম। দুঃখের বিরাট্ বোঝা আমার মত মধ্যবর্তী মানুষদের জন্যে। তাই আমি অনেক সময় ভীষ্মের অন্য উপদেশটি মনে মনে আবৃত্তি করি: 'সুখ বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বা প্রিয়ম্। প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীতে হৃদয়েনা-পরাজিতঃ॥' সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, যাই উপস্থিত হোক্ অপরাজিত, অর্থাৎ অনভিভূত হয়ে হৃদয়ে মেনে নেবে। এ উপদেশের আধুনিক ব্যাখ্যা হ'ল: সুখে, দুঃখে, জয়ে-পরাজয়ে একেবারে হৃদয় ভাসিয়ে দিতে নেই। তার মানে, ইংরেজীতে বলতে হয় দুর্গাভাইজী—যতটা সম্ভব ডিটাচড্ থাকতে হবে। নির্লিপ্ত। আলগা। সিনিক না হ'লে রাজনীতি করা যায় না, দুর্গাভাইজী।"

আট

কোশল মন্ত্রীসভার প্রথম বছরগুলিতে উদয়াচলে রাজকার্য্য বেশ ভালই চলেছিল। মন্ত্রীসভার বড় রকমের অন্তর্বিরোধ ছিল না; ছোটখাট যে-সব বিরোধ ঘটত, নীতি নিয়ে নয়, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ নিয়ে, তা যে-কোন মন্ত্রীসভায় হয়ে থাকে; সামগ্রিক প্রশাসনে তার ছায়া পড়ত না। মাধব দেশপাণ্ডে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের সঙ্গে সহযোগিতাই ক'রে যাচ্ছিলেন। যদিও সেচ ও বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্ব পেয়ে তিনি খুব খুশী হন নি, চেয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র অথবা অর্থ-মন্ত্রীত্ব, তথাপি ক্রমে ক্রমে এই দুই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের বর্ধমান পরিধিতে মাধব দেশপাণ্ডে উদয়াচলে উন্নতি ও কল্যাণ সাধনের যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে শান্ত হয়েছিলেন। তিনটি নতুন বিদ্যুৎ কারখানা স্থাপন ক'রে উদয়াচলকে অন্ধকার হ'তে আলোয় নিয়ে আসবার সুমহান কর্তব্যের ভিত্তিস্থাপন করতে পেয়ে আত্মতৃপ্তিতে মাধবদেশপাণ্ডে নধরকান্তি হয়ে উঠেছিলেন। দেহে সামান্য মেদের আভাস দেখা দিয়েছিল, মুখের হাসি বেশ একটু গোলাকার হয়ে এসেছিল, চলা-বসায় নতুন নতুন একটা ভারিক্কিভাব রপ্ত হয়েছিল। বিদ্যুৎ, অর্থাৎ পাওয়ার, নিয়ে মাথা ঘামাতে ঘামাতে মাধব দেশপাণ্ডে ধীরে ধীরে পাওয়ারের নিগূঢ় রহস্যে মজে গিয়েছিলেন; তাঁর অন্ধকার মানসে গোপন উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নতুন আলোকে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু তা কয়েক বছর পর।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরও অসন্তুষ্টির কারণ ছিল না। 'মাতৃভূমি' ও 'পিপ্‌ল্' দুখানা কাগজেই তিনি পূর্ণ সমর্থন পেতেন। অর্থাৎ উদয়াচলের 'প্রেস' তাঁর সঙ্গেই ছিল। মাধব দেশপাণ্ডেকে দিয়ে দরকার মত দু'চারটে অন্য কাজও তিনি করিয়ে নিতে পারতেন। সেচ ও বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে উদয়াচলে কাজ একেবারে মন্দ

হয় নি ; তিনটি বিদ্যুৎ কারখানা ছাড়াও দু'টি নদীতে মাঝারি সাইজের বাঁধ দেওয়া হয়েছে, এবং উদয়াচলের সবচেয়ে বড় নদী সোনামুখীকে কেন্দ্র ক'রে বেশ বড় এক বহুমুখী প্রজেক্টের উদ্যোগপর্ব অনেকখানি এগিয়ে গেছে। মাধব দেশপাণ্ডে মারাঠা সমাজকে মোটামুটি শান্ত রেখেছেন ; সমাজে তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব সুপুষ্ট।

'নবভারত সংগঠন' নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে সোনামুখী প্রজেক্টের বেশ কিছু কাজ পাইয়ে দেবার জন্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মাধব দেশ-পাণ্ডেকে অনুরোধ করেছিলেন। সে অনুরোধের অসম্মান হয় নি। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানেন যে 'নবভারত সংগঠনে'র শতকরা ষাট ভাগ শেয়ার যে তাঁর তিন পুত্রের নামে বেনামীতে কেনা আছে, সে খবর আজ পর্যন্ত মাধব দেশপাণ্ডের জানা নেই। একমাত্র তিনি এবং জগন্মোহন তিওয়ারী ছাড়া আর কেউ তা জানে না ; তাঁর ছেলেরাও না।

দুর্গাভাই মাঝে মাঝে তাঁর কাছে নালিশ জানিয়েছেন।

"মাধব দেশপাণ্ডে কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি করছেন, কোশলজী।"

"কেন ? কি ব্যাপার বলুন ত!"

"আপনি কি কিচ্ছু জানেন না?"

"শুনি আমি অনেক কিছুই, জানিও কিছু কিছু। কিন্তু আপনার ও আমার সংবাদ এক কি না তা কি ক'রে বুঝব ?"

"মন্ত্রী হবার পর মাধব দেশপাণ্ডে কতজন নিকটাত্মীয়কে চাকরি দিয়েছেন তা জানেন আপনি ?"

"সতের জন।"

"হনুমান নেশন বিল্ডিং কোম্পনীটা আসলে কার আপনি জানেন ?"

"হরিশ দেশপাণ্ডের"

"অর্থাৎ মাধবদেশপাণ্ডের বড় ছেলের। আর এই কোম্পানীই পাওয়ার হাউস বা ইরিগেশনের সবচেয়ে বেশি কনট্রাক্ট পাচ্ছে।"

"তা পাচ্ছে।"

"এ কি অন্যায়, অনাচার নয়? মন্ত্রীর পক্ষে এ সব কি শোভন?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঈষৎ হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "দুর্গাভাইজী, মন্ত্রী ত দেবতা নয়, ঋষিও নয়। মন্ত্রী আর সবারই মত মানুষ।"

"কিন্তু সে অনেক মানুষের বিশ্বাস, আস্থা ও শ্রদ্ধার পাত্র। যে বিরাট্ ক্ষমতার সে অধিকারী, সে ক্ষমতা তার নিজের অর্জিত নয়, উত্তরাধিকারও নয়। বহু মানুষ বিশ্বাস ক'রে এ ক্ষমতা তার হাতে তুলে দিয়েছে! এ ক্ষমতার সামান্যতম ব্যবহার বহুর কল্যাণ, মঙ্গল ও উন্নয়নের জন্যে। এতে মন্ত্রীর বিন্দুমাত্র স্বাধিকার নেই।"

"নীতি হিসাবে আপনার প্রত্যেকটি কথা মানি, দুর্গাভাইজী।" কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সাবধানে বললেন। "কিন্তু নীতির নিষ্ঠুর নির্দয় বিচারে ক'জন মানুষ বেকসুর খালাস পায়, বলুন? আপনার মত আদর্শবাদী সজ্জন যদি সবাই হ'ত তা হ'লে পৃথিবী হ'ত স্বর্গের চেয়েও মহৎ, কারণ মানুষের এমন অনেক গুণ আছে যা দেবতাদের নেই।"

"তা হ'লে আপনি মাধব দেশপাণ্ডের কাজে অন্যায় দেখতে পান না?"

"পাই। নিশ্চয় পাই। মাধবভাইকে দু'একবার আমি সতর্কও করেছি। কিন্তু কি জানেন, আপনি তাঁকে যত বড় দোষী মনে করছেন, ততটা দোষ তার নয়!"

"আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।"

"দোষ মাধব দেশপাণ্ডের নয়। দোষ ভারতবর্ষের, হিন্দু সমাজের, ধর্মের, দোষ এ দেশের জল-মাটি-হাওয়ার, দোষ ইতিহাসের।"

"ছি, ছি, কোশলজী, আপনি ত ইংরেজের মত কথা বলছেন। মেকলে সাহেব যা বলেছিলেন আপনি ঠিক তাই বলেছেন।"

"না, দুর্গাভাইজী। তা আমি বলছি না। আমি একেবারে অন্য কথা বলছি। অনুমতি করেন ত বুঝিয়ে বলি।"

দুর্গাভাই নীরবে অনুমতি দিলেন।

"নীতির দুটো দিক্ আছে, দুর্গাভাইজী। নীতি সামগ্রিক ; দেশ, কাল, পাত্র, সমাজ, সভ্যতা সবকিছুর ঊর্ধ্বে। এ হ'ল আদর্শবাদী নীতি। ইতিহাসে কখন-সখন এমন মানুষ জন্ম নেন যাঁদের কাছে নীতি ও আদর্শ সবকিছুর ওপর। তাঁরা নমস্য। কিন্তু তাঁদের নিয়ে দুনিয়া-সংসার নয়। যে নীতি ব্যবহারিক তা নির্দিষ্ট হয় সমাজ, ধর্ম, আর্থিক ব্যবস্থা ও ঐতিহাসিক বিবর্তন দিয়ে। ধরুন, আজকাল আমরা ব'লে থাকি যে ইংরেজের নীতিবোধ খুব প্রখর। অথচ আমরাই জানি, সাম্রাজ্য তৈরী করতে গিয়ে এমন কোনও দুর্নীতি নেই ইংরেজ যা প্রয়োগ করে নি। আমরা বলি, সাহেব ব্যবসায়ীরা মালে ভেজাল দেয় না, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দেয়। অথচ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুষ্ট ব্যবসায়ীদের শাস্তিবিধানের যে বিশদ ও কঠিন ব্যবস্থা আছে, আমাদের কংগ্রেসী রাজত্বে তার অংশমাত্র নেই। তাতে জানা গেল, ভারতীয় ব্যবসাদার চিরদিন অসৎ ছিল না, এবং এককালে অসৎ ব্যবসায়ীকে কঠোর শাস্তি পেতে হ'ত। আফিং-এর ব্যবসা ক'রে চীনের সর্বনাশ যে ইংরেজ বণিক্‌শ্রেণী করেছিল, রাজশক্তির পূর্ণ সমর্থন নিয়ে, তাকে নিশ্চয় আপনি সৎ ব্যবসায়ী বলবেন না?"

"তাতে কি প্রমাণিত হ'ল?"

"শুধু এটুকু যে, নীতি-দুর্নীতির চিরন্তন মাপকাঠি ব্যবহারিক পৃথিবীতে নেই। আজ ইংরেজের নীতিবোধ আমাদের চেয়ে বেশি, তার কারণ বেঁচে থাকবার মৌলিক সমস্যাগুলির সে সমাধান ক'রে ফেলেছে। ধরুন, চাকরির কথা। ইয়োরোপে আজকাল আর বেকার কেউ নেই। কর্মপ্রার্থীদের চেয়ে চাকরির সংখ্যা বেশি। তাই লোকে বড় একটা চাকরির জন্যে অন্য লোকের—আত্মীয়-বন্ধুর

শরণাপন্ন হয় না। সুতরাং আত্মীয়পোষণ নামে যে দুর্নীতি আমাদের দেশে চালু, ইয়োরোপে তা অনেক কম, এবং অন্য ধরনের।"

"তা ঠিক।"

"আমাদের দেশে মানুষ অনেক, চাকরি কম। বেকারের শেষ নেই।"

"সে জন্যেই তো একমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্ম হওয়া অত্যন্ত দরকার।"

"যতটা সম্ভব। তাব চেয়ে বেশি নয়। যে অযোগ্য তারও চাকরি চাই, দুর্গাভাইজী। তারও পেটে ক্ষিধে, জীবনের মার সেও কম খাচ্ছে না।"

"তবু একটা নীতি আমাদের ধরে থাকতেই হবে।"

"নিশ্চয়। কিন্তু তাব সামান্য ব্যতিক্রমে, অল্প স্খলনে বিচলিত হ'লে চলবে না। ভেবে দেখুন, ভাবতবর্ষে বহু শতাব্দী ধরে কোনও সামাজিক নীতি ও ন্যায় বোধ নেই। ইংরেজীতে যাকে ব'লে স্যোসাল মরালিটি। ব্যক্তিগত ন্যায় ও নীতি আমাদের দীর্ঘদিনেব, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে বহু দুর্নীতিকে আমবা হাজার বছর প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি।"

"যেমন?"

"উদাহরণের যে শেষ নেই, দুর্গাভাইজী। বিধবার অবস্থা থেকে একান্নবর্তী পরিবারের অসংখ্য অলস, কর্মহীন মানুষের পোষণ পর্যন্ত সবকিছুই সামাজিক দুর্নীতি ও ন্যায়হীনতার মধ্যে আনা যায়। আত্মীয় পোষণ ত আমাদের ধর্মের নির্দেশ! যে-কেউ একটু জীবনে দাঁড়িয়েছে, অমনি তার আত্মীয়বর্গ অনেক কিছু দাবি, আশা, প্রার্থনা নিয়ে তার দ্বারস্থ। আপনি তাদের ভাগিয়ে দিন, অমনি সবাই আপনাকে এমন বদ্‌নাম দেবে যে আপনি সহ্য করতে পারবেন না। তা ছাড়া ভাগাবেনই বা কেন আপনি? বহু শতাব্দীর শিক্ষা ও সংস্কার আপনাকে তাদের সঙ্গে বেঁধে

রেখেছে ; আপনি নিজেই চাইবেন তাদের জন্যে কিছু করতে, তাদের বাদ দিয়ে ত আপনার অস্তিত্ব পূর্ণ নয়। হাজার বছর ধরে আমাদের দেশে ঘুষ বা উপরি-পাওনা নিত্যনৈমিত্তিক নীতি হয়ে চলে আসছে। যার মাইনে ছিল দশ টাকা, জমিদারী ব্যবস্থার কল্যাণে তার উপরি রোজগার ছিল মাইনের অনেক বেশি। ইংরেজ এদেশে এসে দেখল, এ ব্যবস্থা প্রাচীন ; সে তার পরিবর্তন করবার চেষ্টা মাত্র করল না। ফলে, এককালে গুরুজনরা ছোটদের আশীর্বাদ ক'রে বলতেন, বাবা, দারোগা হও। ইংরেজ তার শাসনকার্যে ভারতীয়দের নিয়োগ করল সামান্য বেতনে, ধরে নিল 'উপরি' আর ঘুষ ত এরা নেবেই। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশান ভারতবর্ষে কতশত বছর ধরে চালু তার কি কেউ হিসেব করেছে ? আমাদের ছোটবেলা শুনতে পেতাম, স্বর্ণকার নিজের মা এবং স্ত্রীর জন্যে গহনা গড়তে গেলেও সোনা চুরি করে। অর্থাৎ, সোনা যে সে চুরি করবে, সমাজ তা মেনেই নিয়েছিল। তারপর যত ইংরেজের রাজত্ব ন'ড়ে উঠল তত সামাজিক দুর্নীতি গেল বেড়ে। এক একটা লড়াই পথ ক'রে দিল আরও অনেক দুর্নীতির। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ঘুষ, ভেজাল, স্ত্রী-ব্যবসা ত বড় রকমের ইণ্ডাষ্ট্রি হ'য়ে দাঁড়াল। সুতরাং সামাজিক দুর্নীতি আমাদের সভ্যতা ও সংস্কারের সঙ্গে বহু শতাব্দী ধ'রে অনেক ভাবে জড়িয়ে আছে। হঠাৎ একদিনে তাকে দূর করা সম্ভব নয়। করতে যাওয়াও বিপজ্জনক।"

"না, কোশলজী ! একথা মানতে আমি রাজী নই। কংগ্রেস যখন মন্ত্রীত্ব নিল, দেশ যখন স্বাধীন হ'ল তখন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী ও রাজকর্মচারীদের হৃদ্‌কম্প হয়েছিল। আমার মনে আছে, পণ্ডিতজীর সেই কথা : 'ঘুষখোর আর অসৎ ব্যবসায়ীদের নিকটতম ল্যাম্প-পোষ্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হবে।' সে সতর্কবাণীর ফল কি হয়েছিল একবার স্মরণ ক'রে দেখুন। আমি শুনেছি,

কংগ্রেসী রাজত্বের প্রথম দিনগুলোতে সাধারণ পুলিস পর্যন্ত তার উপরি নিতে হাত পাতত না। আমরাই সেই সম্ভাবনাপূর্ণ অবস্থার সুযোগ নিতে পারি নি। মন্ত্রীত্ব নিয়ে যদি আমরা সত্যিকারের গান্ধীবাদী জীবনযাপন করতাম তা হ'লে আজকের অবস্থা সৃষ্টি হ'ত না। আমরা কেউ বিত্তবান্ লোক নইঃ না আপনি, না আমি, না মাধব দেশপাণ্ডে, না হরিশংকর ত্রিপাঠী। অথচ মন্ত্রীত্ব নিয়ে আমরা যে জীবনযাত্রা বেছে নিলাম তার সঙ্গে আমাদের নিজস্ব জীবনের কোনও সাদৃশ্য নেই। আমরা কেন সহজ সরল সাধারণ মানুষের জীবন গ্রহণ করলাম না? এই এত বড় বড় বাড়ী, অভিনব আসবাবপত্র, অসংখ্য নোকর-বেয়ারা-মালী-চাপরাশী, চারিদিকে বিরাট্ আড়ম্বরের চোখ-ঝলসান জৌলুস, এতেই আমাদের চরিত্রের পতন শুরু হ'ল। কেন আমরা ইংরেজ গভর্ণরদের প্রাসাদগুলোকে হাসপাতাল, কলেজ বা মিউজিয়মে রূপান্তরিত করলাম না? কেন আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজ্যপালরা সে প্রাসাদগুলির পুরো আড়ম্বর বজায় রেখে তাতে বসবাস আরম্ভ করলেন? কেন আমরা পায়ে হেঁটে বা সাইকেল রিক্শয় চেপে শহরে ঘুরে বেড়াই না? কেন ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করি না? শুনেছি পশ্চিমবঙ্গের একজন নাম-করা দেশকর্মী মন্ত্রী হবার পর খালি পায়ে রাজভবনে ঢুকতে গিয়ে দারোয়ানের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। অথচ আজীবন গান্ধীর চেলা হয়ে যদি আমরা খালি পায়ে দেশের সেবা করতে পেরে থাকি, আজ মন্ত্রী হয়ে কেন আমাদের সে মূল্যবোধ রাতারাতি বদলে গেল? এই বিলাসপুর শহরেই রাজ্যপালের গাড়ি যখন চলে তখন পুলিস আর সব গাড়িকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখে। তার কি সত্যি কোনও প্রয়োজন আছে? রাজ্যপাল ত সবাকার সেবক। কেন তিনি সাম্রাজ্যবাদীর আড়ম্বর উপভোগ করবেন? এসব প্রশ্ন নিশ্চয় প্রত্যেক কংগ্রেসকর্মীর মনে হয়েছে, অথচ কেউ প্রকাশ্যে তা উত্থাপন

করতে পর্যন্ত সাহস পায় না। এতদিনকার এত বড় একটা সংগ্রামের সুমহান্ আদর্শ এত সহজে, কেন, কি ক'রে পচতে শুরু করল আমি তা ভেবে পাই নে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মনেও যে এসব প্রশ্নের যন্ত্রণা হয় নি তা নয়। কিন্তু দুর্গাভাই দেশাই-এর মত তিনি বাস্তব না মেনে নিতে পারার ব্যথায় কষ্ট পান না। জীবনে, তিনি জানেন, অনেক কিছু ঘটে, যা না ঘটলে মানুষের ইতিহাস এমন দুর্ঘটনাবহুল হ'ত না। তা ছাড়া, নীতি ও ন্যায়ের আদর্শকে সামনে রেখে বাস্তবপথে যতটা চলা যায় তার বেশি তা নিয়ে মাথা-ঘামানো কৃষ্ণদ্বৈপায়নের স্বভাব নয়। রাজনীতির কারবার বাস্তব নিয়েঃ আদর্শ তার লক্ষ্য, কিন্তু আদর্শ ও বাস্তবে তফাৎটুকু সে সর্বদা মেনে চলে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আরও জানেন, মানুষ তার সকল দুর্বলতা নিয়েই মানুষ, তার সব স্খলন, পতন, ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়েই সে সম্পূর্ণ। শাসন হ'ল ক্ষমতার দৈনন্দিন ব্যবহার। শাসন করতে গেলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে দূরত্ব প্রয়োজনীয়। গণতন্ত্র সকলের রাজত্ব হ'লেও এখানে সবাই রাজা নয়। সে রাজত্ব সম্ভব, যখন সবাকার চেতনা, নাগরিক নীতিবোধ অনেক উঁচুতে সুস্থির। সে অবস্থায় শাসনের বিশেষ প্রয়োজন নেই। ভারতবর্ষের মত দেশে গণতন্ত্র চলতে পারে না তাকে রাজতন্ত্রের পোশাক না পরালে। অশিক্ষিত অচেতন জনসাধারণ; অনেক উঁচুতে না ব'সে তাদের ওপর রাজত্ব করা সম্ভব নয়। তার কারণ ভারতীয় গণতন্ত্রের গোড়ার গলদ। গলদ নয়। দারিদ্র্য, অভাব। গণতন্ত্র প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকার ক'রে নেয়। ভারতীয় গণতন্ত্রে আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরাণীর কোনও ভেদ নেই। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ভেদ আছে, ভেদের শেষ নেই। শুধু আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরাণীর নয়: হরিপদ কেরাণী আর কেষ্ট চাঁড়ালের

মধ্যেও তফাৎ অনেক। গণতন্ত্র সবাইকে সবকিছু দেবার অঙ্গীকার করে। শিক্ষা, রুজি, গৃহ, স্বাস্থ্য সব-কিছু দেবার আশ্বাসে সে আবদ্ধ। ধর্ম, জাতি, ভাষা নির্বিশেষে। অথচ ভারতীয় গণতন্ত্রের দেবার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ভাবেন, ভোট নেবার সময় অঙ্গীকারের সীমা টানি নে আমরা। অথচ জানি, যা দেব বলছি তা দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। জেনে-শুনে আমরা ধোঁকা দিচ্ছি। আমাদের গণতন্ত্রের মধ্যে এ ধোঁকা নিহিত রয়েছে। সাধারণ মানুষ নিজেদের অধিকার জানে না, তাই এ গণতন্ত্র চলছে। জানলে, চলত না। আসত বিপ্লব, ঘটত অনাচার। জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখি আমরা। নানা কথায়, নানা অঙ্গীকারে। ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দিয়ে। আদর্শের তপ্ত আলোকে মন রাঙিয়ে। আর নয়ত তাদের চিত্তকে আমরা বিভ্রান্ত ক'রে দি। রাজনীতির এ বাস্তব কুৎসিত চেহারা দেখে আমাদের ভয় পেলে চলবে না। এ খেলায় এসব বহু-পরীক্ষিত অস্ত্র। শাসকদের থেকে শাসিতকে দূরে রাখার কৌশলও অন্যতম অস্ত্র মাত্র।

চার বছর কোশল-মন্ত্রীসভা বেশ ভালই চলেছিল।

ভাঙ্গন লাগল পঞ্চম বছরে।

হঠাৎ-ঝড়ে মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে পড়ল না। বিবাদ-বিভেদের অন্তঃস্রোত মন্ত্রীসভার স্বাস্থ্য অনেক দিন থেকে ভেতরে ভেতরে খেয়ে নিচ্ছিল। অনেক ছোট খাট, খুব-ছোট-নয়, এবং বেশ-বড় মতানৈক্য, স্বার্থ-বিরোধ, ব্যক্তিত্বের-ঘাত-প্রতিঘাত, উপদলাদলির রেষারেষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সযত্ন-রক্ষিত বাহ্যিক ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের পেছনে জমা হ'য়ে উঠেছিল।

একদিন হঠাৎ তারা সব আত্মপ্রকাশ ক'রে বসল।

প্রথম সংঘাত বাধল প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে। মন্ত্রীসভার

গঠনের সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজেই ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। সুদর্শন তুবে ছিলেন সেক্রেটারী।

বছর না যেতে সুদর্শন তুবে দাবী করলেন, প্রাদেশিক কংগ্রেস ও মন্ত্রীসভা এই তু'য়ের নেতৃত্ব একজনের হাতে থাকা চলবে না। পার্টি তাহলে মন্ত্রীসভার কাজকর্মের ওপর সতর্ক ও স্বাধীন দৃষ্টি রাখতে পারবে না।

সুদর্শন তুবের প্রস্তাবের পেছনে যুক্তি ছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সমর্থকদের মধ্যেও অনেকে প্রস্তাবের দিকে ঝুকলেন। হাই কমাণ্ডের কাছে নির্দেশ চাওয়া হল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং দিল্লী গিয়ে কংগ্রেস সভাপতি ও প্রধান মন্ত্রীর কাছে দরবার করলেন। কিন্তু তাঁকে হারতে হল। হাই কমাণ্ডের নির্দেশে তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি পদে ইস্তফা দিলেন।

এবার বাধল নতুন বিরোধ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চাইলেন তাঁর পছন্দমত কাউকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি করতে। সুদর্শন তুবে তাঁর সমর্থন চেয়ে হতাশ হ'লেন। তুজনের শত্রুতা কঠিন হ'য়ে উঠল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন কুঞ্জবিহারী ,মিশ্র। উদয়াচলে দীর্ঘকাল বসতি সত্বেও আসলে তিনি যুক্তপ্রদেশের লোক। সুদর্শন তুবে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নতুন কায়দায় তাঁকে পরাস্ত করলেন। যা এর আগে উদয়াচলে কখনও হয়নি এবার তাই হল। সুদর্শন তুবে প্রচার করতে লাগলেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আসলে উদয়াচলের লোক নন, তাঁর প্রকৃত আবাস যুক্তপ্রদেশে। তিনি উদয়াচলের হিন্দীভাষীদের পর্যন্ত হীন মনে করেন, মারাঠীদের তো বটেই। তথ্য সংগ্রহ ক'রে সুদর্শন তুবে দেখিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী এক বছরের মধ্যেই বেশ কয়েকজন উত্তর-প্রদেশীকে বড় বড় পদে বহাল করছেন—এমন কি কয়েকজন সেক্রেটারী পর্যন্ত তিনি উত্তর-প্রদেশ থেকে আনিয়েছেন। বর্তমানে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিত্বে

কুঞ্জবিহারী মিশ্রকে বহাল করতে চেয়ে তিনি তাঁর উত্তর প্রদেশ-প্রীতির চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়েছেন।

এ প্রচারের বিরুদ্ধে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দাঁড়াতে পারলেন না। সুদর্শন দুবে উদয়াচল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

মন্ত্রীসভার মধ্যেও ছোট-বড় গোলযোগ, বিরোধ দেখা দিতে লাগল। প্রজাপতি শেউড়ে মারাঠা সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব অধিকার করতে গিয়ে মাধব দেশপাণ্ডের বিরাগভাজন হলেন। মাধব দেশপাণ্ডের দুর্নীতি-পরায়ণতা দুর্গাভাই দেশাইকে ক্রুদ্ধ ক'রে তুলল: তাঁর প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নকেও দুর্গাভাই কিছুটা দোষী মনে করতে লাগলেন।

এমন সময়, মন্ত্রীত্বের চতুর্থ বছরে, সুদর্শন দুবেকে জব্দ করবার এক সুযোগ পেলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। তাঁর গুপ্তচরেরা সংবাদ আনল যে সুদর্শন দুবে একটি রূপসী রমণীতে আসক্ত হ'য়ে পড়েছেন।

রমণীর নাম সরোজিনী সহায়।' একজন ট্রেড য়ুনিয়ন কর্মী।

সুদর্শন দুবের দুর্বলতার সুযোগ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিতেন না। যদি-না একজন মন্ত্রীর সাহায্যে সুদর্শন দুবে সরোজিনী সহায়ের জন্য বেশ কিছু আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা করতেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সযত্নে সব তথ্য সংগ্রহ ক'রে ফাইলটি "অত্যন্ত গোপনীয়" লেবেল লাগিয়ে একদিন দুর্গাভাই দেশাই-র কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কংগ্রেস সভাপতি সে সময় বিলাসপুরে উপস্থিত ছিলেন। দুর্গাভাই তার কাছে সুদর্শন দুবের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন।

ছোট-খাট একটি অনুসন্ধান হ'ল। দেখা গেল সরোজিনী সহায় কেবল সুদর্শন দুবের বান্ধবী নয়। হরিশঙ্কর ত্রিপাঠীরও।

সব ব্যাপারটা চট ক'রে চাপা দেওয়া হল। কংগ্রেস সভাপতির নির্দেশে সরোজিনী সহায়ের কর্মক্ষেত্র বিলাসপুর থেকে উত্তর প্রদেশে স্থানান্তরিত হল। সুদর্শন দুবেকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঘায়েল করতে

পারলেন না। কিন্তু দুর্গাভাই-এর সঙ্গে সুদর্শন দুবের রাজনৈতিক সহযোগিতার পথ একরকম বন্ধ ক'রে দিলেন।

এবার সুদর্শন দুবের খেলা শুরু হ'ল: কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে মুখ্য-মন্ত্রীর গদি থেকে সরাবার।

সুদর্শন দুবের খেলা প্রথমে চলল সতর্কে, মন্থর-চক্রান্তে।

তিনি প্রথমে হাত করলেন হরিশংকর ত্রিপাঠীকে। সরোজিনী সহায় ব্যাপারে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ওপর হরিশংকর ত্রিপাঠী বীতরাগ হয়েছিলেন। সুদর্শন দুবে তাঁকে বোঝালেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আসল উদ্দেশ্য ছিল মন্ত্রীসভা থেকে তাঁকে সরিয়ে দেবার। ত্রিপাঠীকে আশ্বাস দিলেন, নতুন মন্ত্রীসভা তৈরী হ'লে তিনি স্বরাষ্ট্রবিভাগের দায়িত্ব পাবেন।

মাধব দেশপাণ্ডের সঙ্গে সুদর্শন দুবের বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। দুবেজীকে তিনি কদাচ বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারতেন না। তাই সুদর্শন মাধব দেশপাণ্ডেকে একসঙ্গে লোভ এবং ভয় দেখালেন। লোভ দেখালেন অর্থমন্ত্রীত্বের। ভয় দেখালেন বনবাসের। সেচ ও বিদ্যুৎ বিভাগের দুর্নীতি-দুরাচারের কথা কারুর জানতে বাকী নেই। নতুন মুখ্যমন্ত্রী যদি মাধব দেশপাণ্ডেকে মন্ত্রীসভায় আদৌ স্থান না দেন, লোকে তাঁর নিন্দা করবে না, বরং প্রশংসা করবে।

মন্ত্রীসভার বেশির ভাগ সদস্যকেই নানা কৌশলে সুদর্শন দুবে হাত করলেন।

তখন সমস্যা হ'ল দুর্গাভাই দেশাইকে নিয়ে।

দুর্গাভাই কোশল-মন্ত্রীসভার নেতা না হলেও, দ্বিতীয় প্রধান স্তম্ভ। আসলে, তিনিই তার প্রধান অলঙ্কার। তাঁর মত আদর্শবাদী সজ্জন মন্ত্রীসভায় আছেন ব'লে সারা দেশে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনেকখানি সুনাম। দুর্গাভাইকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরুদ্ধে না আনতে পারলে মন্ত্রীসভার জীবননাশ সম্ভব নয়।

সুদর্শন দুবে জানতেন, দুর্গাভাই তাঁকে পছন্দ করেন না। তাঁর চরিত্রে, নীতি-ন্যায়-বলে দুর্গাভাই-এর আস্থা নেই। দুর্গাভাই কৃষ্ণদ্বৈপায়নকেও পুরো পছন্দ করেন না। তাঁর দুর্বলতা, স্খলন-ত্রুটি সব তিনি জানেন। কিন্তু সব জেনেও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কম নয়। তা ছাড়া, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুর্গাভাইকে কদাচ প্রতারণা করেন নি। নিজের দুর্বলতা তাঁর কাছে গোপন করবার ব্যর্থ চেষ্টাও করেন নি। চার বছরের সহকর্মে দু'জনের মধ্যে বেশ একটা পারস্পরিক বোঝাবুঝি তৈরী হয়ে গেছে। দুর্গাভাইকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আগাগোড়া যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে এসেছেন।

কোশল-মন্ত্রীসভার দুর্বলতা ও ব্যর্থতা দুর্গাভাই যেমন জানতেন, তেমনি আরও জানতেন যে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনায় তাঁর স্থান খুব নীচে নয়। তা ছাড়া, মন্ত্রীরা যদি দুর্বল-চরিত্র হন, লোভ সংবরণ করতে না পারেন, ক্ষমতায় বিনীত না হয়ে দাম্ভিক ও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, তা হ'লে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীকে দোষ দিলে চলবে কেন?

কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সরিয়ে দিলেই উদয়াচলের প্রশাসন উন্নততর হবে, সুদর্শন দুবের এ দাবি দুর্গাভাই-এর কাছে দুর্বল ও অবাস্তব মনে হ'ল।

তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে রাজী হলেন না।

এমনি ক'রে কোশল মন্ত্রীসভা পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করল।

সংকট-সংকুল বছর। সাধারণ নির্বাচন আগামী বছরের প্রারম্ভে।

সুদর্শন দুবে বুঝলেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুখ্যমন্ত্রী থেকে নির্বাচন পরিচালনা করলে, নতুন মন্ত্রীসভার নেতৃত্বও তাঁরই থাকবে। তখন তিনি নিজের ইচ্ছামত সদস্য নির্বাচন করবার অনেক সুযোগ পাবেন। নতুন মন্ত্রীসভাও তিনি গঠন করবেন অনেকখানি নিজের ইচ্ছামত।

তারপর আর তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে সরানো যাবে না।

সুতরাং, মন্ত্রীসভার পতন ঘটানো এক্ষুণি দরকার। বিলম্বে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জয়। সুদর্শন ত্রুবের পরাজয়।

সমস্যা তখনও দুর্গাভাই দেশাইকে নিয়ে।

এই সংকট-মুহূর্তে ভাগ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ওপর হঠাৎ রুষ্ট হয়ে উঠল।

তিনটি ঘটনা এমন আকস্মিক ঘটে গেল যে, অমন ধুরন্ধর রাজনৈতিক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না।

উদয়াচল সাধারণতঃ খাদ্যশস্যে বাড়তি প্রদেশ। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য অনগ্রসর, কিন্তু লোকসংখ্যার তুলনায় কৃষি-উৎপাদন প্রয়োজনের অতিরিক্ত। অতএব, মানুষগুলির জীবনযাত্রা দরিদ্র হ'লেও তারা ক্ষুধায় কাতর নয়। উদয়াচলে প্রচুর চাল, বজরা, মক্কা, তিল ও চিনেবাদাম উৎপন্ন হয়। ভারতের অন্য প্রদেশ উদয়াচল থেকে চাল ও বজরা কেনে। রাজস্বের অন্যতম প্রধান উপায় হ'ল উদ্‌বৃত্ত চাল।

বছর ধ'রে বৃষ্টির অভাব। শস্য ভাল হয় নি। বিশেষ করে চাল। বাজারে চাল আসছে না যথেষ্ট পরিমাণে। দাম বাড়ছে। কংগ্রেসী রাজত্বে সর্বপ্রথম মানুষের পেটে অতৃপ্ত ক্ষুধা।

মন্ত্রীসভায় এ নিয়ে গুরুতর অশান্তি।

খাদ্যের অভাব, চাল ও বজরার উঠ্‌তি দাম, জনসাধারণের দৃষ্টি টেনে এনেছে সেচ ব্যবস্থার প্রতি। হঠাৎ দেখা গেল, কাগজে কলমে যতগুলো ছোট ও মাঝারি সেচ ব্যবস্থা তৈরী হয়েছে ব'লে লিপিবদ্ধ তার অনেকগুলির অস্তিত্বই নেই।

আট হাজার টিউবওয়েল বসান হয়েছে ব'লে বিধান সভায় বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। 'ভারত টাইম্‌স্‌' হঠাৎ একদিন সংবাদ পরিবেশন ক'রে বসল যে, চার হাজারের বেশি টিউবওয়েল কদাপি

বসান হয় নি ; তার মধ্যে দু-হাজার আট শ' ত্রিশটি মাত্র চালু রয়েছে।

বিধানসভায় বিরোধী দল মুলতুবী প্রস্তাব আনলেন।

মাধব দেশপাণ্ডে জোর গলায় বললেন, 'ভারত টাইম্‌স্‌-এর সংবাদ মিথ্যে। আট হাজার টিউবওয়েল ঠিকই বসান হয়েছে, যদিও তাদের মধ্যে সবগুলি কাজ করছে না।

বিরোধী দলগুলি দাবি করল, কোন্ কোন্ গ্রামে টিউবওয়েল বসান হয়েছে তার তালিকা পেশ করা হোক।

মাধব দেশপাণ্ডে চট্ ক'রে রাজী হলেন না। বললেন,"খাদ্যশস্যের বর্তমান পরিস্থিতির জন্যে সরকার উদ্বিগ্ন। সেচবিভাগ পুরোদমে কাজ করছে, সেচ-ব্যবস্থাকে কৃষির প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত করতে। এ সময়ে আট হাজার গ্রামের তালিকা তৈরী করা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ।"

বিরোধী দলগুলি উত্তেজিত হয়ে উঠল। বিধান সভা বিশৃঙ্খল হ'ল।

স্পীকার মন্ত্রী মাধব দেশপাণ্ডের কথায় খুশী হ'লেন না।

বললেন, "টিউবওয়েলের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের পক্ষ থেকে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, বিরোধী দলগুলি তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছেন।"

জনৈক বিরোধী নেতা ব'লে উঠলেন, "আমরা জানি, সরকারী বিবৃতি মিথ্যা।"

স্পীকার তাঁকে তিরস্কার করলেন। কিন্তু বললেন, "সরকার অনায়াসে বিরোধী পক্ষের সন্দেহ ও অভিযোগ দূর করতে পারেন। যে-সব গ্রামে বা শহরে টিউবওয়েল বসান হয়েছে তার লিষ্ট তৈরী করতে খুব বেশি সময় বা অর্থব্যয় হবার কথা নয়। সুতরাং মন্ত্রী মহাশয়কে আমি অনুরোধ করছি, এ লিষ্ট যেন এক মাসের মধ্যে বিধান সভায় দাখিল করা হয়।"

মন্ত্রীসভায় ঝড় উঠল। দুর্গাভাই জানতে চাইলেন, টিউবওয়েল-গুলি সত্যিই বসান হয়েছে কি না।

মাধব দেশপাণ্ডে নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। এ প্রশ্ন করার মানেই তাঁর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা।

দুর্গাভাই বললেন, উদয়াচলের 'টিউবওয়েল স্ক্যানডেল' সারা ভারতবর্ষে জানজানি হয়ে গেছে। সংবাদপত্রে এ নিয়ে কঠোর সমালোচনা হচ্ছে। মন্ত্রীসভার সুনাম যেতে বসেছে। এ অবস্থায় ঢাক-ঢাক নীতি তিনি বরদাস্ত করতে রাজী নন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "লিষ্ট তৈরী হচ্ছে। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে।"

দু'সপ্তাহ পরে বিধান সভায় আট হাজার টিউবওয়েলের তালিকা দাখিল করা হ'ল।

তার তিনদিন পরে 'ভারত টাইম্‌স্' ঘোষণা করলেন যে, উল্লিখিত গ্রামগুলির অন্তত এক-তৃতীয়াংশের কোনও অস্তিত্বই নেই। তাদের অস্তিত্ব কেবল মাধব দেশপাণ্ডের কল্পনায়।

কয়েকটি গ্রামে, 'ভারত টাইম্‌স্' জানালেন, টিউবওয়েলের নামগন্ধ নেই। গ্রাম আছে, কিন্তু টিউবওয়েল নেই, কোনও দিন ছিল না।

মাধব দেশপাণ্ডে সব দোষ চাপিয়ে দিলেন বিভাগীয় কর্মচারীদের ওপর। তিনজন সেচ ইঞ্জিনীয়রকে বরখাস্ত করা হ'ল।

দুর্গাভাই কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে এর চেয়ে অনেক কড়া ব্যবস্থার দাবি করলেন। মুখে নয়, একেবারে লিখিত ভাবে।

"মন্ত্রীরা সীজরের পত্নী নন। তাঁরা কলঙ্কের উর্ধ্বে নন। মন্ত্রীদের দুরাচারে দেশের সর্বনাশ। এতবড় একটা কেলেঙ্কারীতে সেচমন্ত্রীর কোনও নিজস্ব দায়িত্ব নেই, আমি মানতে পারি না। তাঁর এক্ষুণি পদত্যাগ করা উচিত। না করলে মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য তাঁকে বরখাস্ত করা। অথবা সমস্ত মন্ত্রীসভার পদত্যাগ পত্র দাখিল করা।

কর্তব্য, টিউবওয়েল ব্যাপারে নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের জন্যে হাইকোর্টের বিচারপতির অধীনে একটি কোর্ট বসান। এর কমে মন্ত্রীসভার কলঙ্ক যাবে না। জনসাধারণও শান্ত হবে না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুর্গাভাই-এর দাবি মানতে পারলেন না।

বললেন, "মাধব দেশপাণ্ডে অন্যায় করেছেন, মানছি। কিন্তু তিনি জেনেশুনে এতবড় একটা কেলেঙ্কারী ঘটতে দিয়েছেন একথা আমার বিশ্বাস হয় না। মাধব দেশপাণ্ডেকে আমি জানি। অনেক বড় অন্যায়ের দুঃসাহস তাঁর নেই।"

দুর্গাভাই বললেন, "এটা মনস্তত্ত্বের কথা নয়, কোশলজী। সত্য ও তথ্যের কথা।"

"ধরুন, আজ মাধব দেশপাণ্ডেকে আমরা পদত্যাগে বাধ্য করলাম, তাতে কার লাভ?"

"উদয়াচলের।"

"তা নয়। লাভ একমাত্র একজনের। সে হ'ল সুদর্শন দুবে। সে চাইছে এ মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যাক। এই কেলেঙ্কারী একবার যদি মেনে নি, তা হ'লে মন্ত্রীসভা আর টি঳কে থাকবে না।"

দুর্গাভাই বললেন, "যে-কোনও প্রকারে মন্ত্রীসভা টিঁকিয়ে রাখতেই হবে, এই কি আপনার বক্তব্য?"

"একটু ভেবে দেখুন, দুর্গাভাইজী। বছর না ঘুরতে নতুন নির্বাচন। এখন মন্ত্রীসভার পতন ঘটলে এক বিশেষ জটিল অবস্থার সৃষ্টি হবে। নির্বাচনের পর নতুন মন্ত্রীসভায় মাধব দেশপাণ্ডেকে না রাখলেই ত আপনার দাবি মেটান হ'ল।"

"না, হল না। আমি চাই বর্তমান দুর্নীতির অবিলম্ব প্রতিকার। বছর দেড় বছর পর কি হবে কেউ বলতে পারে না। মাধব দেশপাণ্ডে হয়ত এমন কলকাঠি নাড়বেন যে মন্ত্রীসভায় তাঁকে আপনার নিতেই হবে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, দুর্গাভাইজী, ভেবে দেখুন মাধব

দেশপাণ্ডের পদত্যাগ দাবির পরিণাম কি হবে। জনসাধারণের কাছে মেনে নেওয়া হবে যে, টিউবওয়েল ব্যাপার নিয়ে মন্ত্রীসভা বিষম দুরাচারের প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। মেনে নিলে কংগ্রেসী রাজত্বের অবসান হবে না ; উদয়াচলে কংগ্রেসকে নির্বাচনে হারাতে পারে এমন শক্তি এখনও জন্মায় নি, আরও বহুদিন জন্মাবে না। কিন্তু সুদর্শন দুবের কাছে আমাদের পরাজয় হবে। মাধব দেশপাণ্ডেকে সুদর্শন দুবে পরামর্শ দেবে পদত্যাগ না করতে। সে পরামর্শের সঙ্গে মেশান থাকবে ভবিষ্যতের ঘুষ। মাধব দেশপাণ্ডে সে পরামর্শ অবশ্য মেনে চলবে। তখন সমস্ত মন্ত্রীসভার পদত্যাগ অনিবার্য হয়ে উঠবে। আর মন্ত্রীসভার পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন তার নিজের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করতে চাইবে। যদি না-ও চায় তা হ'লেও আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস-প্রার্থী মনোনয়নে তার কর্তৃত্ব হবে অনেক বেশি, এবং নির্বাচনের পর সে নিজের নেতৃত্বে বা ইচ্ছামত মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারবে।"

দুর্গাভাই বললেন, "মন্ত্রীত্ব যে-কোনও প্রকারে করতেই হবে এমন কোনও দাসখৎ আমি অন্তত কাউকে লিখে দি নি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জবাব দিলেন, "তা আমি জানি। বিশ্বাস করুন, মুখ্যমন্ত্রীত্ব করতেই হবে, যে-কোনও দামে, যে কোনও প্রকারে, এমন মনোভাব আমারও নেই। আমি মুখ্যমন্ত্রীত্ব ছাড়তে রাজী আছি—কিন্তু সুদর্শন দুবের কাছে নয়। আজ যদি আমি স'রে দাঁড়াই বা ওঁরা আমাকে সরিয়ে দিতে পারেন, তা হ'লে উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন আপনি কি জানেন না? হয় সুদর্শন দুবে নিজে, নয় ত মাধব দেশপাণ্ডে বা হরিশঙ্কর ত্রিপাঠী! আমার নেতৃত্বে অনেক দোষ দুর্বলতা থাকতে পারে, নিশ্চয় আছে ; কিন্তু উদয়াচলের ভাগ্য আমি বিনা সংগ্রামে সুদর্শন দুবের হাতে তুলে দেব না। উদয়াচলকে আমি এতটুকু নিশ্চয় ভালবাসি।"

দুই কারণে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এই কথাগুলি দুর্গাভাই-এর ভাল

লাগে নি। প্রথমত, অন্যায় অনাচার দুরাচার ঘটেছে জেনেও তিনি তার প্রতিকার করতে বিমুখ, মুখে যাই বলুন না কেন, মুখ্যমন্ত্রীত্ব কোশলজী ত্যাগ করতে রাজী নন। তাঁর কাছে এখন সুদর্শন দুবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ক্ষমতা-সংগ্রামের দাম সবচেয়ে বেশি। আদর্শ, ন্যায়-নীতি, জনস্বার্থ সব কিছুকেই এ সংগ্রামে জিতবার জন্যে তিনি ছাড়তে প্রস্তুত।

দ্বিতীয় যে কারণে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কথা দুর্গাভাইকে খুশী করল না তা একান্ত ব্যক্তিগত। খানিকটা সূক্ষ্ম ঃ দুর্গাভাই নিজেই তা প্রকাশ্যে মানতে রাজী নন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, তিনি যদি মুখ্যমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন, গদিতে বসবেন হয় সুদর্শন দুবে, নয় মাধব দেশপাণ্ডে, নয় হরিশংকর ত্রিপাঠী। কথাটায় দুর্গাভাই অপমানিত বোধ করলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কি তবে ভুলে গেছেন, তিনি, দুর্গাভাই দেশাই, ইচ্ছে প্রকাশ করলেই মুখ্যমন্ত্রীত্ব পেতে পারেন? কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কথা বলেন সতর্কতার সঙ্গে—মুখ দিয়ে সহজে অসাবধান কথা নির্গত হয় না। সুতরাং ইচ্ছে করেই কি তিনি পরোক্ষে দুর্গাভাইকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁকে তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন না।

দুর্গাভাই আদর্শবান্, সৎ, নীতিতে দৃঢ়। কিন্তু তিনি আত্ম-সচেতন, দাম্ভিক, স্তুতিপ্রিয়। প্রশংসা শুনতে ভালবাসেন, শুনলে খুশী হন, না শুনলে অপমানিত বোধ করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁর অসামান্য উজ্জ্বল চরিত্রের এই মলিনতাটুকু জানেন। তাই সর্বদা তাঁকে তিনি সযত্নে প্রশংসা করেন। আজ উত্তেজনার মুহূর্তে তিনি যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন না। দুর্গাভাই যে আহত হ'লেন, তিনি বুঝতেও পারলেন না।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অগোচরে।

উদয়াচলের কলকারখানা বলতে যা আছে তার প্রধান স্থান দখল করেছে তিনটি কাপড়ের কল। মালিক তিনটি গুজরাতী

পরিবার; বিবাহ-সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। তিনটি কারখানার বেশির ভাগ শেয়ারই তিন পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনটি কারখানার মধ্যে যেটি সব চেয়ে বড় তার নাম সুখনলাল কটন মিল্‌স্‌। এরা উৎপাদন করে কেবল ধুতি ও শাড়ী।

চাল, গম ও বজরার দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের দামও আস্তে আস্তে বেড়ে গেল। খুচরা দোকানীরা নালিশ করল, পাইকারী ব্যবসায়ীরা মাল ছাড়ছে না। পাইকারী ব্যবসাদাররা বলল, সুখনলাল কটন মিল্‌স্‌ নিজেই মাল গুদামে রাখছে, বিক্রী করছে না।

শিল্পমন্ত্রী হরিশংকর ত্রিপাঠী সুখনলাল বিঠনলাল প্যাটেলকে ডেকে পাঠালেন। সুখনলাল বললেন, কাপড়ের উৎপাদন ভয়ানক কমে গেছে। বৃষ্টির অভাবে কার্পাস ভাল হয় নি; তূলার বড় অভাব। বিদেশী তূলা ত আমদানী খুব কম—বিদেশী মুদ্রা কোথায়? বাধ্য হয়ে উৎপাদন কমিয়ে দিতে হয়েছে। মাল তাঁরা গুদামে আটকে রাখছেন এ অভিযোগ একেবারে মিথ্যে। ত্রিপাঠীজী ইচ্ছে করলে পুলিস দিয়ে অনুসন্ধান করাতে পারেন।

হরিশংকর ত্রিপাঠী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নোট পাঠালেন। প্রস্তাব করলেন, পুলিস দিয়ে ব্যাপারটার অনুসন্ধান করা হোক।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নোট পেয়েই পুলিস কমিশনারকে অনুসন্ধানের আদেশ দিলেন।

তিনদিন পরে রিপোর্ট পেলেন সুখনলাল কটন মিল্‌স্‌-এর মালিকদের নিজস্ব গুদামে ধুতি-শাড়ী মজুত করা হচ্ছে, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

ক্যাবিনেট মিটিংএ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হরিশংকর ত্রিপাঠীর নোট, তাঁর নিজের মন্তব্য ও পুলিস কমিশনারের রিপোর্ট দাখিল করলেন।

এ ব্যাপারের তিনদিন পর দুর্গাভাই 'জনৈক নাগরিক'-এর কাছ থেকে একখানা পত্র পেলেন। তাতে লেখা আছে: "উদয়াচলের

অন্ধকার আকাশে আপনিই একমাত্র তারকা। যে রাজনৈতিক তমসা এ প্রদেশকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে তার মধ্যে আপনিই একমাত্র আলোর ভরসা। তাই আপনাকে ছাড়া এ পত্র কাকে লিখব? সুখনলাল কটন মিল্স্-এ উৎপাদন কমে নি, বরং বেড়েছে। প্রতিদিন লরী বোঝাই ধুতি-শাড়ী কলকাতায় রপ্তানী হচ্ছে রাতের অন্ধকারে। মুখ্যমন্ত্রী এ খবর খুব ভাল করেই জানেন। কিন্তু তিনি সুখনলালের বিরুদ্ধে কিছু করতে রাজী নন। কারণ তাঁর পুত্র শ্যামাপ্রসাদ সুখনলাল কটন মিল্স্-এর সোল এজেন্সী চেয়েছে কুষাণপুর জেলায়। আমার কথা প্রত্যয় না হ'লে আপনি অনুসন্ধান ক'রে দেখুন।"

দুর্গাভাই গোপনে অনুসন্ধান করলেন। মাল চালানের কোনও প্রমাণ পেলেন না। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ কোশল যে কুষাণপুর জেলায় সুখনলাল কটন মিল্স্-এর সোল এজেন্সী চেয়েছে তা তিনি জানতে পারলেন।

খবরটা তাঁকে দিলেন হরিশংকর ত্রিপাঠী।

তৃতীয় ঘটনা ঘটল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অন্দর-মহলে।

একদিন দুপুরে দুর্গাভাইএর গৃহে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-পত্নী পদ্মাদেবীর বৃদ্ধা দাসীর আগমন হ'ল। দুর্গাভাই আহারান্তে বিশ্রাম করছিলেন। দাসী এসে ঘোমটায় মুখ ঢেকে দরজায় দাঁড়াল। নিবেদন করল, সময় যদি থাকে, দুর্গাভাই যেন বিকেল চারটের সময় একবার পদ্মাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

পূর্বে বলেছি, পদ্মাদেবীর সঙ্গে দুর্গাভাই-এর শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল। দুর্গাভাই জানতেন পদ্মাদেবী ইদানীং সংসারধর্ম প্রায় পরিত্যাগ করেছেন। দিনরাত্রির বেশির ভাগ সময় পূজা-অর্চনা নিয়ে থাকেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর অতিশয় শীতল। চারটার সময় দুর্গাভাই মুখ্যমন্ত্রী ভবনে হাজির হলেন। ঠিক মুখ্যমন্ত্রী ভবনে নয়, পদ্মাদেবীর আন্দর-মহলে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেদিন গেছেন এক জেলা শহরে কৃষি-মেলা উদ্বোধন করতে।

দাসী এসে তুর্গাভাইকে পদ্মাদেবীর পূজার ঘরে নিয়ে গেল।

শীর্ণ দেহ গৌরবর্ণ পদ্মাদেবীকে দেখে তুর্গাভাই সশ্রদ্ধ নমস্কার জানালেন।

বললেন, "তলব করেছেন, ভাবীজী?"

ম্লান হেসে পদ্মাদেবী বললেন, "তলবই করতে হ'ল ভাইয়া, তলব না করলে ত আর আপনার দর্শন মেলে না!"

সবিনয়ে তুর্গাভাই বললেন, "রাজকার্যে দিনরাত কেটে যায়। সময় আর পাই নে।"

পদ্মাদেবী বললেন, "তা কি আর জানি নে ভাইয়া? আপনারা রাজত্ব চালান, না রাজত্ব আপনাদের চালায় সেটা ঠিক বুঝতে পারি নে।"

"তা যা বলেছেন, ভাবীজী। আমরা রাজত্ব চালাই নে। রাজত্বই আমাদের চালায়।"

"এ এক বিচিত্র ব্যাপার, ভাইয়া। আপনাদের পলিটিক্স! বন্ধু নেই, স্নেহ নেই, ন্যায়, ধর্ম, নীতি কিছু নেই। আনুগত্য নেই, বিশ্বাস, নির্ভরশীলতা নেই। এ ত এক হিংস্র জঙ্গল-জীবন!"

তুর্গাভাই-এর মুখে কথা সরল না!

পদ্মাদেবী বললেন, "মনে আছে, এককালে আপনারা যখন দেশের কাজ করতেন? তখন আদর্শ ছিল, ব্যথা, অনুভূতি, আনুগত্য ছিল। বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বার তুঃসাহস ছিল। অনেকখানি সততাও আপনাদের অনেকের ছিল।"

"তা ছিল।"

"আজ সে সব গেল কোথায় ভাইয়া?"

তুর্গাভাই জবাব খুঁজে পেলেন না।

পাল্টা প্রশ্ন করলেন: "তার কি কিছুই নেই, ভাবীজী?"

"কিছু নেই কি ক'রে বলব? আপনি ত এখনও আছেন। শুনলাম উমানাথকে আপনি উদয়াচলে কোনও চাকুরির জন্যে দরখাস্ত পর্যন্ত করতে দেন নি?"

দুর্গাভাই প্রীত হয়ে বললেন, "দিই নি, ভাবীজী। উদয়াচলে সকলেই আমাদের জানে। উমানাথের জীবনে দাঁড়াবার যোগ্যতা আছে। এ প্রদেশে চাকুরি-প্রার্থী না হ'লেও তার চলবে। জানেন বোধহয়, এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সে কাজ পেয়েছে।"

"আপনার মনে হ'ল, উদয়াচলে চাকরি চাইলে উমানাথ আপনার অপমান করবে?"

"তা ঠিক নয়। মনে হ'ল, যেখানেই সে চাকরি চাক না কেন, কর্তৃপক্ষ জানবেন সে আমার ছেলে। হয়ত কিছুটা সুবিধা সে পেয়ে যাবে, যা তার পাওয়া উচিত নয়।"

পদ্মাদেবী কয়ক মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন, "আপনি জানেন, ভাইয়া, অম্বিকাপ্রসাদ আইন কলেজে স্থায়ী কাজ পেয়েছে?"

"জানি।"

"অম্বিকাপ্রসাদ ল' পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করেছিল। এম. এ.-তেও তাই। তবু ল' কলেজে লেকচারার হয়েছে। শুনেছি ছাত্ররা প্রথম প্রথম তার কাছে পড়তে চাইত না। এখন সে হাইকোর্টেও কেস পায়।"

"একথা কেন বলছেন, ভাবীজী?"

"বলছি এজন্যে যে, অম্বিকাকে দেখলে আমার কষ্ট হয়। তার পিতা নিজের যোগ্যতায় বড় হয়েছেন। কিন্তু সে নিজের যোগ্যতায় কিছু করবার সুযোগ পেল না। শুধু সে কেন, আমার পাঁচ ছেলের মধ্যে দুর্গাপ্রসাদ ছাড়া কেউ না।"

দুর্গাভাই কিছু বললেন না।

পদ্মাদেবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "ভাইয়া, ছেলেদের নিয়ে

দুঃখ করবার জন্যে আপনাকে আমি এখানে টেনে আনি নি। আমার কিছু গুরুতর কথা আছে।"

"বলুন।"

"আপনাদের মন্ত্রীসভায় ত জোর ভাঙ্গন ধরেছে।"

"কিছু গোলমাল ত হচ্ছেই।"

"কিছু না। অনেক। উনি আমাকে কিছু বলেন না। কিন্তু আমি জানি।"

দুর্গাভাই বললেন, "আপনার দুশ্চিন্তা করবার মত কারণ উপস্থিত হয় নি। কোশলজীর নেতৃত্ব নিরাপদ।"

পদ্মাদেবী আবার ম্লান হাসলেন।

"এবারে আপনার বড় ভুল হ'ল, ভাইয়া। কোশলজীর হার নিশ্চিত হ'লে আমি চিন্তিত হতাম না। নিশ্চিত নয় ব'লেই আমার দুশ্চিন্তা।"

বিস্ময়ে দুর্গাভাই হতবাক্ হলেন।

পদ্মাদেবী বললেন, "আপনি অবাক্ হচ্ছেন, না? কিন্তু অবাক্ হবার কিছু নেই, ভাইয়া। আজ পাঁচ বছর হয়ে গেল কোশলজী মুখ্যমন্ত্রী। আমি তাঁকে যতটা জানি ততটা আর কেউ জানে না। তাঁর চরিত্রে বলের সঙ্গে অনেক রকম দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হবার পর দুর্বলতাগুলির খুব একটা প্রশ্রয় তিনি দেন নি। ছেলেদের কিছু সুবিধে ক'রে দিয়েছেন; আমার প্রতিবাদ কানে তোলেন নি। কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রীরা—আপনি বাদে—যতটা আত্মীয় পোষণ করেছেন, তার তুলনায় কোশলজী খুব কমই করেছেন। অন্যান্য দুর্বলতাও তিনি শাসনে রেখেছেন—পুরোপুরি নয়, তবে অনেকখানি।"

"তা আমি জানি, ভাবীজী"

"কিন্তু এই গোলমাল শুরু হবার পর কোশলজী বদ্‌লে যাচ্ছেন। সুদর্শন দুবে কি চরিত্রের লোক আপনি খুব ভালই জানেন। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে কোশলজী দ্বিতীয় সুদর্শন দুবে হয়ে উঠছেন।

রাজত্বের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছে। ক্ষমতা তিনি ছাড়তে রাজী নন। শঠতার পরিবর্তে শঠতা করছেন, মিথ্যার জবাব দিচ্ছেন মিথ্যা দিয়ে। এ এক কুৎসিত লড়াই চলছে, ভাইয়া। গত কয়েক মাসে কোশলজী যে-সব কাজ করেছেন, পাঁচ বছরে কেউ তাঁকে দিয়ে তা করাতে পারে নি।

দুর্গাভাই বিস্ময়ে পদ্মাদেবীর মুখে তাকিয়ে রইলেন।

"আমি কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছি, ভাইয়া। রাজনীতির এ কি ভয়ঙ্কর চেহারা? এ ত এক ধরনেব গৃহযুদ্ধ, আত্ম-সংহার। কোশলজীর সাধ্য যতটুকু, যা কিছু আছে, সব দিয়ে তিনি এ ক্ষমতার লড়াই লড়ছেন। অথচ আমি জানি, জিতলে তাঁব সর্বনাশ হবে। যে-সব আসুরিক, তামসিক অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে তিনি জিতবেন, জয়ের পরে সেগুলো আর সংবরণ করতে পাববেন না। তারা তাঁকে পেয়ে বসবে। যাদের সাহায্য নিয়ে তিনি এ গৃহযুদ্ধ লড়ছেন, তাদের দাবি মেটাতে গিয়ে নীতির দিক্ থেকে তাঁকে দেউলিয়া হ'তে হবে। এ বড় সাংঘাতিক অবস্থা, ভাইয়া।"

"ভাবীজী, আপনি এত সব বুঝলেন কি ক'রে? এমনি ক'রে ত আমিও ভাবতে পাবি নি!"

"ভাইয়া, আপনারা পুরুষ মানুষ, যতটা তাকান ততটা দেখতে পান না। আপনাদের স্বদেশী ত কমদিনের নয়। আপনারা স্বদেশী করেছেন, আমরা তাকিয়ে আপনাদের দেখেছি। দেখেছি, গৌরবের সঙ্গে অগৌরবও, বলের সঙ্গে দুর্বলতা, ত্যাগের সঙ্গে লোভ, বিনয়েব মধ্যে অহঙ্কার। আপনাদের গৌরবে আমরাও রঙিন হয়েছি—কিন্তু লুকিয়ে আমরা যে বাঁকা হেসেছি তা আপনারা দেখতে পান নি। আমরা রাজনীতির বড় বড় কথা বুঝি নি, কিন্তু আপনাদের মত মানুষদের বেশ ভালই চিনেছি, দেখেছি, বুঝেছি।"

"আপনার কথা শুনে আমারও যে ভয় করছে, ভাবীজী। আমার সব দুর্বলতাও আপনি জেনে ফেলেছেন।"

"ভাইয়া, আপনি সজ্জন, সবাই আপনাকে শ্রদ্ধা করে। উদয়াচলের গৌরব আপনি।"

"ভাবীজী, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না।"

"কিন্তু, ভাইয়া, পবিত্রতা যেমন বাঞ্ছনীয়, শুচিবাই তেমনি অবাঞ্ছনীয়।"

"তার মানে?"

"রাস্তায় দেখবেন, ভিখারী সযত্নে তার দেহের ক্ষতকে বাঁচিয়ে রাখে, ওই তার উপায়ের সম্বল। কিছু মনে করবেন না, ভাইয়া, আপনি ঠিক তার বিপরীত।"

দুর্গাভাই-এর মুখ লাল হয়ে উঠল।

"আপনি আপনার সততা এমন সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন যে, ওটা আপনার কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে—উদয়াচলের থেকে, ভারতবর্ষের থেকে।"

"তা কি অন্যায়, ভাবীজী?"

"ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তুলছি নে, ভাইয়া। এই সততা আপনাকে দুর্বল করেছে।"

"দুর্বল?"

"দুর্বল নয়? আপনি নিজের সুনামকে বাঁচাতে গিয়ে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন।"

"সবচেয়ে বড় দায়িত্ব? কিসের দায়িত্ব?"

"উদয়াচলের নেতৃত্বের দায়িত্ব। মুখ্যমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব।"

জীবনে বোধ করি প্রথমবার দুর্গাভাই-এর বুক কেঁপে উঠল।

পদ্মাদেবীর কণ্ঠস্বর কঠিন।

"এ দায়িত্ব আজ নয়, পাঁচ বছর আগে আপনার গ্রহণ করা উচিত ছিল। রাজনীতির কদর্য চেহারা দেখে সেই যে আপনি ভয় পেয়েছিলেন, সে ভয় আপনার আর কাটল না।"

মৃদুস্বরে দুর্গাভাই বললেন, "তা সত্যি।"

"যদি ভয়ই পাবেন তবে এর মধ্যে এলেন কেন? রাজনীতি ও রাজত্ব করা ছাড়া আপনার কি আর কোনও কাজ ছিল না?"

"কোশলজীকে সাহায্য করা সেদিন সবচেয়ে বড় কর্তব্য মনে হয়েছিল।"

"মনে আছে, ভাইয়া, মন্ত্রীসভা তৈরী হবার আগে আপনাকে সেদিনও আমি বলেছিলাম, নেতৃত্ব করবার দুঃসাহস আপনার নেই। আপনি উত্তর দিয়েছিলেন, সে দুঃসাহসের প্রয়োজন আজ নেই। যদি কখনও হয়, নিরাশ করবেন না।"

"মনে পড়ছে।"

"আজ আপনাকে এ জন্যেই তলব করেছি, ভাইয়া। যদি সাহস আপনার থাকে তা হ'লে এবার প্রমাণ দিন।"

"কি বলছেন আপনি, ভাবীজী?

"আরও সহজ ক'রে বলি। কোশলজী পাঁচ বছরের বেশি উদয়াচলের নেতৃত্ব করেছেন। তাঁর পক্ষে যতখানি ঐকান্তিক সেবা সম্ভব, উদয়াচলকে তিনি তা দিয়েছেন। দেবার মত আর তাঁর কিছু নেই। এবার যে সংঘাত চলছে, তিনি যদি জেতেন, উদয়াচলের সেবা তাঁর দ্বারা আর সম্ভব হবে না। তাই তাঁর প্রয়োজন পরাজয়। পরাজয়ে তাঁর নিজের মঙ্গল, উদয়াচলের মঙ্গল।"

দুর্গাভাই-এর নীরব বিস্মিত চোখে চোখ রেখে পদ্মাদেবী আরও বললেন: "স্বামীর পরাজয় চাইছি ব'লে আপনি অবাক্ হচ্ছেন। তাঁকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি বলেই চাইছি।"

"ভাবীজী, আপনাকে দেখে জীবনে এই প্রথম অবাক্ হচ্ছি না।"

"কোশলজীর পরাজয় সম্ভব একমাত্র আপনার সাহায্যে।"

"আমার সাহায্যে?"

"তাই। একদিন আপনি কর্তব্যের আহ্বানে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ কর্তব্যের আহ্বানে আপনার উচিত তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ান।"

দুর্গাভাই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

তারপর বললেনঃ "ভাবীজী, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে পবাজিত করা আজ কঠিন কাজ নয়; কঠিন কাজ হ'ল তার পরে। কোশলজীব পবে মুখ্যমন্ত্রী হবেন কে?"

পদ্মাদেবীর চোখে আগুন, মুখে কঠিন হাসিঃ

"যদি সাহস থাকে ভাইয়া, তবে আপনি। যদি সাহস না থাকে, তবে—"

এই নাটকীয় ঘটনাব পাঁচ দিন পবে দুর্গাভাই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে ছোট্ট একটি নোট পাঠালেন। একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয়।

"আগামী সপ্তাহে বিধান সভায় কংগ্রেসী দলের বৈঠক বসবে। আপনি জানেন, এ বৈঠকের একমাত্র আলোচ্য বিষয় বর্তমান মন্ত্রী সভার পরিবর্তন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি, এ প্রস্তাবেব বিরুদ্ধে দাঁড়ান আমার দ্বাবা সম্ভব নয়। এ সিদ্ধান্তে আসা আমার পক্ষে সহজ হয়নি। কিন্তু কর্তব্যেব আহ্বান আমি অবহেলা করতে পাবলাম না। আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।"

দলেব বৈঠকে সুদর্শন দুবে বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন। হাই কমাণ্ডেব একজন প্রতিনিধি ছিলেন সভাপতি। হরিশংকর ত্রিপাঠী প্রস্তাব উত্থাপন করলেনঃ

বর্তমান মন্ত্রীসভা দলের অধিকাংশ সদস্যেব আস্থা হারিয়েছেন। এই সভা প্রস্তাব করছে দলের নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হোক।

গোপন ব্যালটে ভোট গৃহীত হ'ল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পাঁচ ভোটে পরাজয় হ'ল।

সুদর্শন দুবে খুশী হলেন না। তিনি চেয়েছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নেব বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ কবা হোক। দুর্গাভাইকে রাজী করাতে

পারেন নি। হেরে গিয়েও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রকৃত হার হ'ল না। নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের পথ তাঁর জন্যেও খোলা রইল। সুদর্শন দুবে আরও বুঝতে পারলেন যে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরুদ্ধে মাত্র পাঁচ ভোটে জয়লাভ কোনও রকমেই নিশ্চিত বিজয় নয়।

দুর্গাভাই কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সাফল্যে বিস্মিত হ'লেন।

মাত্র পাঁচ ভোটে হেরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নেতৃত্বের আশ্চর্য ক্ষমতা জাহির করেছেন।

নতুন নেতা নির্বাচন নিয়ে গোলমাল হ'ল।

সুদর্শন দুবে চাইলেন তক্ষুণি নতুন নেতা নির্বাচিত হোক্।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আপত্তি করলেন।

"মাত্র পাঁচ ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। প্রতিপক্ষ সব রকম চেষ্টা করেও এর বেশি কেরামতি দেখাতে পারেন নি। আজই নতুন নেতা নির্বাচিত হ'লে পরবর্তী মন্ত্রীসভা দুর্বল ও স্বাস্থ্যহীন হ'তে বাধ্য। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, কয়েক দিন সময় পেলে সদস্যগণ অনেকেই দ্বিতীয়বার চিন্তা ক'রে দেখবেন। নেতা যিনিই নির্বাচিত হোন না কেন, তাঁর সুস্পষ্ট সমর্থন থাকা একান্ত প্রয়োজন।"

সুদর্শন দুবে উত্তর দিলেন: "বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি দলের অধিকাংশ আস্থা হারিয়েছেন। অতএব, দলের নেতা হবার অধিকার আর তাঁর নেই। নতুন নেতা নির্বাচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে, মুখ্যমন্ত্রী যে-সব উপায়ে অনেক সদস্যের সমর্থন জোগাড় করেছেন তার প্রকৃত তাৎপর্য সদস্যরা বুঝবেন, এবং আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তাঁদের অনেকেই নতুন দলনেতার সঙ্গে হাত মেলাবেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রতিবাদ করলেন: "অনাস্থা প্রস্তাবে মুখ্যমন্ত্রীর উল্লেখ নেই। অনাস্থা প্রস্তাব মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে। মন্ত্রীসভায় অনেক গলদ প্রবেশ করেছিল। একাধিক মন্ত্রী জনগণের আস্থা হারিয়েছেন। কিন্তু দলের নতুন নেতা কে হবেন সে প্রশ্ন এখনও খোলা। দলের নেতৃত্ব কারুর একচেটিয়া নয়। গণতন্ত্রে এ অধিকার

প্রত্যেক সদস্যের সমান। নতুন নেতৃনির্বাচনে আমার প্রার্থী হবার অধিকার আছে কি না সভাপতির পরিষ্কার নির্দেশ চাই।"

সভাপতি নির্দেশ দিলেন, "আছে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "এবার আমার প্রস্তাব, নতুন নেতা নির্বাচন চার দিনের জন্যে স্থগিত থাক। আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটার সময় এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক।"

সুদর্শন দুবে দৃঢ়তার সঙ্গে আপত্তি জানালেন।

তাঁকে সমর্থন করলেন মহেন্দ্র বাজপাঈ, মাধব দেশপাণ্ডে, হরিশংকর ত্রিপাঠী।

সভাপতি এবার দুর্গাভাই-এর মত চাইলেন।

দুর্গাভাই কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। যখন বললেন, তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

"আমি মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব সমর্থন করি।"

সুদর্শন দুবে চেঁচিয়ে উঠলেন। "হায় রাম!"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল পাথরের মত নিস্তব্ধ।

দুর্গাভাই-এর কথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ বুজলেন। যেন ধ্যানস্থ।

এবার হাত তুলে ভোট।

চুয়াল্লিশ ভোটে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

হেরেও তিনি জিতলেন। কিংবা পদ্মাদেবী যা আশঙ্কা করেছিলেন, জিতেও তিনি হারলেন।

নয়

মাধব দেশপাণ্ডেকে নিজের খাস কামরায় নিযে সযত্নে, সাদরে সসম্মানে বসালেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

একটা বড় তাকিয়া এগিয়ে দিলেন।

"বসুন, মাধবভাই, বসুন। আরাম ক'রে বসুন। রাজ-নীতি আর রাজকার্য ক'রে আরাম ত ভুলেই গেছেন। তবিয়ৎ আপনার সুস্থ আছে ত? নিজের দেহের দিকে নজর রাখবেন। বসুন, আরাম ক'রে বসুন।"

বেয়ারাকে ডাকলেন: "বাদামের সরবৎ নিয়ে এস দেশপাণ্ডেজীর জন্যে।"

মাধব দেশপাণ্ডে তাকিয়া টেনে বসলেন। কিন্তু স্বস্তিবোধ করলেন না। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে ব'সে কদাপি তিনি স্বাভাবিক হ'তে পারেন না। মনে হয়, এ লোকটা যেন আমার মনের সব কথা বুঝে নিচ্ছে। আমার আদ্যোপান্ত দেখছে। আমি কঙ্কাল হয়ে এর সামনে বসে আছি।

হ'লও ঠিক তাই। মাধব দেশপাণ্ডের মনে সঙ্কোচ সংশয়ের যা আসল কারণ তাই বাইরে টেনে আনলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

"আপনি অস্বস্তি বোধ করছেন, মাধবভাই। ভাবছেন, আমার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আপনি আমাকে দারুণ চটিয়েছেন,। ভাবছেন, সুদর্শন দুবেকে সমর্থন ক'রে আপনি আমাকে চির-শত্রু করেছেন।"

মাধব দেশপাণ্ডের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হ'ল।

"তা নয়, মাধবভাই: রাজনীতিকে অমন ভয়ানক গম্ভীরভাবে গ্রহণ করতে নেই। এও এক খেলা। আমি চিরদিন বিশ্বাস ক'রে এসেছি রাজনীতিতে শত্রু-মিত্র নেই। আজ যে বিপক্ষ, কাল সে স্বপক্ষ। আজ যে আমার দলে, কাল সে অন্য দলে। রাজনীতি

যদি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের আস্বাদ নষ্ট ক'রে দেয় তা হ'লে ত সর্বনাশ।"

মাধব দেশপাণ্ডের মুখে এখনও ভাষা এল না।

"আমি অনেক ভেবেছি, মাধবভাই, আপনার কথা। বুঝতে চেষ্টা করেছি কেন আপনি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। নিশ্চয় আমার বিরুদ্ধে আপনার অনেক নালিশ আছে। অথচ খোলাখুলি আপনি কখনও আমায় তা জানান নি। জানালে হয়ত দেখতেন, নালিশ থাকবার আপনার কথা নয়। বস্তুত পক্ষে, আমি সাধ্যের বেশি, উচিতের বেশি, আপনাকে আগলে এসেছি। টিউবওয়েল নিয়ে ব্যাপারটা আরও বহুদূর গড়াত, মাধবভাই, যদি আমি আপনাকে না আগলে রাখতাম।"

এতক্ষণে মাধব দেশপাণ্ডে কথা বললেন।

"আমাকে আগলেছেন তা জানি। কিন্তু সে আমার জন্যে নয়, আপনার জন্যেই।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে ফেললেন।

"ওটা আপনার কথা নয়, মাধবভাই। ওটা সুদর্শন দুবের কথা। সে আপনাকে অমন বুঝিয়েছে।"

মাধব দেশপাণ্ডে প্রতিবাদ করলেন, "সুদর্শন দুবেজী যা বলেছেন আমি তার সঙ্গে একমত হয়েছি।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।" কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মেনে নিলেন। "এক মত না হ'লে আপনি কেন তার মতে সায় দেবেন? কারুর কথায় ওঠ্-বোস করার মানুষ যে আপনি নন, তা কি আমি জানি নে?"

মাধব দেশপাণ্ডের কান জ্বালা করে উঠল। ঠিক ধরতে পারলেন না কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যঙ্গ করছেন, না মনের কথা বলছেন।

"অথচ আপনি জানেন না, সুদর্শন দুবেই সবচেয়ে বড় গলায় দাবি করেছিল টিউবওয়েল ব্যাপারে পাব্লিক জুডিশিয়েল এন্কোয়ারীর।"

"আমি বিশ্বাস করি না।" মাধব দেশপাণ্ডে সোজা হয়ে বসলেন।

"বিশ্বাস করা সহজ নয়," মৃদু হেসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন। "কিন্তু, মাধবভাই, এতদিনে আপনার জানা উচিত ছিল, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল মিথ্যা বলে না।"

মাধব দেশপাণ্ডে চুপ ক'রে রইলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাঁ-দিকে সুরক্ষিত টিনের বাক্স খুলে একখণ্ড কাগজ বার করলেন।

"প'ড়ে দেখুন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে লেখা সুদর্শন ভুবের পত্র।

প'ড়ে মাধব দেশপাণ্ডে নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চিঠিখানা সযত্নে বাক্সে রেখে দিলেন।

এবার বাঁকা হাসিতে তাঁর ধনুকের মত ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হ'ল।

"বিশ্বাস হ'ল, মাধবভাই ?"

একটু পরে: "যাক্ গে, এসব কথা থাক। আমি আপনার মন সুদর্শনের বিরুদ্ধে বিষাক্ত করতে চাই নে। যদি আপনি তাঁকে প্রশ্ন করেন কেন সে এ-চিঠি আমায় লিখেছিল, নিশ্চয় একটা মানানসই ব্যাখ্যা সে আপনাকে দিতে পারবে। হয়ত বলবে, তার লক্ষ্য ছিলাম আমি, আপনি নন।"

মিনিট খানেক পরে: "খোঁজ করলে জানতে পারবেন, যে বিভাগের দায়িত্ব বর্তমানে আপনার, সে বিভাগের পূর্ণ মন্ত্রীত্ব সুদর্শন প্রজাপতি শেউড়েকে দেবার অঙ্গীকার করেছে।"

এ কথায় মাধব দেশপাণ্ডে বিচলিত হলেন না।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "জানি, আপনাকে সে আরও অনেক বড় অঙ্গীকার করেছে। হয় মুখ্যমন্ত্রীত্ব, নয় অর্থমন্ত্রীত্ব।"

এবার মাধব দেশপাণ্ডে কিঞ্চিৎ অস্থিরতা দেখালেন।

"খোঁজ নিয়ে দেখুন, ঐ একই লোভ সে আরও তিনজনকে দেখিয়েছে।"

বেয়ারা শ্বেত-পাথরের গ্লাসে সরবৎ নিয়ে এল। রাখল মাধব দেশপাণ্ডের সামনে। মাধব তা স্পর্শ করতে পারলেন না।

টেলিফোন বাজল।

রিসিভার তুলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন : "বলছি। নমস্তে। বেশ ত, খুব আনন্দের কথা। তিনটের সময় আসুন। জী, হ্যাঁ তিনটে।"

টেলিফোন নামিয়ে রেখে তাকিয়ায় দেহ এলিয়ে দিলেন।

বললেন : "আমার আর এসব ভাল লাগছে না, মাধবভাই। দেশ স্বাধীন হ'ল, শাসনভার বিদেশীদের কাছ থেকে হঠাৎ চলে এল আমাদের কাছে। নতুন দায়িত্ব, নতুন কর্তব্য মাথায় ক'রে নেওয়ার মধ্যে দুঃসাহস ছিল, আনন্দও ছিল। যোগ্যতা, অযোগ্যতা সব কিছু নিয়ে সে দায়িত্ব এতদিন গ্রহণ করছিলাম। সাধ্যমত তা পালন করবার চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। তখন ভাবি নি এ নতুন দায়িত্বের পেছনে এত বড় আত্মকলহ লুকিয়ে রয়েছে। ভাবি নি, স্বাধীনতার পর এত শীঘ্র আমরা ক্ষমতার জন্যে এমন কুৎসিত আত্মসংগ্রামে লিপ্ত হব। আমার সব সাধ পূর্ণ হয়েছে, মাধবভাই। এবার অন্তরে বনানীর আহ্বান শুনছি, এ দায়িত্ব আর নয়। দুর্গাভাইকে রাজী করতে পারলে এ দায়িত্ব তাঁকেই দিয়ে দেব ; তিনি রাজী না হ'লে সুদর্শন দুবেকেই। মুখ্যমন্ত্রী হবার বড় সখ তার, একবার হয়ে দেখুক। কণ্টকশয্যা কাকে বলে জানতে পারবে।"

মাধব দেশপাণ্ডে অতিশয় শঙ্কিত হলেন।

দুর্গাভাই মুখ্যমন্ত্রী হ'লে মন্ত্রীসভায় যে তাঁর স্থান হবে না, তা তিনি নিশ্চিত জানতেন। সুদর্শন দুবের দলে ভিড়েছিলেন কতকটা ভয়ে, কিছুটা লোভে, কিছুটা রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিতে। ভয় পেয়েছিলেন এজন্যে যে, সুদর্শন দুবে খোলাখুলি শাসিয়েছিলেন যে অন্যথা টিউবওয়েল কেলেঙ্কারীর হাঁড়ি তিনি হাটে না ভেঙ্গে ছাড়বেন না। লোভ হয়েছিল সুদর্শন দুবের কাছে অর্থমন্ত্রীত্ব এমন কি মুখ্যমন্ত্রীত্বের আশা পেয়ে। আর, ভেবেছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের তরী এবার ডুবেছে।

ভেসে উঠেছে সুদর্শন দুবের ভেলা। জয়ীর সঙ্গে পা রেখে চলার তাগিয়েও সুদর্শন দুবের তাঁবুতে গিয়ে ভিড়েছিলেন।

কূটনৈতিক বুদ্ধি যেটুকু, তা মাধব দেশপাণ্ডের একেবারে নিজস্ব। তিনি জানতেন যে, যে-কোনও কারণেই হোক্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন টিউবওয়েল কেলেঙ্কারীটা চেপে যাবেন। আরও জানতেন যে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে যতই না কেন তিনি না-বুঝুন, যতটাই অস্বস্তি লাগুক তাঁর সান্নিধ্য, মানুষ হিসেবে সুদর্শন দুবের সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শক্ত মানুষ, তাঁর কথাবার্তা, কাজকর্মে শক্তির ছাপ আছে। ভীরু মানুষের গোপন বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক কারবার তাঁর সঙ্গে করা যতটা সহজ, সুদর্শন দুবের সঙ্গে ঠিক ততটা কঠিন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সর্বদা মাধব দেশপাণ্ডের মত লোকদের ছোট ক'রে দূরে সরিয়ে রাখেন: সমকক্ষের সম্মান দেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে থেকে সর্বদা এক ধরনের নিশ্চিন্ত সংরক্ষণ পাওয়া যায়। অনেকটা বিরাট্ বটগাছের নীচে ব'সে থাকার মত। বটগাছ ক্লান্ত পথিককে নিজের চেয়ে অনেক ছোট ভাবে, কিন্তু ছায়া থেকে বঞ্চিত করে না; দু'চারটে পাতা বা ছোট্ট ডাল ছিঁড়লে রাগেও না।

সুদর্শন দুবের কোনও বটচ্ছায়া নেই। তাঁর সঙ্গে থাকা মানে পচা দিঘির শ্যাওলা-পেছল ঘাটে দাঁড়ান। কখন পা পিছলে নোংরা জলে পড়তে হবে তার ঠিক নেই।

মাধব দেশপাণ্ডে ভেবেছিলেন, সুদর্শন দুবের সঙ্গে তাল ঠুকে ঠিক শেষ মুহূর্তে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সঙ্গে একটা সুবিধেমত বোঝাপড়া ক'রে নেবেন। যদি দেখতে পান কৃষ্ণদ্বৈপায়নই জয়ী হ'তে চলেছেন।

আশা করেছিলেন, সঙ্কট থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিছু বেশি মূল্য দিতে রাজী হবেন মাধব দেশপাণ্ডের সমর্থনের।

কিন্তু এ সবই বানচাল হয়ে যাবে যদি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার ক'রে নেন।

মাধব দেশপাণ্ডে ব'লে উঠলেন, "তা হয় না, কোশলজী। উদয়াচলের ভবিষ্যৎটা একবার ভেবে দেখবেন।"

"আমি সাড়ে পাঁচ বছর ভেবেছি, মাধবভাই", ক্লান্ত সুরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "এবার আপনারা সবাই ভাবুন। আপনারাও ভেবেছেন, এবার আরও বেশি ক'রে ভাববেন।"

"কোশলজী, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।"

"বলুন"

"আপনি ভেবে বসবেন না যে আমি অনিবার্যরূপে আপনার বিপক্ষে।"

"তা ত আমি কদাচ ভাবি নি, মাধবভাই! আজ মুখ্যমন্ত্রীরূপে আমাকে যদি আপনি না-ও চান, আপনি আমার একেবারে বিপক্ষে, এমন ত কোনও কারণ নেই! মাধবভাই, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের একমাত্র পরিচয় উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী নয়। তার আরও কিছু পরিচয় আছে। আমি জানি, আপনি আমার কাব্য পড়তে ভালবাসেন। 'কৃষ্ণলীলাকাহানী'র আপনি উৎসাহী পাঠক। কবি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সঙ্গে আপনার কোনও বিরোধিতা নেই, তা কি আমি জানি নে?"

মাধব দেশপাণ্ডে ঘেমে উঠলেন। এঁর সঙ্গে কথা বলাও শ্রমসাধ্য।

"কবি হিসেবে আপনি অজাতশত্রু, কোশলজী। কিন্তু দলের নেতা হিসেবেও আপনি ভাববেন না আমি অনিবার্যরূপে অপনার বিপক্ষে। আপনি জানেন, নতুন দলপতি নির্বাচনে আমি আপনার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলাম।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হঠাৎ এমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, এমন চিন্তাকুল হ'ল তাঁর মুখচ্ছবি যে, তিনি যেন মাধব দেশপাণ্ডের কথাগুলি শুনতে পেলেন না।

কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা জুড়ে রইল।

হঠাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব'লে উঠলেন, "আপনার জন্যে আমার বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে, মাধবভাই।"

মাধব দেশপাণ্ডে চম্‌কে গেলেন।

"দুশ্চিন্তা? আমার জন্যে? আপনার? কেন?"

"আজ আপনি যতই সুদর্শন দুবের সঙ্গে হাত মেলান না কেন, একথা আপনি ঠিক জানেন যে, আপনার সুনাম ও স্বার্থ বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টার আমি ক্রুটি করি নি। আমার প্রটেক্‌শন না পেলে আপনার মন্ত্রীত্ব কেন রাজনৈতিক নেতৃত্বও বহুদিন আগেই নষ্ট হয়ে যেত।"

মাধব দেশপাণ্ডে কিছু বলতে পারলেন না।

"কিন্তু আর বুঝি আপনাকে আমি রক্ষা করতে পারলাম না।"

"আপনার কথা আমি বুঝতে পারছিনা, কোশলজী।"

মাধব দেশপাণ্ডের কণ্ঠস্বরে এবার প্রচ্ছন্ন শঙ্কা।

"দলপতি নির্বাচিত হই আর না হই সহকর্মীদের প্রতি দলনেতার দায়িত্ব শেষদিন পর্যন্ত পালন ক'রে যাব ভেবে খানিকটা তৃপ্তি পাচ্ছিলাম। কিন্তু বিধাতা সে তৃপ্তি থেকে আমায় বঞ্চিত করছেন।"

মাধব দেশপাণ্ডে অস্থির হয়ে উঠলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "আজ, একটু পরে, ক্যাবিনেট মিটিং-এ গোবর্ধন বাঁধের ব্রীজ দুটোর ব্যাপার আলোচিত হচ্ছে।"

"জানি।"

"হরিশংকর ত্রিপাঠী হনুমান নেশন বিল্ডিং কোম্পানাকে ব্রীজের কন্‌ট্রাক্ট দিতে আপত্তি তুলছেন।"

"তাতে আমি অবাক হচ্ছি নে।"

"দুর্গাভাইও বিরুদ্ধে।"

"হওয়াই স্বাভাবিক।"

"মন্ত্রীসভার বর্তমান অবস্থায় হনুমানকে কনট্রাক্ট দেবার প্রস্তাব আমি সমর্থন করতে চাই নে।"

"বেশ ত। ওটা বর্তমানে স্থগিত রাখাই সমীচীন হবে।"

"এদিকে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটে গেছে!"

মাধব দেশপাণ্ডেকে অস্থির প্রতীক্ষায় রেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তু'-মিনিট গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

তার পর বললেন, "একটু খুলে বলি ব্যাপারটা আপনাকে। উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী আমি; প্রদেশের সর্বত্র কি হচ্ছে না হচ্ছে আমার জানা দরকার। প্রায় সবাই জানে, আমার একটা নিজস্ব খবর বিভাগ আছে। অফিসাররা কে কোথায় কবে কি করছে, সব খবর আমি পাই। ধরুন, আমি জানি, রতনগড়ের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে গতকাল জেলা কংগ্রেসের সভাপতি জীওনলাল গুপ্ত উপস্থিত হয়েছিলেন একটা গোপন সংবাদের জন্যে; ম্যাজিষ্ট্রেট সে সংবাদ তাঁকে দিয়েছে। জীওনলাল, আপনি জানেন, সুদর্শন তুবের লোক। আমি জানি রাধানগরের পুলিস-সুপার পরশু দিন তু' হাজার টাকা 'ধার' নিয়েছে এক মদের ব্যবসায়ীর কাছ থেকে; ব্যবসায়ীর নামও আমি জানি।"

মাধব দেশপাণ্ডের চোখে পলক পড়ল না।

"সব সময় এ সব সংবাদ আমি ব্যবহার করি নে। দরকার হ'লে করি। আমার মন্ত্রীসভার সহকর্মীদের সম্বন্ধেও অনেক খবর আমি জানি। সত্যি কথা বলতে কি, তাদের প্রত্যেকেব সম্বন্ধে আমার এক-একটি গোপন ফাইল আছে।"

"বলেন কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার ফাইলটা গতকাল চুরি হয়ে গেছে!"

মাধব দেশপাণ্ডে আঁৎকে উঠলেন।

"অ্যাঁ! সবনাশ!"

"সর্বনাশই বটে, মাধবভাই। ওতে অনেক কিছু ছিল। কেবল টিউবওয়েল ব্যাপারের নথিপত্র নয়, গোবর্ধন বাঁধেরও অনেক কাগজ-পত্র। আপনার নিজের হাতে লেখা চারখানা চিঠিও। যে-চিঠিখানা

আপনি বোম্বাই-এর ব্যবসায়ী এস. আর. সোমানীকে লিখেছিলেন, সেটাও।”

“কোশলজী—”

“শুধু চুরি যায় নি। গত রাত্রে জানতে পেরেছি সে ফাইলটা সুদর্শন দুবের কাছে পৌঁছেছে। কে চুরি করেছে তাও আমার অজানা নেই।”

“কোশলজী—”

মাধব দেশপাণ্ডের আর্তস্বরকে বিদ্রূপ ক'রে টেলিফোন বাজল :

“কোশল।”

“সব ব্যবস্থা ঠিক আছে ত ?”

“কে ?”

“এসে গেছেন ? আচ্ছা, আমি নীচে নামছি।”

মাধব দেশপাণ্ডের পিঠে হাত রেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, “ক্যাবিনেট মিটিং-এর সময় হয়েছে। আপনি ক্যাবিনেটরুমে গিয়ে বসুন। দুর্গাভাই এসে গেছেন। আমি নীচে যাচ্ছি।”

দশ

চার ভাই-এ একত্র হয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। স্থান—অম্বিকা-প্রসাদের বসবার ঘর। আসবাবপত্র বিশেষ নেই। বড় একটা সেগুনকাঠের টেবিল, আধ ময়লা কাপড়ে ঢাকা; টেবিলে খানকয়েক আইনের বই, দোয়াত-কলম, ছ'খানা অভিধান। খান চারেক চেয়ার। ছটো পুরাতন আলমারি; আইনের বই-এ ভর্তি। একপাশে একখানা পালঙ্ক। নীল রং-এর তাতে বোনা বেড-কভারে ঢাকা।

অম্বিকাপ্রসাদ খাটের ওপর বসেছিলেন। কৃশাঙ্গ, মোলায়েম চেহারা। মাথায় বড় বড় চুল। রং ফর্সা না হলেও বেশ মাজা। বড় একজোড়া গোফ অম্বিকাপ্রসাদের ভাল-মানুষ মুখখানায় কেমন একটা নিবোধের বিশেষণ যোগ করেছে। অম্বিকাপ্রসাদ এমনিতেই কথা বলে কম; সর্বদা যেন এক বিড়ম্বিত ভাব।

টেবিলের সঙ্গে যে চেয়ার তাতে বসেছে সূর্যপ্রসাদ। সেও দীর্ঘাকৃতি, চওড়া কপাল, রং বেশ ফর্সা, দেহে কিঞ্চিৎ মাংসের প্রাচুয। সূর্যপ্রসাদ এম. এল. এ; অতএব, নিজের মযাদা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। মুখ্যমন্ত্রী পিতার, বলতে গেলে, সে-ই রাজনৈতিক বংশধর। বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিল; ছাত্রকালেই রাজনীতিতে হাতেখড়ি। ছাত্র-কংগ্রেসের নেতা হিসেবে স্বাধীনতার আগে একবার বছরখানেক জেল খেটে স্নাতকোত্তর।

জানলার পাশে চেয়ারে বসেছে শ্যামাপ্রসাদ। বেঁটে-খাটো মোটা-সোটা, রং শ্যামবর্ণ। ম্যাট্রিক পাস ক'রে আর কলেজে যায় নি। চিরদিন ব্যবসায়ে ঝোঁক। প্রথম কয়েক মাস কনট্রাক্টারী করার পর বেঙ্গল পেপার মিসল্-এর উদয়াচলের সোল এজেন্সী পেয়েছিল। বছরখানেক পরে সেটা হাতছাড়া হয়ে যায়। তখন থেকে কাপড়ের ব্যবসা। এ ব্যবসায় সে সার্থকতা অর্জন করেছে।

বিলাসপুরে তার পাইকারী ব্যবসা; কুষাণপুরেও। রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ নেই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র, রাজনীতি সম্পূর্ণ এড়াতে পারে না। ব্যবসায়ী-মহলে এ-জন্যে তার প্রতিপত্তি কম নয়।

দরজার কাছে চেয়ারে পা রেখে কপাটে দেহ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চন্দ্রপ্রসাদ।

সূর্যপ্রসাদ রাজনৈতিক পরিস্থিতির শেষতম অবস্থার ব্যাখ্যা শোনাচ্ছিল তিন ভাইকে।

"পিতাজী বড় বেশি আশাবাদী হয়ে রয়েছেন," বলছিল সূর্য-প্রসাদ। "অবস্থা যে কতটা সঙ্গীন হয় তিনি জানেন না, নয় জেনেও মানতে চান না।"

"তুমি তাঁর সঙ্গে ক'বার কতক্ষণ আলোচনা করেছ?"—প্রশ্ন করল চন্দ্রপ্রসাদ।

"আমি তোমার মত মূর্খ নই। আলোচনার দরকার হয় না। আমি জানি ব'লেই বলছি।"

চন্দ্রপ্রসাদ বলল, "তুমি কি ক'রে জান পিতাজী অকারণ আশাবাদী হয়ে রয়েছেন?"

সূর্যপ্রসাদ বিরক্ত হয়ে জবাব দিল, "আমি জানি।"

অম্বিকাপ্রসাদ বলল, "রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে এ ধরনের লড়াই অত্যন্ত ক্ষতিকর। যেই জিতুন, কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়বে।"

চন্দ্রপ্রসাদ বলল, "লড়াই ছাড়া পথ কোথায়, বল?"

অম্বিকাপ্রসাদ বলল, "কেন? সবাই মিলে আপোস ক'রে নিলেই ত সব চুকে যায়! এতদিন আপোস চলল, আর এখন চলবে না?"

সূর্যপ্রসাদ বলল, "কে. ডি. কোশল কখনও আপোস করেন না অন্যায়ের সঙ্গে, বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে।"

চন্দ্রপ্রসাদ বলল, "ঠিক বলেছ। ঠিক এম. এল. এ-র মত বলেছ।"

সূর্যপ্রসাদ ধমক দিয়ে বলল, "তুমি চুপ কর।"

"আমি চুপ করলে কি হবে? এদিকে তোমার অবস্থা ভেবে দেখেছ?"

"আমার আবার কি অবস্থা?"

"পিতাজী হেরে গেলে তোমার কি হবে?"

"কেন? আমি কি পিতাজীর ওপব নির্ভর ক'বে আছি। আমি নিজের নেতৃত্বে বিধান সভায় ঢুকেছি।"

"শুনতে ভাল লাগছে। বছর না ঘুরতে নির্বাচন, জান ত?"

"তোমার চেয়ে বেশি জানি।"

"তা নিশ্চয় জান। শুধু জান না, তোমার আর বিন্দুমাত্র চান্স নেই। পিতাজী হারলে, তুমিও ডুববে।"

শ্যামাপ্রসাদ বললে, "এসব ইয়ার্কি থাক। পিতাজী হারলে আমাদের সবারই ভয়ানক ক্ষতি হবে। সূর্যপ্রসাদ, অবস্থা তুমি ভাল দেখছ না, এই ত?"

"না।"

"কেন বলতে পার?"

"সব কিছু নির্ভর করছে দুর্গাভাইজীর ওপর। তিনি যদি দুবেজীর সঙ্গে দাঁড়ান, পিতাজীর পরাজয় নিশ্চিত।"

"দাঁড়াবেন মনে হচ্ছে?"

"দুর্গাভাইজীর ওপর নানারকম চাপ পড়ছে। সবচেয়ে বড় চাপ তাঁর গৃহেই।"

অম্বিকাপ্রসাদ বলল, "গৃহে মানে?"

সূর্যপ্রসাদ জবাব দিলে, "তুমি যেমন দিনরাত চাপ খাচ্ছ, তেমনি।"

শ্যামাপ্রসাদ বলল, "ব্যবসায়ী-মহল কিন্তু পিতাজীকেই চায়।"

চন্দ্রপ্রসাদ যোগ দিল, "সেটা তেমন জোর গলায় বলার মত নয়।"

শ্যামাপ্রসাদ বলল, "নয় কেন ? নির্বাচনের টাকা পাবে কোথায় কংগ্রেস ?"

চন্দ্রপ্রসাদ উত্তর দিল, "ওসব পর্দার আড়ালে।"

"তা হোক," শ্যামাপ্রসাদ বলল, "হাই কমাণ্ড এত নির্বোধ নয় যে, যে-গরু দুধ দেয় তাকেই জবাই করবে। হাই কমাণ্ডকে ভাবতেই হবে উদয়াচলের স্থিতিশীল অগ্রগতির কথা। পিতাজীর নেতৃত্বে প্রদেশে আজ পর্যন্ত কোনও বড় রকমের গোলমাল হয় নি। ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ ভালই চলেছে। আর্থিক উন্নতিও মন্দ হয় নি। গভর্ণমেণ্ট সবল ও স্থিতিশীল, এ বিশ্বাস ব্যবসায়ী-মহলে উন্নতির অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। এসব কথা হাই কমাণ্ড নিশ্চয় ভাববেন।"

চন্দ্রপ্রসাদ বলল, "তুমি চেম্বার অব কমার্স থেকে আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হও না কেন ?"

সূর্যপ্রসাদ বলল, "পরিহারজী দিল্লী থেকে কি খবর দিয়েছে জান ?"

অম্বিকাপ্রসাদ প্রশ্ন করল, "কি ?"

"হাই কমাণ্ড দোটানায় পড়েছেন। টিউবওয়েল এবং গোবধন বাঁধের ব্যাপারে পিতাজীর সুনাম অনেকখানি নষ্ট হয়েছে। তথাপি হাই কমাণ্ডের ইচ্ছে, পিতাজীই দলের নেতৃত্ব করুন। কিন্তু দুর্গা-ভাইজী যদি নেতৃত্ব করতে রাজী হন, তা হ'লে হাই কমাণ্ড তাঁর হাতে খুশী হয়ে নতুন মন্ত্রীসভার ভার দেবেন। হাই কমাণ্ড চান না দুবেজী কিংবা ত্রিপাঠীজী দলের নেতা হোন।"

চন্দ্রপ্রসাদ প্রশ্ন করল, "এত বড় মৌলিক খবরটা তুমি পেলে কোথায় ?"

"যেখানেই পেয়ে থাকি, তাতে তোমার কি ?"

"তুমি কি পিতাজীর ওপর গোয়েন্দাগিরি কর ?"

"চন্দ্রপ্রসাদ, তোমার বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে !"

"রাগছ কেন? তুমিও জান, আমিও জানি, পরিহারজীর রিপোর্ট জানেন একটিমাত্র লোক, তাঁর নাম কে. ডি কোশল। হয় তুমি টেলিফোনে কথাবার্তা 'ট্যাপ' করেছ, নয়ত টেলিগ্রাম চুরি ক'রে পড়েছ।"

"মোটেই না।"

"এবার তুমি সত্যি বলছ। আমিও জানি তুমি টেলিফোনও 'ট্যাপ' কর নি, টেলিগ্রামও চুরি ক'রে পড় নি।"

অম্বিকাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করল, "তা হ'লে ও জানল কি ক'রে?"

"বড়েভাই, ওটা সূর্যপ্রসাদের অনুমান মাত্র। খুব সহজ অনুমান। ও আমিও বলতে পারতাম।"

সূর্যপ্রসাদ চটে গেল।

"তোমার সঙ্গে কথা বলাই বোকামি। সারাদিন টো টো ক'রে ঘুরে বেড়াও আর বাপের পয়সায় ষ্টাইল কর। কোনও কর্মের নও তুমি।"

"একশ' বার মানি। কিন্তু তুমি তোমার কাজটি করেছ?"

"কি কাজ?"

"পিতাজীর সেই 'মিসিং থার্ড ম্যান্'? তাঁর খোঁজ পেয়েছ?"

সূর্যপ্রসাদ চুপ ক'রে গেল।

"অর্থাৎ পিতাজীর এই সঙ্কটে একটি মাত্র কাজ তিনি তোমায় করতে বলেছিলেন। তুমি করতে পার নি।"

"আর তুমি?"

"আমার কাজ আমি ঠিক ক'রে যাচ্ছি।"

"যথা?"

"টো টো ক'রে ঘোরা আর বাপের পয়সায় ষ্টাইল করা।"

অম্বিকাপ্রসাদ বললেন, "এ ব্যাপারে সরোজিনী সহায়ের স্থান কোথায় আমি বুঝতে পারছি না।"

সূর্যপ্রসাদ বলল, "আপনি তাকে দেখেছেন?"

"না।"

"বহুৎ খুবসুরৎ।"

"তার আগমন হ'ল কোত্থেকে?"

"যে নাটক উদয়াচলের রঙ্গমঞ্চে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তার একমাত্র নায়িকা সরোজিনী সহায়।"

শ্যামাপ্রসাদ বলল, "পিতাজী অনেক আগেই এ বিষবৃক্ষ উপড়ে দিতে পারতেন। কেন যে করেন নি বুঝতে পারি নে।"

সূর্যপ্রসাদ বলল, "সরোজিনী সহায়কে উপড়ে দেওয়া সহজ নয়। দেখবেন, সে এক বছর পরে অন্ততঃ উপমন্ত্রী হবে।"

"অসম্ভব। পিতাজী মুখ্যমন্ত্রী থাকতে নয়।"

"দেখবেন আপনি।"

অম্বিকাপ্রসাদ প্রশ্ন করল, "তুমি বলছ পিতাজী সরোজিনী সহায়কে মন্ত্রীসভায় নেবেন!"

"আমার ত তাই ধারণা।"

"হ'তেই পারে না," বলল শ্যামাপ্রসাদ।

সূর্যপ্রসাদ বিজ্ঞের মত মন্তব্য করল, "রাজনীতিতে সব হয়।"

আপিস-বাড়ীতে ক্যাবিনেট মিটিং শেষ হয়েছে। মন্ত্রীরা একে একে, বিদায় নিচ্ছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সহকর্মীদের এগিয়ে দিতে নীচে নেমে এসেছেন।

বেশির ভাগ মন্ত্রীদেরই মুখ গম্ভীব। কেউ কেউ পরস্পরের সঙ্গে হেসে কথা বলছেন। কিন্তু সে হাসি নিষ্প্রাণ।

এর মধ্যে রসিকতা যা করছেন সে কেবল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

দুর্গাভাইকে বলছেন, "দুর্গাভাইজী, রাত্রে সুনিদ্রা হচ্ছে ত? মৃত মন্ত্রীসভার ভূত দেখে ভয় পাচ্ছেন না ত?"

হরিশংকর ত্রিপাঠীকে: "ত্রিপাঠীজী, আগামী রবিবারে তাস খেলতে আসুন। আমার ত চাকরি থাকবে না। বেকার সময় নিয়ে কি করব ভেবে পাচ্ছি না।"

মহেন্দ্র বাজপাঈকে: "মহেন্দ্রভাই-এর মুখে একটা জ্যোতি দেখতে পাচ্ছি। এই বয়সে আবার প্রেমে পড়ছেন নাকি?"

মাধব দেশপাণ্ডেকে: "রাত্রে এক গ্লাস সিদ্ধি পান করুন। সুনিদ্রা হবে।"

একতলায় সংবাদিকগণ সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের কাছে উপনীত হ'তেই তাঁরা এসে ঘিরে দাঁড়ালেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে বললেন, "তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়।"

প্রশ্ন হ'ল: "আপনারা আজ কি কি সিদ্ধান্ত করলেন আমাদের বলবেন কি?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আগামী কাল বিধান সভায় কংগ্রেসী দলের নেতা পুনঃনির্বাচিত হবেন। বর্তমান কেয়ার-টেকার মন্ত্রীসভার আয়ু শেষ। আজ আমাদের শেষ সভা হল।"

"কি কি কাজ হল জনতে পারি কি আমরা?"

"নিশ্চয়! দুর্গাভাই দেশাই, অর্থমন্ত্রী, বেদপাঠ করলেন। হরিশংকর ত্রিপাঠী গীতার একাদশ অধ্যায় থেকে এগারটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন।"

মাধব দেশপাণ্ডে বললেন, "আপনার রঙ্গ-রসের শেষ নেই, কোশলজী।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "প্রায় ছ'বছর একসঙ্গে কাজ করেছি। আজ শেষদিন। কাল নতুন নেতা নির্বাচিত হবেন। দু'দিন পরে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হবে। আমাদের মধ্যে কে তাতে থাকবো কে থাকবো না কেউ জানে না। আমার তো না থাকাই সম্ভব। সুতরাং আজ যদি এই সব সাংবাদিকদের সঙ্গে একটু রঙ্গ-রস না করি তবে সুযোগ তো আর নাও পেতে পারি। মুখ্যমন্ত্রীর গদি একবার ফসকে গেলে এঁরা নিশ্চয় আমার ছায়া পর্যন্ত মাড়াবেন না।"

সাংবাদিকদের একজন বলে উঠলেন, "আপনার বিবৃতি আমরা অবশ্য ছাপবো।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "তা হয়তো কেটে ছেটে এক আধটু পরিবেশন করবেন।

রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আপনাদের অসীম দয়ার কথা কে না জানে? যাক, আমি যখন এখনও মুখ্যমন্ত্রী, এবং আপনারা আমার দ্বারে সৌভাগ্যক্রমে সমুপস্থিত, তখন আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবার শেষ আনন্দটুকু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাই নে। অতএব, প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করুন।"

প্রথম প্রশ্ন হল, "দলের নেতৃপদের জন্য প্রার্থী ক'জন, এবং কে কে?"

"এ প্রশ্নের জবাব আমি একা দিতে পারব না।"

"আপনি নিশ্চয় পুনর্নির্বাচন চাইবেন?"

"এ প্রশ্নের জবাব নীরবতা।"

"প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে কি?"

"একাধিক প্রার্থী থাকলে, হওয়াই সম্ভব।"

"একাধিক প্রার্থী থাকাটাই সম্ভব কি?"

"এ প্রশ্নের জবাব এখন দেওয়া সম্ভব নয়।"

সাংবাদিকদের সবাইকে উদ্দেশ্য ক'রে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আরও বললেন, "দলপতি যেই হোন না কেন, কংগ্রেসের ঐক্য, শক্তি ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। কংগ্রেস একই ভাবে, পূর্ণ সংহতি ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে, দেশ-গঠনের দায়িত্ব পালন করবে, দেশের সেবা করবে। একথা আমাদের মধ্যে একজনও মুহূর্তের তরে ভুলে যান নি যে, ব্যক্তির চেয়ে কংগ্রেস বড়, কংগ্রেসের চেয়ে দেশ বড়।"

চার ভাই নীচে নেমে এসে মন্ত্রীদের প্রস্থান দেখছিল। মন্ত্রীরা বিদায় নিলে তারাও যে-যার কাজে বার হ'ল। অম্বিকাপ্রসাদ

গায়ে খদ্দরের কুর্তা চাপিয়ে মুখে পান গুঁজে পথে নিষ্ক্রান্ত হ'ল। ফাটকের কাছে ড্রাইভার নানক সিং প্রশ্ন করল, "গাড়ি চাই হুজুর ?"

অম্বিকাপ্রসাদ বলল, "না, চাই নে।"

কিছু দূরে গিয়ে সে সাইকেল রিক্‌শা থামিয়ে চেপে বসল।

শ্যামাপ্রসাদের নিজস্ব গাড়ি আছে। গাড়িতে বসবার আগে একবার সে তিওয়ারীর খোঁজ করল। শুনল, সে কোথায় কোন্‌ জরুরী কাজে গেছে, কখন ফিরবে ঠিক নেই। অন্দরে গিয়ে তিওয়ারীর নামে এক চিরকুট লিখে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের খাস বেয়ারার হাতে দিল।

"বড় জরুরী। তিওয়ারীজী এলেই তাঁর হাতে দেবে।"

"বহুৎ আচ্ছা, হুজুর।"

"পিতাজী এখন আহারে বসবেন ?"

"খাস মহলে খেতে যাবেন, হুজুর।"

"এখানে ব'সে খাবেন না, ঘরে গিয়ে খাবেন ?"

"জী, হুজুর।"

শ্যামাপ্রসাদ অবাক্ হ'ল।

গাড়িতে ষ্টার্ট দেবার সময় নজর পড়ল চন্দ্রপ্রসাদের দিকে। সে সিঁড়ি বেয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের খাস দপ্তরে যাচ্ছে।

মুচ্‌কি হেসে আপন মনে শ্যামাপ্রসাদ বলল, "কোলের ছেলে।"

সূর্যপ্রসাদ এমন স্থান বেছে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, ফাটকে মন্ত্রীদের বিদায় দিয়ে ফিরবার সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাকে দেখতে পান। এই সঙ্কটে বাপের আস্থাভাজন, নিকট-বন্ধু হবার বড় ইচ্ছে তার। সে চায় পিতার জন্যে কিছু করতে, সংগ্রামে অন্ততঃ ছোট সেনাপতির ভূমিকা পেতে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাকে দেখলেন। চিন্তিত মুখের একটি রেখাও বদলাল না। মন্থর পদক্ষেপে তিনি দপ্তর-বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললেন।

সূর্যপ্রসাদ তাঁকে ডাকতে গেল। গলায় স্বর বেরুল না।
তাঁর দিকে এগোতে গেল। পা সরল না।
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দপ্তর-ঘরে পৌঁছলে সূর্যপ্রসাদ হাঁকল: "নানক সিং!"
নানক সিং কাছে এসে দাড়াতে:
"আমাকে একটু পৌঁছে দিতে পারবে?"
"নিশ্চয়, হুজুর।"
"পিতাজীর গাড়ি দরকার আছে?"
"এখন দরকার নেই, হুজুর।"
"তবে চল।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজের ঘরে ঢোকবার সময় দেখলেন; দরজায় দাঁড়িয়ে চন্দ্রপ্রসাদ।
মুখে হাসি খেলল।
"কি রাজকুমার? খবর কি?"
"আপনাকে একটু দেখতে এলাম, পিতাজী।"
"দেখতে এলে? এস। বস।"
"জয়ের কতটুকু বাকী, পিতাজী?"
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে বললেন, "অনেক।"
"বিশ্বাস হয় না, পিতাজী।"
"তোমার ধারণা, আমি জিতে গেছি?"
"আমি আপনাকে একটু চিনি, পিতাজী।"
"চন্দ্রপ্রসাদ, তোমার বাজারে দেনা কত?"
"এক পয়সাও নয়।"
"দোকানদাররা কত পাবে তোমার কাছে?"
"এক পয়সাও নয়, পিতাজী। আমার সব বিল্ আপনার নামে।"
আবার হেসে ফেললেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
"একটা কাজ করবে।"

"বলুন।"

"দোকানদারের সব টাকা আজই শোধ দিয়ে দেবে।"

"নিশ্চয়।"

"কত চাই ?"

"শ'খানেক হলেই যথেষ্ট। হাতে কিছু থাকবে।"

"তিওয়ারীকে ব'লো টাকার কথা।"

"বলব।"

"তারপর, তুমি কিছু করবে ? না, এমনি করেই কাটবে ?"

"একটা প্রকল্প মাথায় এসেছে, পিতাজী"

"কিসের প্রকল্প ?"

"মন্ত্রীপুত্রদের নিয়ে একটা সোসাইটি করব। নাম দেব, টাইগার্স ক্লাব। মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র হিসেবে আমি হব তার সভাপতি।"

"টাইগার্স ক্লাব ? কেন ? মন্ত্রী-পুত্রদের দিয়ে দেশের কি কোনও কাজ হবে ?"

"পিতাজী, দেশের কাজ ছাড়া কি আর কোনও কাজ নেই ? আমি জীবনে দেশের কাজ করব না। যদি কখনও কিছু করি, নিজের কাজ করব। ভাল থাকব, খাব, পরব, আনন্দ করব।"

"মন্ত্রীপুত্রদের একজোট হবার কারণটা ত বললে না।"

"পিতাজী, আমাদের মত অত্যাচারিত, উৎপীড়িত আর কেউ নেই। দেখুন না কেন আমাদের অবস্থাটা একটু ভেবে ? মন্ত্রীপুত্র হবার অপরাধ আমাদের নয়, মন্ত্রীদের। মন্ত্রী হবার আগে কোনও পিতা পুত্রদের মতামত চেয়েছেন, আজ পর্যন্ত শোনা যায় নি। মন্ত্রী-পুত্র ব'লে আমাদের যে স্বকীয় কোনও মান-মর্যাদা আছে, যোগ্যতা আছে তা কেউ স্বীকার করে না। আমাদের যা-কিছু সব পিতার গৌরবের ম্লান ছায়া মাত্র। দুর্গাভাইজীর পুত্র সবটুকু যোগ্যতা সত্ত্বেও উদয়াচলে চাকরি করতে ভয় পায়, কারণ তার বাপ ভাবেন মন্ত্রীপুত্র ব'লে সবাই তাকে 'ফেভর' করবে। আমাদের

স্বতন্ত্রভাবে কিছু করবারও উপায় নেই, পিতাজী। আমরা কারুর কাছে 'ফেভর' না চাইলেও পেয়ে থাকি, তাতে আমাদের মনুষ্যত্বের অপমান হয়। 'ফেভর' না করলেও লোকে ধরে নেয় আমরা পেয়েছি, পাওয়াটাই রীতি, নিয়ম। অতএব, ভেবে দেখুন, আমাদের কি দুরবস্থা! মন্ত্রীপুত্রদের একটা ট্রেড-ইউনিয়ন না হ'লে আর উপায় নেই।"

চন্দ্রপ্রসাদের কথা কৌতুকভরে শুনছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। দিনের পর দিন বিস্বাদ রাজনীতির বিবর্ণ মাদকতায় অন্তর কেমন যেন নিজের অজ্ঞাতে হাঁপিয়ে উঠেছিল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "শীঘ্রই নিজের যোগ্যতায় ক'রে খাবার দিন তোমার আসবে, চন্দ্রপ্রসাদ।"

"মনে হয় না, পিতাজী। প্রথমতঃ, আপনি হারবেন না। মুখ্যমন্ত্রীত্বের বন্ধন থেকে আপনার মুক্তি নেই।"

"কথাটা যেন দুঃখের সঙ্গে বলছ।"

"দুঃখ? চন্দ্রপ্রসাদ ত অমানুষ, পিতাজী! তার আবার দুঃখ কিসের। দুঃখ তারও নেই, তার পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরও নেই।"

একখণ্ড কালো মেঘের ছায়া পড়ল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের গৌরবর্ণ মুখে।

একটু থেমে চন্দ্রপ্রসাদ বলল, "আর, যদি-বা আপনি হারেন, পিতাজী, তথাপি শৃঙ্খল আপনার কাটবে না।"

"অর্থাৎ—"

"আপনি মুখ্যমন্ত্রী না হয়ে রাজ্যপাল হবেন। কিংবা কেন্দ্রে আপনার মন্ত্রীত্বের তলব আসবে। কিংবা আর কিছু হবেন।"

"অর্থাৎ বনবাস আমার জীবনে নেই।"

"না, পিতাজী; সে সৌভাগ্য আপনার হবে ব'লে মনে করি না।"

"হলে তুমি খুশী হও?"

"আমার কথা ছেড়ে দিন, পিতাজী। তবে একজন নিশ্চয় খুব খুশী হন।"

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

চন্দ্রপ্রসাদ আবার বলল, "একটা কথা বুঝতে পারি নে পিতাজী। আমাদের দেশে মন্ত্রীরা অবসর নেন না কেন?"

"নতুন স্বাধীনতার দায়িত্ব যত বেশী, কর্তব্য যত বেশী, তত যোগ্য লোক নেই ব'লে।"

"নিশ্চয় তাই। কিন্তু মন মানতে চায় না।"

"কেন?"

"আপনি অবসর নিলে উদয়াচলের ক্ষতি হবে, জানি। কিন্তু তার কারণ এই নয় যে, নতুন নেতার অভাব। তার কারণ, আপনার স্থান অধিকার করবে দুবেজী বা ত্রিপাঠীজীর মত অযোগ্য লোক।"

"তাঁরা ত নতুন নেতা-ই হবেন।"

"কিন্তু তাঁরা ত নতুন নন, পিতাজী। তাঁরা পুরাতনের মধ্যে নিকৃষ্ট। নতুন মানুষ, নতুন নেতা আপনারা তৈরী করতে পারছেন না, অথবা ইচ্ছে ক'রে তৈরী হ'তে দিচ্ছেন না।"

"নতুন নেতা মানে ত তোমার ভাই সূর্যপ্রসাদ।"

"সূর্যপ্রসাদ খুব খারাপ মাল নয়, পিতাজী!"

"নতুন আদর্শবান্ কর্মক্ষম শিক্ষিত যুবক কংগ্রেসে আসছে কোথায় বল?"

"হয়ত সেও আপনাদের ব্যর্থতা। বাণীর চেয়ে দৃষ্টান্ত বড় পিতাজী।"

"তুমি এসব কথা ভাব নাকি, চন্দ্রপ্রসাদ?"

"অপরাধ নেবেন না, পিতাজী। আমাদের পাঁচ ভাই-এর মধ্যে একমাত্র একজনকে আপনি মানুষ ব'লে মনে করতেন। তাঁকে আপনি ত্যাগ করেছেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের দুই চোখের কোটরে ব্যথা জমে উঠল।

"বাকী কাউকে আপনি মানুষের মর্যাদা দেন নি, পিতাজী।

তাঁদের জীবনে দাঁড় করিয়ে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু সে পিতার কর্তব্যে, পুত্রের প্রতি অলজ্ঘনীয় স্নেহে, মানুষের সম্মানে নয়।”

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কপালে বিস্ময়ের কুঞ্চন দেখা গেল।

“ভাবছেন, পিতাজী, আমার মত অপদার্থ এত সব জানল কি ক'রে? আপনি আপনার সন্তানদের যতটা জানেন, আমি আপনাকে তার বেশী জানি।”

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ওষ্ঠাধরে বাঁকা হাসি খেলে গেল।

“বড়ে ভাইয়াকে আপনি ল' কলেজের লেক্‌চারার ক'রে দিয়েছেন, যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও। অথচ একবারও ভেবে দেখেন নি, কি ভয়ানক আত্ম-অবমাননার মধ্য দিয়ে বছরের পর বছর তিনি কাটাচ্ছেন। ক্লাসের ছাত্ররা তাঁর লেক্‌চার শোনে না, তাঁকে শুনিয়েই বলে 'মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে হ'লেই অধ্যাপনা করা যায় না।' কলেজের অধ্যাপকরা তাঁকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে; সামনা-সামনি যে অতিরিক্ত খাতির দেখায় তার মধ্যেও অসম্মানের জ্বালা। হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ করা তাঁর ইচ্ছে ছিল না, আপনিই তাঁকে জোর ক'রে অ্যাডভোকেট করেছেন। কেস যা সে পায় তাও আপনার খাতিরে, নিজের যোগ্যতায় নয়। যারা ভয়ে আপনাকে উপঢৌকন দিতে পারে না, তারা পয়সা দেয় অম্বিকা-প্রসাদ কোশলকে, বেশী লাভের ব্যবস্থা ক'রে দেয় শ্যামাপ্রসাদ কোশলের। নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি শ্রদ্ধা যদি আপনার থাকত, পিতাজী, জীবনের পদে পদে এত অসম্মান তাঁকে আপনি কুড়োতে দিতেন না।”

বিস্ময়ে স্তব্ধ হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। খানিক পরে প্রশ্ন করলেন, “এ অনুভূতি তোমার, না তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার?”

“আমার। কিন্তু পিতাজী, এটুকু আমি জানি, বড়ে ভাইয়া সুখী নন, মনে তাঁর শান্তি নেই।”

“আর শ্যামাপ্রসাদ?”

"আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান্। আপনি তাঁকে ব্যবসায়ে সরাসরি সাহায্য করেন না, কিন্তু আপনার নাম ও মর্যাদার পূর্ণ সদ্ব্যবহার সে করেছে। করেছে, যতদিন পারে করবে। ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সে আপনাকে বেশ একটু সাহায্যও করে। কিন্তু পিতাজী, কোশল বংশের সন্তান হয়ে শ্যামাপ্রসাদ যে ব্যবসা করছে, কোনমতে ধনী হবার উচ্চাকাঙ্খাকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ক'রে নিয়েছে, এ জন্যে আপনি তাকে শ্রদ্ধা করেন না, মনে মনে তাচ্ছিল্য করেন।"

"তুমি একথা বুঝলে কেমন ক'রে?"

"আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সন্তান, পিতাজী।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আস্তে বললেন, "তাই ত দেখছি।"

"সূর্যপ্রসাদের কথা ত জিজ্ঞেস করলেন না, পিতাজী?"

"কবি নি বুঝি?"

"সূর্যপ্রসাদ আপনার রাজনৈতিক বংশধর।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাসিকায় কুঞ্চন দেখা দিল।

"সত্যিই তাই, পিতাজী। দুর্গাপ্রসাদ আপনার রাজনৈতিক শত্রু। বড় ভাই ও শ্যামাপ্রসাদ রাজনীতির বাইরে। আমি ত কিছুই না। একমাত্র সূর্যপ্রসাদই কংগ্রেসের অন্যতম তরুণ নেতা। তাকে আপনি বিধান সভার সদস্য বানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে এবং কংগ্রেসী এম. এল. এ. হিসাবে উদয়াচলে সে একজন উল্লেখ-যোগ্য মানুষ।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বললেন, "তা বটে।"

"তার হয়ে একটা প্রার্থনা আছে পিতাজী।"

"প্রার্থনা?"

"তাকে একটু কাছে ডাকবেন। এ সঙ্কটে সে আপনার কাছে আসতে চায়। আপনার জন্যে কিছু একটু করতে চায়। সে চায় আপনার আস্থা, আপনার বিশ্বাস।"

"তার কোনও যোগ্যতা নেই।"

"তবু—"

"তুমি জান, সে কি করেছে?"

"জানি।"

"তবে?"

"অমন কঠিন বিচার করবেন না, পিতাজী। সূর্যপ্রসাদ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পুত্র হলেও সেই তার একমাত্র পরিচয়-পত্র নয়। আপনি হারলেও তাকে বাঁচতে হবে। বছর পরে নির্বাচন। সে যদি টিকেট না পায় তবে তার ভবিষ্যৎ কি বলুন?"

"তাই ব'লে সে আমার বিরুদ্ধে, আমাকে গোপন ক'রে দুর্গাভাইএর সঙ্গে সম্পর্ক গ'ড়ে তুলবে!"

"উপায় কি বলুন, পিতাজী? আপনি এই সংগ্রামে তাকে কাছে ডেকে আপনার পার্শ্বচর ক'রে নেন নি। আপনার কাছে সে পুত্রের প্রাপ্য দাক্ষিণ্য পেয়েছে, সহকর্মীর মর্যাদা পায় নি। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে কোনও দিন নিজেকে মানুষ ব'লে ভাবতে তার সাহস হয় নি। সে জানে, যদি আপনি হারেন, সুদর্শন দুবে তার ওপরেও প্রচণ্ড প্রতিশোধ নেবেন। যদি আপনি জেতেন, তথাপি তার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত নয়। সম্ভব হ'লে আপনি তাকে টিকেট পাইয়ে দেবেন; প্রয়োজন হ'লে আপনি তাকে বিসর্জন দেবেন। সুতরাং তার পক্ষে অন্য পথের সন্ধান করা ত অমার্জনীয় অপরাধ নয়, পিতাজী। তা ছাড়া, সূর্যপ্রসাদ দুবেজী কিংবা ত্রিপাঠীজীর কাছে যায় নি; গেছে দুর্গাভাইজীর কাছে।"

"হুঁম্। তোমাকে সে এ সব কথা কবে বলল?"

"সূর্যপ্রসাদ আমাকে কিছু বলে না, পিতাজী। তার ধারণা, আমার মাথায় আর যা থাক, বুদ্ধি নেই।"

"সে যে দুর্গাভাইয়ের কাছে যায় তুমি জানলে কি করে?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে চন্দ্রপ্রসাদ বলল, "বসন্ত বলেছে।"

কৌতুক-হাস্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ নরম হ'ল।

"বসন্ত! বসন্ত কেমন আছে? বহুদিন দেখি নি তাকে।"

"ভালই আছে, পিতাজী।"

"বি. এ. পাস করেছে?"

"এ বছর করবে।"

"তোমার সঙ্গে ভাব-সাব কেমন আজকাল?"

"মন্দ নয়, পিতাজী।"

"হুঁম্। তোমার ত চালও নেই, চুলোও নেই। বি. এ.-টা পর্যন্ত পাস করলে না।"

"বসন্তও তাই বলে, পিতাজী।"

"তা হ'লে?"

"তা ত হ'ল না, পিতাজী।"

দু'জনেই হেসে উঠলেন।

চন্দ্রপ্রসাদ বলল "একটা খবর আছে, পিতাজী।"

"ব'লে ফেল।"

"বসন্ত'র মা, অর্থাৎ দুর্গাভাইজীর ধর্মপত্নী—"

"তাঁর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে চান না!"

"সে ত পুরাণো খবর পিতাজী। এটা নতুন।"

"বল।"

"তিনি চান দুর্গাভাই মুখ্যমন্ত্রী হোন।"

"এ আকাঙ্ক্ষা আজকার নয়। প্রাচীন।"

"কিন্তু বর্তমানে অত্যন্ত প্রবল।"

"তাই নাকি?"

"এ নিয়ে প্রায় প্রতিদিন গৃহযুদ্ধ চলছে।"

"ও।"

"শুধু তাই নয়। এবার বসন্ত-জননী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমেছেন।"

"তার মানে ?"

· "তিনি দুবেজীর সঙ্গে দু'তিন বার কথাবার্তা কয়েছেন। আর—"

"আর ?"

"আপনার সেই থার্ড মিসিং ম্যানের খবর পেয়েছেন ?"

"পেয়েছি। তুমি জান তিনি কে ?"

"জানি। দুর্গাভাইজী। পত্নীর চাপে তিনি সেদিনকার রাত্রির আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। যোগ দেন নি।"

"তুমি ঠিক জান ?"

"ঠিক জানি, পিতাজী।"

"তোমার সংবাদ-সূত্র ?"

"সেটা একান্ত গোপনীয়, পিতাজী।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চিন্তামগ্ন হলেন। চন্দ্রপ্রসাদ দেখল, তাঁর কোটরগত চোখে আগুনের ঝিলিক্। প্রশস্ত কপালে চিন্তার গাঢ় কুঞ্চন। নাসিকায় প্রচ্ছন্ন জিঘাংসা। ধনুকের মত ওষ্ঠাধরে পাথর-কঠিন সংগ্রাম-অহ্বান।

ধীরে ধীরে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের চোখ কোমল হ'ল, ললাটের কুঞ্চন মিলিয়ে গেল, নাসিকা শান্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করল।

অধরোষ্ঠে হাসি ফুটল।

"বসন্ত মেয়েটি বেশ, কি বল ?"

চন্দ্রপ্রসাদ চুপ ক'রে রইল।

"তোমার তিন ভাই-এর কথা ত বললে। তোমার নিজের কথা ত বললে না ?"

চন্দ্রপ্রসাদ হাসল।

বলল, "আমার কথা ? আপনি থাকতে আমার কোনও কথা নেই, পিতাজী। লোকে জানে, আমি আপনার নষ্টপুত্র, স্পয়েল্ট চাইল্ড। আমি তাতেই খুশী।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিছু বললেন না।

চন্দ্রপ্রসাদ আবার বলল, "আপনার অনুগ্রহ এড়িয়ে উদয়াচলে বাস করা চলে না, পিতাজী। তাই মনে মনে একটা ব্যবস্থা করেছি। অনুমতি করেন ত বলতে পারি।"

"বল।"

"এয়ার ফোর্সে ভর্তি হব। শুনেছি ওখানে মুখ্যমন্ত্রীর দাপট পৌঁছয় না।"

"পৌঁছতে পারে।"

"দরকার হবে না, পিতাজী। ফ্লাইং ক্লাবে ভর্তি হয়ে বিমান চালনা আমি শিখে নিয়েছি। এয়ার ফোর্সে কমিশনের জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম। আপনার পরিচয় না দিয়ে। বিলাসপুরের ঠিকানা না দিয়ে কানপুরে এক বন্ধুর বাড়ীর ঠিকানা দিয়েছিলাম। ওখানেই ইন্টারভিউ এবং মেডিক্যাল একজামিনেশন হয়ে গেছে।"

"ও! এজন্যেই গত মাসে কানপুর গিয়েছিলে?"

"হাঁ, পিতাজী। আমার সিলেকশনও হয়ে গেছে।"

"হয়ে গেছে?"

"পরশু চিঠি পেয়েছি পিতাজী। দশদিন পরে আমাকে যোগ দিতে হবে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গম্ভীর হয়ে গেলেন। বুকের কোথায় একটা ব্যথা ক'রে উঠল।

কিন্তু অল্প সময়ের জন্যে।

তারপর খুশিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল।

"বেশ করেছ। আমার সাহায্য না নিয়েই জীবনে দাঁড়াতে পারবে তুমি।"

"শুনেছি পিতাজী, আপনি কারুর সাহায্য না নিয়েই জীবনে দাঁড়িয়েছেন।"

"আমার বাবা দেওয়ান ছিলেন। কিছু সাহায্য তিনি করেছেন বৈ কি?"

"আমার বাবা মুখ্যমন্ত্রী, পিতাজী। তাঁর কাছে আমি অনেক কিছু পেয়েছি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ন'ড়ে বসতে গিয়ে "উঃ" ক'রে উঠলেন।

চন্দ্রপ্রসাদ বলল, "আপনার পিঠের ব্যথাটা বেড়েছে, পিতাজী। একটু টিপে দেব?"

গাঢ় স্বরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "দেবে? আচ্ছা, দাও।"

চন্দ্রপ্রসাদ আস্তে আস্তে পিঠ টিপতে লাগল। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বড় ইচ্ছে হ'ল, তাকে কাছে টেনে, বুকের মধ্যে চেপে ধরেন। বুকটা যেন একেবারে খালি মনে হ'ল।

চন্দ্রপ্রসাদের চোখ জ্বলছিল। পিঠে মৃদু চাপ দিতে দিতে ভাবল, এতবড় একটা মানুষ, সারা দেশে যাঁর এত নাম, এমন যাঁর তীব্র ব্যক্তিত্ব, প্রচণ্ড শক্তি, অসীম দুঃসাহস, অনন্ত আত্মবিশ্বাস, এত বড় যাঁর প্রতাপ, মান, মর্যাদা, যশ, খ্যাতি, বুদ্ধি; তিনি কত সাধারণ, কত নরম, কত নির্জন, কি ভয়ংকর একা!

নীরবতা ভঙ্গ ক'রে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "তোমার এই এয়ার ফোর্সে যাবার ব্যাপারটা আর কেউ জানে?"

"একজন প্রথম থেকেই সব কিছু জানেন, পিতাজী।"

একটু চুপ থেকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রশ্ন করলেন, "তাঁর মত পেয়েছ?"

"তিনি আপনার মতই খুশী হয়েছেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবার চন্দ্রপ্রসাদের মাথায় হাত রাখলেন।

বললেন, "চল। ঘরে যেতে হবে খাওয়ার জন্যে। তোমার মা'র হুকুম।"

এগার

মুখোমুখি দাঁড়ালে হরিশংকর ত্রিপাঠী ও সুদর্শন দুবেকে যুগপৎ বেমানান বিসদৃশ এবং সমতুল দেখায়।

হরিশংকরের বিশাল বপু, যেমন দৈর্ঘ্য, তেমন ব্যাপ্তি। লম্বায় ছ'ফুটের বেশি, ওজনে আড়াই মণ। মেদবহুল প্রকাণ্ড দেহকাণ্ডের ওপর প্রচণ্ড মাথা; বাবড়ি চুল, সাদা-কালোর বিষম সংমিশ্রণ। চওড়া কপালে প্রতিদিন সকালে রক্ততিলক ধারণ করেন; হরিশংকর কালীর সাধক, এককালে তান্ত্রিক প্রভাবে পড়েছিলেন। রক্ততিলক কেটে যায় ললাটের গভীর রেখায়। বিশাল চোখ সর্বদা রক্তিম। মোটা ডাকসাইটে নাক; নাসারন্ধ্রে অনায়াসে ইঁদুর যাতায়াত করতে পারে (হরিশংকর রসিকতা ক'রে বলেন, তিনি সুপ্ত সিংহ, ইঁদুরও তাঁকে ভয় মানে না।)। গভীর কৃষ্ণবর্ণ জোড়া ভ্রূ, ভয়ংকর একজোড়া গোঁফের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে। সর্বদা পান-দোক্তা খাবার জন্যে দাঁতগুলো কৃষ্ণবর্ণ। প্রকাণ্ড মাংসল গালের দু'পাশে বড় বড় কান। দেহের কোনও কিছুই হরিশংকর ত্রিপাঠীর নগণ্য নয়। হাতের আঙুল, চিবুক আর কানের চুল থেকে ভুঁড়ি, বাহু, জংঘা; সবকিছু বিধাতা তাঁকে অকৃপণ ঔদার্যে বেশি ক'রে দিয়েছেন।

সুদর্শন দুবেরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে একটা অতিরিক্ত ভাব আছে। আয়তনে সুদর্শন ছোট, মাথা-ভরতি টাক: শুধু কপালের ওপর অচানক একগুচ্ছ লালচে চুল। তবু তাঁর কপাল একটু বেশি চওড়া, চোখ দু'টি একটু বেশি বড়, নাক খানিক বেশি মোটা, গাল একটু বেশি ভরা-ভরা। সুদর্শনকে দেখে সবচেয়ে যা সহজে মনে হয় তা হচ্ছে তাঁর অসাধারণ তৎপরতা। তিনি যেন চোখে-মুখে-কানে-অনুভূতিতে সব কিছু চট্‌পট্ জেনে ফেলছেন, বুঝে নিচ্ছেন। হরিশংকর ত্রিপাঠী, অপর পক্ষে, সর্বদা যেন অর্ধ-সুপ্ত; স্বয়ং মহাদেবের

এ-কাল সংস্করণ। সুদর্শন দুবে কথাবার্তায় যেমন চৌকস, হরিশংকর তেমন নিরেট। সহজে কথা বলেন না, বললেও যত কম সম্ভব, এবং ধীরে ধীরে। দেহভারে তিনি সচল হ'তে পারেন না, কিন্তু মনও যেন তাঁর মন্থরগতি। অথচ, যাঁরা হরিশংকর ত্রিপাঠীকে জানেন, তাঁদের কাছে তাঁর পরিচয় অন্য রকম। অমন মেদবহুল মহাস্থবিরতার মধ্যে, তাঁরা জানেন, লুকিয়ে রয়েছে এক অত্যন্ত চালাক, ধূর্ত, ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ মানুষ। সুদর্শন দুবের তৎপরতা বাহ্যিক; তাঁর বুদ্ধি, বিচার ও কর্মপন্থায় গভীরতা নেই। হরিশংকর বাইরে শ্লথ, কিন্তু ভেতরে ভয়ানক ক্ষিপ্র। বাইরে মৌন-প্রায়; ভেতরে তাঁর মন সর্বদা কর্মব্যস্ত।

হরিশংকর ত্রিপাঠীর রাজনৈতিক ইতিহাস বিচিত্র। উদয়াচলের যে সীমান্ত রাজস্থানের সঙ্গে, সেখানে আজমগড় নামে ছোট শহরে তাঁর জন্ম। রাজস্থানের অন্যতম দেশীয় রাজ্যে পিতা সামান্য বেতনের রাজকর্মচারী ছিল। ঠিক কি ধরনের কাজ সে করত কেউ জানত না, তবে মাঝে মাঝে তাকে রাজার তৃতীয় পুত্রের সঙ্গে গ্রামে সফরে যেতে হ'ত। সুতরাং লোকে তাঁকে তৃতীয় রাজকুমারের ব্যক্তিগত নোকর বলত। হরিশংকর যখন বালক, তখন এই নিয়ে তাঁর প্রথম বিদ্রোহ। স্কুলে সহপাঠিরা তাঁকে চাকরের ছেলে বলায় তিনি অপমানিত হয়ে রাজদরবারের এক প্রভাবশালী ব্যক্তির পুত্রের মাথায় দারুণ আঘাত করেছিলেন। তার ফলে বাপ হরিশংকরকে আজমগড়ে কাকার কাছে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হ'ল। আজমগড়ে হরিশংকর স্কুলে যত না বিকশিত হলেন তার চেয়ে অনেক বেশি স্কুলের বাইরে। আজমগড়ে অভ্রখনি ছিল অনেকগুলি; স্কুলের অনতিদূরে ছিল খনির কর্মচারী মজদুরদের বস্তি। হরিশংকর সে বস্তির অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। তখন তাঁর চেহারা ছিল আকর্ষণীয়। যেমন দীর্ঘ, তেমন মজবুত। স্কুল থেকে পাস ক'রে হরিশংকর যখন

আজমগড় ছাড়লেন তখন দেখা গেল বস্তির একটি সুন্দরী কন্যাও নিখোঁজ।

এই কন্যাটি সুন্দরী হ'লেও অব্রাহ্মণ ছিল। হরিশংকর তাকে নিয়ে আহমেদাবাদ চলে গেলেন। এক কাপড়ের কলে মজদুর-সর্দারের কাজ জুটে গেল। হরিশংকরের কর্মজীবন আরম্ভ হ'ল। কাপড় ও সূতাকলের যাবতীয় হাল-চাল তিনি বুঝে নিলেন। বছর-তিনেক পরে তাঁর পত্নী অথবা সহচরী আত্মহত্যা করল।

হরিশংকরের জীবনে প্রথম রাজনীতির সুযোগ এল। তখন গান্ধীজীর ডাকে আহমেদাবাদের শ্রমিকেরা সাড়া দিতে শুরু করেছে। ১৯৩১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় কাপড়ের কলে বিক্ষোভ দেখা গেল। মজদুর-সর্দার হরিশংকর ত্রিপাঠী মজদুর-নেতা হয়ে উঠলেন। যে কলের তিনি কর্মচারী সেখানে একদিন হরতাল লেগে গেল। গান্ধীটুপি ও খদ্দরে সুশোভিত হয়ে হরিশংকর মজদুরদের নেতৃত্ব করলেন। সে-নেতৃত্বে তাঁর কৃতিত্ব সহজে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

হরিশংকর ত্রিপাঠী কংগ্রেসের অন্যতম শ্রমিক-নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত হরিশংকর ত্রিপাঠী শ্রমিক-নেতা। তিনি মালিকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন বার বার, কিন্তু তাঁদের শত্রু হয়ে নয়, প্রকৃত মিত্র হয়ে। শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ যে পরস্পর-বিরোধী, এ মতবাদে হরিশংকর ত্রিপাঠী কদাচ বিশ্বাস করেন নি। মালিক না হ'লে শিল্প গড়বে না—শ্রমিক না হ'লে শিল্প চলবে না; সুতরাং মালিক ও শ্রমিককে একত্র, পারস্পরিক সহযোগিতায়, আদর্শ পরিস্থিতিতে শিল্পায়ন সম্ভব করতে হবে। মালিক হবে আদর্শ মালিক, শ্রমিক আদর্শ শ্রমিক। মালিক লভ্যাংশের যতটা সম্ভব শ্রমিকের কল্যাণে বিনিয়োগ করবে; শ্রমিক মালিককে দেবে দেহের ঘাম, অন্তরের আনুগত্য, মস্তিষ্কের বুদ্ধি। এই হ'ল হরিশংকর ত্রিপাঠীর শ্রমিক-দর্শন।

শ্রমিক-নেতা হিসেবে তিনি আজীবন বিবাদ-কলহ আপোষে মেটাবার চেষ্টা ক'রে এসেছেন। হরতাল হ'লেও তিনি কোশিস করেছেন মালিকের স্বার্থ যথাসম্ভব রক্ষা করে, শ্রমিকের দাবি যতটুকু সম্ভব মিটিয়ে, আপোষ করবার। বহুক্ষেত্রে এ প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। যেখানে হয় নি, হরিশংকর ত্রিপাঠী দোষ দিয়েছেন সে-সব তথাকথিত বামপন্থী নেতাদের, যাঁদের উদ্দেশ্য কেবল সমাজ ধ্বংস করা, গ'ড়ে তোলা নয়; যাঁরা বিপ্লবের সস্তা হুজুগ বাধিয়ে দিয়ে আসলে শ্রমিকের সর্বনাশের রাস্তা তৈরীতে ব্যস্ত।

উদয়াচলে শিল্প-প্রসার অবিস্তর হ'লেও হরিশংকর ত্রিপাঠী এখানকার প্রধানতম শ্রমিক-নেতা। উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ সালে তিনি বিলাসপুরে স্থায়ী নিবাস তৈরী করেন। পেছনে খানিক ইতিহাস আছে।

যে-অব্রাহ্মণ কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে তরুণ হরিশংকর একদা আজমগড় থেকে আহমেদাবাদ পালিয়েছিলেন, শাস্ত্রমতে তাকে তিনি বিবাহ করেন নি। সে-কন্যার মৃত্যুর পর হরিশংকর সম্ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। মজদুরদের সর্দারী করতে গিয়ে স্ত্রীলোকের কোনওদিন অভাব হয় নি।

পরে যখন মজদুর-সর্দার থেকে মজদুর নেতা হ'লেন, যখন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা গ্রহণ ক'রে তাঁর যশ, সম্মান, প্রতিপত্তি বাড়ল, তখন সমাজের যে-শ্রেণীতে তাঁর জন্মগত অধিকার সেখানে স্থিত হবার প্রয়োজন বুঝলেন। আহমেদাবাদে তাঁর যে-পরিচয় তাতে এ ধরনের স্থিতি অর্জন করা সহজ হ'ল না।

কিন্তু সুযোগ এল বিলাসপুরে। উদয়াচলের অন্যতম মাঝারি জমিদার অযোধ্যাপ্রসাদ মিশ্রের সঙ্গে হরিশঙ্কর ত্রিপাঠীর পরিচয় ছিল। অযোধ্যাপ্রসাদ কেবল জমিদার ছিলেন না, দু'টি অভ্রখনির মালিকও ছিলেন। বহুদিনের অযত্নে অভ্রখনি দুটির অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, অযোধ্যাপ্রসাদ চাইলেন তাদের উন্নতি সাধন করতে।

হরিশংকর ত্রিপাঠীর এ-বিষয়ে খানিকটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। আহমেদাবাদে একদিন দু'জনে এ নিয়ে কথাবার্তা হ'ল। হরিশংকর চাইলেন অভ্রখনিকে আধুনিককালের মাপকাঠিতে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলতে। অযোধ্যাপ্রসাদ রাজী হলেন।

তাঁর অভ্রখনির ম্যানেজার হয়ে হরিশংকর এলেন বিলাসপুরে। তাঁর ব্যবস্থাপনায় খনির কাজ দ্রুত অগ্রসর হ'তে লাগল। অযোধ্যাপ্রসাদের সঙ্গে হরিশংকরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। বিলাসপুরে এসে হরিশংকর কাপড়ের কলের মজদুর সভার সভাপতি হলেন। অভ্রখনির ম্যানেজারীর সঙ্গে তাঁর এই নতুন দায়িত্বের সংঘর্ষ বাধল না। অভ্রখনির ম্যানেজারী করতে গিয়ে হরিশংকর মজদুরদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রেখেছিলেন; তাতে মজদুর-মহলে তাঁর সুনাম হয়েছিল। কাপড়ের কলের কর্তৃপক্ষও তাঁকে মজদুর সভার সভাপতি পেয়ে খুশীই হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক মজদুর সভার এক বাৎসরিক অধিবেশনে অন্যতম ভারতীয় সদস্য হিসেবে হরিশংকর ত্রিপাঠী যখন প্রথম য়ুরোপ গেলেন তার বিদেশ ভ্রমণ সার্থক করবার জন্য মিলের কর্তৃপক্ষ যৎকিঞ্চিৎ-সাহায্য করা স্বার্থবিরোধী মনে করেন নি।

অযোধ্যাপ্রসাদের তৃতীয় কন্যা কমলাদেবীর সঙ্গে হরিশংকর ত্রিপাঠীর বিবাহ হয়েছিল। কমলার চেহারায়, শিক্ষায়, ব্যক্তিত্বে উল্লেখযোগ্য ছিল না কিছুই। রং কালো, মোটা, একটি চোখ ভয়ানক টেরা। সামনের তিনটি দাঁত নীচের ঠোঁট চেপে বেরিয়ে এসেছে। স্কুলের নীচু ক্লাস পেরিয়ে সে ওঠে নি, ওঠবার দরকারও ছিল না। তাকে বিবাহ করতে হরিশংকরের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নি। বিবাহ-দ্বারা তিনি সামাজিক প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। তাঁর ওপর কমলার দাবিও ছিল সামান্য। কর্মব্যস্ত জীবনে হরিশংকর গৃহবাসী হবার সুযোগ কম পেতেন; ইচ্ছেও তেমন ছিল না। নারীসঙ্গ-সুখে তাঁর লোভ এবং তৎপরতা অগোপন ছিল না।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হরিশংকর ত্রিপাঠীর চেহারার ভয়ঙ্কর পরিবর্তন হয়েছিল। বিপুল মেদাধিক্য তার প্রধান কারণ। চিরদিন তিনি স্বল্পভাষী; রাজনীতিতে ঢোকবার পরেও একান্ত প্রয়োজন না হ'লে বক্তৃতা করতেন না। বিশ্বস্ত পার্শ্বচরদের কয়েকজন সুবক্তা ছিলেন, তাঁরাই হরিশংকরের মতামতের চৌকস মুখপাত্র।

হরিশংকরের মেধা ছিল নেপথ্যে দর-কষাকষিতে, ইংরেজীতে যাকে বলে নেগোশিয়েসন। অপর পক্ষের কলাকৌশল বুঝে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতায় তিনি সহজে নিজের কর্মপন্থাকে সফল ক'রে তুলতে পারতেন। কোন্ সময় কি কারণে মজহুর আন্দোলন শুরু করা উচিত; কি ভাবে হরতাল সংগঠন করলে না-জিতলেও না-হারার বিপদ এড়ানো যায়; হরতাল কি ভাবে সংকটের সম্মুখীন হয় এবং সে সংকট-ত্রাণের উপায় কি, কি উপায়ে হরতালের সর্বোচ্চ উত্তেজনার মধ্যেও মালিকদের সঙ্গে সংগোপনে কথাবার্তা চালাতে হয়, মজহুর-হরতালে অন্য রাজনৈতিক দলের অনুপ্রবেশ কেমন ক'রে রুখতে হয়, হরতাল বেসামাল হ'লে কি ভাবে অবস্থা সামলে নেওয়া যায়—এ সব সূক্ষ্ম, কঠিন, ক্ষুরধার পথে হরিশংকরের মেধা বিদ্যুতের মত জ্বলন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ ক'রে যেত। অথচ তাঁর মেদভার জর্জরিত থমথমে মুখের পানে তাকিয়ে মন হ'ত না এমন তীক্ষ্ণ কৌশলজ্ঞানের তিনি অধিকারী।

মজহুর-নেতা হিসেবে উদয়াচলে, এমন কি ভারতবর্ষে, হরিশংকরের কিছুটা বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্তত তিনি তাই মনে করতেন। যে-সব শিক্ষিত "ভদ্রলোকেরা" কংগ্রেসের নেতৃত্ব করতেন, তাঁদের হরিশংকর দেখতেন খানিকটা ঈর্ষা, কিছুটা অপরিচয়ের ভয় এবং অনেকখানি অহংকৃত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-অর্জিত জ্ঞান-বিদ্যা তাঁর ছিল না, তাই অতি-শিক্ষিত নেতাদের তিনি মনে মনে ঈর্ষা করতেন। কিন্তু স্ব-ক্ষেত্রে স্বোপার্জিত নেতৃত্ব তাঁকে কঠিন আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল; তিনি জানতেন

"ভদ্রলোক" নেতাদের যা নেই, তাঁর আছে ; শ্রমিক-সংযোগ, শ্রমিক-সমর্থন। আসল নেতা ত আমি, আমরা—হরিশংকর ভাবতেন, বিশ্বাস করতেন, কখনও-সখনও বলেও বসতেন। "ভদ্রলোকেরা" ভদ্র রাজনীতি অভদ্র ভাবে করে থাকে ; অভদ্র রাজনীতিকে ভদ্রতার সম্মান দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। কংগ্রেস আবালবৃদ্ধবনিতার প্রতিনিধি হ'লেও আসলে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের সংগঠন ; তার যেটুকু শিকড় মজদুর ও চাষীর জীবনে প্রসারিত, সে কেবল আমাদের জন্যে। কংগ্রেস যখন রাজত্ব করবে তখন আমাদের বাদ দিয়ে তার একদিনও চলবে না।

এ আত্মবিশ্বাস ছিল ব'লে হরিশংকর ত্রিপাঠী কংগ্রেসের দলীয় রাজনীতিতে কখনও খুব একটা জেঁকে বসবার চেষ্টা করেন নি। নাদুস-নুদুস উকিল-অধ্যাপক-পত্রকারদের রাজনীতি তাঁর কাছে কেমন জলীয় মনে হ'ত। উদয়াচল কংগ্রেসের এক্‌জিকিউটিভ কমিটির মেম্বার তিনি ছিলেন ; তার চেয়ে বড় ভূমিকার প্রয়োজন বোধ করেন নি। আন্দোলনের সময়ও তিনি মজদুরদের নিয়ে আলাদা আয়োজন করেছেন। যেমন, গান্ধীজীর "এক-ব্যক্তি সত্যাগ্রহের" সময় তিনি তিনশত মজদুরকে পর পর একে একে কারাবরণ করিয়েছিলেন ; উদয়াচলের কংগ্রেস দপ্তর সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশজনের বেশি একক সত্যাগ্রহী জোগাড় করতে পারেন নি। যে-তিনবার হরিশংকর ত্রিপাঠী নিজে জেলে গেছেন, তাও কংগ্রেসী নেতা হিসেবে ঠিক নয়, কংগ্রেসী মজদুর-নেতা হিসেবে।

স্বাধীনতার পর উদয়াচলে যখন কংগ্রেসী রাজত্বের সূচনা হ'ল, তার উদ্যোগ-পর্বে হরিশংকর ত্রিপাঠীর খুব বড় ভূমিকা ছিল না। আগষ্ট আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। উদয়াচলে এ আন্দোলন যতটুকু দানা বেধেছিল তার বেশির ভাগ কৃতিত্ব হরিশংকর ত্রিপাঠীর। বিলাসপুরের দু'টি কাপড়ের কলেই হরতাল হয়েছিল ; মালিকরা নিজেরাই কল এক মাস বন্ধ রেখেছিলেন। হরিশংকর

নিজে সাবেকী কংগ্রেসী কায়দায় কারাবরণ করলেও তাঁর পাঁচজন অনুচর 'আণ্ডার-গ্রাউণ্ড' হয়েছিল; তাদের নেতৃত্বে তিনশ' লেটার বক্স, চুয়াত্তরটি টেলিগ্রাফ পোল, তিন মাইল লম্বা টেলিগ্রাফ তার বিনষ্ট হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, ইংরেজ যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের বাসনা সুস্পষ্ট ঘোষণা করল, তখন হরিশংকর মিল-মালিকদের রাজী করালেন আগষ্ট আন্দোলনের সময় এক মাস লক-আউটের পুরো বেতন মজতুরদের দিয়ে দেবার। এ নিয়ে একটি মর্মস্পর্শী অনুষ্ঠান হয়েছিল বিলাসপুরে, যার প্রধান নায়কত্বে জনৈক দেশনেতা আমন্ত্রিত হ'লেও আসল গৌরব ছিল হরিশংকরের।

ভারতবর্ষের ইতিহাস তখন নতুন পথে পা বাড়াবার জন্যে তৈরী। ইংরেজ-বিদায় আসন্ন। সে অনুষ্ঠানে হরিশংকর একটি বিরল ভাষণ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "দেশের মুক্তি আসন্ন। মুক্তির চেহারা দেখে আমরা অনেকেই আতংকিত। হয়ত দেশ বিভক্ত হবে। এমন অনেক কিছু ঘটবে যা আমরা চাই নি, চাই নে! তবু বিদেশী শাসক বিদায় নেবে, ভারত স্বাধীন হবে। এবার শুরু হবে নতুন ভারত গড়বার অভিনব উদ্যোগ। এ উদ্যোগের নেতৃত্ব করবে কংগ্রেস। এ তার বহু বছরের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার। নেতারা আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ভারতবর্ষের শ্রমিক খাঁটি দেশপ্রেমিক। তাঁর দেশপ্রেমে ভেজাল নেই।

"নেতাদের আমরা একটি কথা নিবেদন করতে চাই। শ্রমিকদের বাদ দিয়ে স্বাধীন ভারত গড়া সম্ভব নয়। কংগ্রেসের যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ তা কার্যকরী করতে পারে কেবল শ্রমিকরা। আমাদের বিনীত নিবেদন, আমরা শ্রমিকরা স্বাধীন ভারত তৈরীর মহান প্রচেষ্টার পূর্ণ অংশীদার হ'তে চাই। হ'তে পারার মত ক্ষমতা আমাদের আছে। উৎপাদনের পুরোহিত ত আমরাই। কিন্তু, গান্ধীজীর ভারতবর্ষে, আমরা শ্রেণী-সংঘাতের পথ স্বেচ্ছায়,

সজ্ঞানে ত্যাগ করেছি। আমরা চাই শ্রেণী-সহযোগিতার পথ: সে সহযোগিতা আসবে যদি আমাদের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়।”

মন্ত্রীসভা গঠন পর্বের প্রারম্ভে হরিশংকর ত্রিপাঠী তাঁর ভাষণ নতুন ক'রে ছাপিয়ে দেশের সর্বত্র প্রচার করেছিলেন।

তাঁর লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নি। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের মন্ত্রীসভায় হরিশংকর ত্রিপাঠী স্থান পেয়েছিলেন। এজন্যে কোনও তদ্বির করতে হয় নি। চাইতে হয় নি। স্থান তাঁর জন্যে যেন নির্দিষ্টই ছিল। হরিশংকর ত্রিপাঠী জানতেন, দুর্গাভাই তাঁকে মন্ত্রীত্ব দিতে যতই না আপত্তি করুন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁর জন্যে আসন রাখবেনই।

মন্ত্রীসভায় আসন পাওয়া তখন হরিশংকর ত্রিপাঠীর দরকার ছিল।

একটা গোলমেলে ব্যাপারে জড়িয়ে গিয়েছিলেন হরিশংকর ত্রিপাঠী। এ ব্যাপারে জড়িত ছিল একটি রূপসী মুসলমাল যুবতী। ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত পৌঁছেছিল। অস্তাচলগামী ইংরেজ শাসনের গোধূলি অধ্যায়েও বিলাসপুরে এমন একজন উচ্চপদস্থ মুসলমান রাজকর্মচারী ছিলেন, যাঁর হাত থেকে হরিশংকর ত্রিপাঠী রেহাই পান নি। অবশ্য তিনি জানতেন যে, আদালতে তাঁর দোষ বা অপরাধ প্রমাণিত হবে না। তথাপি আদালতে এসব ব্যাপার আসা মানে অসম্মান্। রাজনৈতিক প্রতিপত্তির মূলে কুঠারাঘাত। ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন উৎসবের সপ্তাহ খানেক আগে হরিশংকর ত্রিপাঠী সংকল্প করলেন মন্ত্রীসভায় ঢুকতে হবে। ভারতের পরাধীনতার সঙ্গে তাঁর জীবনের কলঙ্কও তা হ'লে যাবে অতীতের অন্ধকারে। স্বাধীনতার অরুণোদয়ে নতুন জীবনে আলোকিত ভারতবর্ষে হরিশংকর ত্রিপাঠী মজদুর ভাইদের অগ্রগতি ও কল্যাণের মহান্ আদর্শে নব উদ্দীপনায়, পূর্ণ উদ্যমে, অপরাজেয় উৎসর্গে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন।

হরিশংকর ত্রিপাঠী জানতেন হাই কমাণ্ডের নির্দেশ মন্ত্রীসভায়

যতদূর সম্ভব মজত্বর, কৃষাণ ও তপশিলী সম্প্রদায় এবং প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতাদের স্থান দিতে হবে। উদয়াচলের কংগ্রেসে মজত্বর নেতাদের অগ্রণী হরিশংকর। তাঁকে মন্ত্রীসভায় স্থান দিতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে আগ্রহ দেখাবেন এ বিষয়ে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ।

সন্দেহের সত্যি কোনও কারণ ছিল না। কেবল ত্বর্গাভাই একবার নিস্তেজ আপত্তি করেছিলেন।

"হরিশংকর ত্রিপাঠী আসলে লেবর লীডর নন," বলেছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে। "তাঁর হাত পরিষ্কার নয়।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসেছিলেন: "ত্রিপাঠীজীকে আমি বিলক্ষণ জানি। আপনি যা বলছেন, সত্যি। তবু তাঁকে মন্ত্রীসভায় নিতে হবে।"

"কেন?"

"উদয়াচল কংগ্রেসে একমাত্র হরিশংকর ত্রিপাঠীই মজত্বর নেতা ব'লে পরিচিত। তিনি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্যতম নেতা। আন্তর্জাতিক লেবর কনফারেন্সে একবার ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন।"

"তিনি কি মন্ত্রীত্ব চান?"

"হরিশংকর অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। মন্ত্রীত্বের প্রকাশ্য উমেদার তিনি নন। হালে তিনবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। মন্ত্রীসভা গঠন নিয়ে একটি প্রশ্নও করেন নি।"

"তা হ'লে বোধ হয় তিনি চান না।"

"ওটা তাঁর কর্মকৌশল, ষ্ট্র্যাটেজি। তিনি নিমন্ত্রণের অপেক্ষায় রয়েছেন। জানেন, তাঁকে আমি ডাকবই।"

"ডাকতেই হবে?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ত্বর্গাভাইকে একখানি পত্র দেখালেন। দিন চারেক আগে দিল্লী থেকে এসেছে।

এই কথোপকথনের পরের দিন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সাদর আহ্বানে হরিশংকর ত্রিপাঠী তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হলেন।

আধ ঘণ্টা দু'জনে কথাবার্তা হ'ল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের প্রথম মন্ত্রীসভায় হরিশংকর ত্রিপাঠী যোগ দিতে রাজী হলেন।

দপ্তর নিয়ে প্রথম থেকেই মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেছিলেন, "আপনি উদয়াচলের প্রধান শ্রমিক নেতা। শ্রম-মন্ত্রীত্ব আপনাকে দেব।"

হরিশংকর ত্রিপাঠী বলেছিলেন, "তাতে আমার বিশেষ কিছু শ্রম হবে না। উদয়াচলে শিল্প বলতে যা আছে তা সামান্য। শ্রম-মন্ত্রীর করণীয় কিছু থাকবে না।"

"শিল্প বাড়বে। শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।"

"আপনি আমার কর্মক্ষমতা বেশ ভালই জানেন। আজ প্রায় পঁচিশ বছর আমি শিল্পের সঙ্গে জড়িত। আহমেদাবাদের এমন কোনো কারখানা নেই যা আমি সম্যক্ জানি নে। উদয়াচলেও খনিজ শিল্পের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আপনার অজানা নয়। আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতা নিয়ে এ প্রদেশের বিরাট অব্যবহৃত খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে বেশ কিছু কাজকর্ম আমি করছি। যদি আমাকে আপনি শিল্প ও খনিজ সম্পদের দায়িত্ব দেন, উদয়াচলের আর্থিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনে আমি সবটুকু শক্তি বিনিয়োগ করব।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "আপনার কর্মক্ষমতায় অথবা শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; কিন্তু ত্রিপাঠীজী, মন্ত্রীসভা গঠন, দেখতে পাচ্ছি, বড় এক ইমারত তৈরীর চেয়ে অনেক কঠিন। ধরুন, আপনি একটি মহল তৈরী করছেন। আপনার লক্ষ্য দু'টি: ব্যবহারিক উপযোগিতা এবং চারুশিল্পের সৌন্দর্য। আপনি দুয়ের সুঠাম সামঞ্জস্য ঘটিয়ে প্ল্যান তৈরী করলেন; সে-প্ল্যান কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেলে আপনি তাতে ইঁট-সিমেণ্ট-লোহা-রংএর অবয়ব দিতে লেগে গেলেন। মন্ত্রী-সভা নির্মাণে হাত লাগাবার আগে আমারও তেমনি বাসনা ছিল।

ত্রিপাঠীজী, আপনি জানেন, আমার এক-আধটু সাহিত্য-প্রবণতা আছে। না, না, বড় কবি আমি নই, আমি তুলসীদাস নই, টেগোর নই, কালিদাস ত নই-ই ; তবু অবিনয় মাপ করবেন, আমার কিছুটা কবি-যশ আছে। মন্ত্রীসভা গঠনের কাজ আমি রাজনৈতিক মনের সঙ্গে খানিকটা শিল্পীমন নিয়েও শুরু করেছিলাম। ভেবেছিলাম, উদয়াচলের মত অনগ্রসর প্রদেশের ভাগ্য-নির্মাণ যখন বিধাতার রহস্যময় খেয়ালে আমার মত অযোগ্যের হাতে এসে পড়ল, তখন, আমার সবটুকু সুবুদ্ধি নিয়োগ ক'রে, আপনাদের মত সুদক্ষ নেতাদের সাহায্যে এমন এক মন্ত্রীসভা গঠন করব যা এ প্রদেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও অগ্রগতি সাধন করতে পারবে। ভেবেছিলাম, দল-উপদল গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠী গানব না, যেখানে যোগ্যতম ব্যক্তি আছেন, হাতে-পায়ে ধরে বেঁধে আনব ; মন্ত্রীসভায় এমন কেউ থাকবেন না যিনি উদয়াচলে স্বক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত নন।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব'লে চললেন, "কিন্তু রাজনীতি এমন কঠিন ব্যাপার, ত্রিপাঠীজী, যে আমার স্বপ্ন বুঝি আর সার্থক হ'ল না। রামায়ণের একটি শ্লোক মনে পড়ছে, সেই কুম্ভকর্ণের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধের বর্ণনা। যে-সকল শরে রামচন্দ্র সপ্ততালভেদ এবং বালিবধ করেছিলেন, কুম্ভকর্ণ তা বেমালুম হজম ক'রে বসলেন। যুদ্ধের একসময় কুম্ভকর্ণ ছিন্নবাহু, ছিন্নপদ হয়ে রামচন্দ্রের দিকে বড়বার ন্যায় মুখব্যাদান ক'রে ধাবমান হলেন। বাল্মিকী তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "রাহুর্যথা চন্দ্রমিয়ান্তরীক্ষে"—রাহু যেমন আকাশে চন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ। রাজনীতির রাহু আমার স্বপ্ন-চন্দ্রমাকেও তেমনি গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে—আমি ত শ্রীরামচন্দ্র নই, তাকে আটকাবার সাধ্য আমার নেই। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীসভা যা দাঁড়াবে তা অনেকখানি রাজনৈতিক বাস্তব, সামান্য স্বপ্ন। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। দর-কষাকষির যেন আর শেষ নেই। আপনাকে বলতে কি—আপনি ত আমাদের

মত দলীয় নেতা-উপনেতা নন, শ্রমিক-আন্দোলনে আপনার নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত—একমাত্র দুর্গাভাই ছাড়া এমন একজন নেতাও উদয়াচলে নেই, যিনি মন্ত্রীসভায় বিনাসর্তে, বিনা দরাদরিতে যোগ দিতে এগিয়ে এসেছেন।”

হরিশংকর ত্রিপাঠী বললেন, “আপনি ভাববেন না আমি দরাদরি করছি।”

“ভাবলে আপনাকে এমন মন খুলে সব বলতাম না, ত্রিপাঠীজী। আমি জানি, আপনি উদয়াচলের কল্যাণ ও উন্নতি ছাড়া আর কিছু কামনা করেন না। শিল্প-দপ্তরের দায়িত্ব আপনাকে দেবার কথা, খোলাখুলি বলছি, আমি ভাবি নি। কিন্তু খনিজ সম্পদের ভার আপনাকে দেব, এ ইচ্ছে আমার ছিল, এখনও আছে। পেরে উঠব কি না জানি নে, খুব একটা ভরসাও রাখি নে এখন। তবু, এটুকু আমার তৃপ্তি যে, শ্রম-দপ্তরের দায়িত্ব এমন হাতে দিতে পারব যা অজ্ঞানতা, অনভিজ্ঞতায় পঙ্গু নয়। তা ছাড়া, ত্রিপাঠীজী, কংগ্রেসে আমাদের মত ভদ্রলোকদের স্থান আর কতদিন? দেশের অগণিত জনসাধারণ যারা মেহনত করে মাঠে, কারখানায়, বন্দরে—তারা অদূর ভবিষ্যতে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, সে দায়িত্ব তাদের হয়ে বহন করবেন আপনাদের মত আসল জননেতারা।”

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কথায় সেদিন হরিশংকর ত্রিপাঠীর মন গলে গিয়েছিল। এ লোকটির ক্ষমতাই শুধু নেই, বিনয় আছে, রসবোধ আছে, দূরদৃষ্টি আছে—তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দলীয়-উপদলীয় নেতাদের দর-কষাকষির এমন করুণ ছবি ইনি এঁকেছিলেন যে হরিশংকর দপ্তর-দাবিতে জোর দিতে পারেন নি। মন্ত্রীসভার তালিকা-প্রচারিত হবার আগের দিন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল তাঁকে একটি সুন্দর পত্র পাঠিয়েছিলেন। তাতে ছিল মন্ত্রীত্ব গ্রহণে সম্মতি দেবার জন্যে বিনীত ধন্যবাদ, হরিশংকরের নেতৃত্বে উদয়াচলের শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে গভীর আস্থা, এবং শ্রম-দপ্তরের

অতিরিক্ত কোনও দায়িত্ব তাঁকে দিতে না পারার জন্যে দুঃখপ্রকাশ। সেই সঙ্গে আশ্বাস যে, ক্যাবিনেটের কয়েকটি সাব-কমিটি গঠন ক'রে বিভিন্ন সরকারী কাজকর্ম ঠিকভাবে পরিচালনার প্রকল্পে ত্রিপাঠীজীর সর্বজনস্বীকৃত কর্মক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার পূর্ণ সুযোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রী দ্বিধা করবেন না।

সে আজ অনেক বছর আগের কথা। মন্ত্রীসভার সদস্য হয়ে হরিশংকর ত্রিপাঠী বুঝতে পেরেছিলেন শ্রম-মন্ত্রীর করণীয় বড় কিছু নেই, বিশেষত উদয়াচলের মত শিল্পে অনগ্রসর প্রদেশে।

তথাপি শ্রমিকদের জন্যে কিছু কিছু কাজ তিনি করতে পেরে-ছিলেন। শ্রমিক-মালিকে বিবাদ তিনি বড় একটা ঘটতে দেন নি। শ্রমিকদের দেন নি এমন কিছু দাবি করতে যা মালিকরা মেটাতে পারবেন না, বা চাইবেন না। ছোট-খাট দাবি মালিকদের দিয়ে তিনি গ্রহণ করাতে পেরেছেন। শ্রমিকদের জন্যে রাজকীয় বীমা, কর্মের সময় বেঁধে দেওয়া, ওভার-টাইম—সবেতন ছুটি, চিকিৎসার প্রাথমিক ব্যবস্থা ইত্যাদি কিছু কিছু শ্রমিক-কল্যাণ তিনি সাধন করেছিলেন।

সবচেয়ে বড় কথা, উদয়াচলে সংঘবদ্ধ শ্রমিকসমাজে বামপন্থী দলগুলিকে তিনি আধিপত্য করতে দেন নি। য়ুনিয়নগুলি সবই জাতীয় ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের কর্তৃত্বাধীন রেখেছেন। বামপন্থী য়ুনিয়ন একটিও মালিকদের স্বীকৃতি পায় নি। শ্রমিক-য়ুনিয়ন থেকে বেছে বেছে একটি একান্ত ব্যক্তিগত অনুচর-দল হরিশংকর ত্রিপাঠী তৈরী করেছিলেন। দুষ্ট লোকেরা তাই তাঁকে উদয়াচলের গুণ্ডারাজ বলত। এ অনুচররা হরিশংকর ত্রিপাঠীর জন্যে না করতে পারত এমন কিছু নেই। অন্য দলের মিটিং ভেঙ্গে দেওয়া, য়ুনিয়ন নির্বাচনের সময় ভোট সংগ্রহ, বিপক্ষ দলকে সব রকমে নাস্তানাবুদ ইত্যাদি শ্রমিক-সমাজ অন্তর্গত কাজই শুধু নয়, হরিশংকরের ক্রম-বর্ধমান রাজনৈতিক উচ্চাশার উপযোগী পথ তৈরী করায় যাবতীয় সাহায্যও।

দুর্গাভাই একাধিকবার কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে এ নিয়ে নালিশ জানিয়েছেন।

"কোশলজী, আপনার শ্রম-মন্ত্রী কিন্তু বেশ একটি প্রাইভেট আর্মি তৈরী করে নিচ্ছেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেছেন, "তাই ত শুনছি।"

"এর বিপদটা ভেবে দেখেছেন?"

"বর্তমানে কোনও বিপদ দেখছি না, তবে ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে।"

"আমি আপনার মত নিরুদ্বেগ নই। হরিশংকর যত রাজ্যের গুণ্ডাকে এনে কংগ্রেসের সভ্য বানাচ্ছেন।"

"গুণ্ডারা সভ্য হ'লে ত ভালই।"

"এটা পরিহাসের ব্যাপার নয়, কোশলজী। এতে একদিন কংগ্রেসের এমন বিপদ হবে, এমন বদনাম হবে যে, আপনি ভাবতেও পারছেন না।"

"দুর্গাভাইজী, কংগ্রেস সংবিধানে এমন কিছু নিয়ম-কানুন নেই যাতে আপনি যাদের গুণ্ডা বলছেন তাদের সভ্য হওয়া বন্ধ করা যায়। তা ছাড়া, এ ব্যাপারটা প্রাদেশিক কংগ্রেসের লক্ষণীয়, সরকারের নয়। হরিশংকরের অনুচররা কোনও বেআইনী কাজ করছে ব'লে আমার জানা নেই।"

"আজ করছে না। একদিন করবে।"

"সেদিন আমারাও ঘুমিয়ে থাকব না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একেবারেই ঘুমিয়ে থাকেন নি। হরিশংকর ত্রিপাঠীর যাবতীয় কাজকর্মের খবর তিনি রাখতেন। জানতেন, হরিশংকরের "প্রাইভেট আর্মি"তে প্রায় তিনশত সন্দেহজনক চরিত্র স্থান পেয়েছে। এরা যা করত তা ন্যায়-নীতির দিক্ থেকে আপত্তি-জনক হ'লেও আইনের সীমানার বাইরে যেত না। হরিশংকর

শ্রমিকদের মধ্যে বিপজ্জনক রাজনীতি বা ভাবধারা প্রবেশ করতে দেন নি. তাতে উদয়াচলের মঙ্গলই সাধিত হয়েছে। মালিকরা সরকারের সঙ্গে প্রায় সব বিষয়ে সহযোগিতা ক'রে এসেছে ; কোনও বড় হাঙ্গামায় উদয়াচলে শিল্প-শান্তিও ব্যাহত হয় নি। মোট কথা হরিশংকরের সঙ্গে বিবাদের কোনও কারণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেশ ক'বছর খুঁজে পান নি। যে-সব নৈতিক প্রশ্ন দুর্গাভাইএর কাছে বড় মনে হ'ত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাদের খুব একটা দাম দিতেন না। দুর্গাভাই শ্রদ্ধেয় ; কিন্তু তাঁর আদর্শবাদ বাস্তব-রাজনীতির বাজারে পুরাতন টাকার মত, খাঁটি রূপা হ'লেও অচল।

মন্ত্রীসভার তৃতীয় বছরে এক দুর্ঘটনা ঘটল যার ফলে হরিশংকর ত্রিপাঠীর সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের প্রথম রাজনৈতিক ক্ষমতার মুখোমুখি পরিমাপ হ'ল।

পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষের অনেক স্থানে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল। উদয়াচলেও আগুন লাগল।

আগুন লাগল প্রথম কাপড়ের কলে শ্রমিক বস্তিতে। ছড়িয়ে পড়ল বেশ কয়েকটি শহরে। দেখা গেল, এ আগুনের পেছনে রয়েছে হরিশংকর ত্রিপাঠীর 'পাইভেট আর্মি।' হরিশংকর কয়েক-দিনের মধ্যে উদয়াচলের 'বিপন্ন হিন্দুদের সবচেয়ে সক্রিয় রক্ষকের গৌরবে অভিনন্দিত হলেন।

দুর্গাভাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে বললেন, "হরিশংকর ত্রিপাঠী গুণ্ডাদের দিয়ে মুসলমান-দের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। হঠাৎ তিনি হিন্দু-নেতা হয়ে উঠেছেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উষ্ণ হয়ে বললেন, "এসব দুষ্ট লোকের প্রচার। মুসলমান নেতারা দাঙ্গা বাঁধিয়েছে, প্রথম আক্রমণ হয়েছে হিন্দুদের ওপর। হিন্দুরা যদি নিজেদের রক্ষা করতে চায়, তাদের দোষ দিতে হবে ?"

"এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হরিশংকর ত্রিপাঠীর ভূমিকা আপনি ভাল ক'রে জানেন?"

"নিশ্চয় জানি। জানা আমার উচিত।"

"তা হ'লে আমার কিছু বলার নেই। আইন ও শৃঙ্খলা রাখবার দায়িত্ব আপনার।"

হরিশংকর ত্রিপাঠীর ভূমিকা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভালই জানতেন।

তিনি শ্রম-মন্ত্রীকে পরামর্শের জন্যে আহ্বান করলেন।

"ত্রিপাঠীজী, আপনার কার্যের প্রশংসা আমি করতে পারি না, নিন্দা করতেও চাই নে। এখন, আমাদের প্রধান কর্তব্য হ'ল সাম্প্রদায়িক আগুন নেভানো। যা ঘটেছে তা নিয়ে হৈ-চৈ করা বৃথা।"

"মজত্বরা ক্ষেপে গিয়েছে। তারা রক্তের বদলে রক্ত চায়। প্রাণের বদলে প্রাণ।"

"আপনি তাদের শান্ত করুন।"

"আমার অন্যায় দাবি তারা মানবে কেন?"

"ত্রিপাঠীজী, এখন গোলগাল বাৎচিতের সময় নেই। অবস্থা গুরুতর। যদি দাঙ্গা ত্ব'দিনে বন্ধ না হয়, আমাকে সৈন্যবাহিনীর সাহায্য চাইতে হবে। তাতে বিপদ অনেক। সৈন্যরা গুলী চালাবে, লোক মরবে। পুলিসের গুলিতে দশ জনের মৃত্যু হয়েছে, একশ' বারো জন আহত হয়েছে।"

"এতে আমি কি করতে পারি?"

"আপনি এ হাঙ্গামা বন্ধ করতে পারেন।"

"কি করে?"

"আপনার অনুচরদের দিয়ে।"

"তারা ভয়ংকর উত্তেজিত। আমরা সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে মুসলমানদের ভয়ানক প্রশ্রয় দিই। প্রশ্রয় দিয়েছি ব'লেই ভারত আজ দ্বিখণ্ডিত। পাকিস্তান ইচ্ছেমত আমাদের আভ্যন্তরীণ শান্তি

ভেঙ্গে দিতে পারে। এ দাঙ্গা কারা বাধিয়েছে আপনার জানা আছে। প্রায় সপ্তাহকাল আপনি তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত কঠোর ব্যবস্থা করেন নি। আর্মড পুলিসের হাতে শান্তিরক্ষার ভার দিতে এত সময় আপনার কেন লাগল আমার বুদ্ধির বাইরে। আপনি দুর্গাভাইজীর পরামর্শে অহিংসা দিয়ে হিংসার আগুন নেভাতে চেয়েছিলেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব আপনার। উদয়াচলের লোকেরা আপনাকে 'লোহার মানুষ' ব'লে থাকে। অথচ এ সংকটে আপনি যে দুর্বলতা দেখিয়েছেন তাতে আমরা শুধু দুঃখ পাই নি, অবাক হয়েছি।"

"আপনি আর কে কে?"

"তাঁদের কথা তাঁরা বলবেন। আমি নিজের কথা বলছি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "ত্রিপাঠীজী, লোকে আমাকে শক্ত মানুষ বলে ঠিকই। তারা আমার কতটুকুই বা জানে। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, আপনিও। চৌদ্দ পুরুষ আমরা অহিংস—অন্তত মানুষের রক্ত আমরা পাত করি নি। আমি স্বীকার করছি, পুলিসকে গুলী চালাবার হুকুম দিতে আমার মন ওঠে না। এক কালে পুলিসের গুলী দেশের লোক বুক পেতে নিয়েছে, সে ক্ষত এখনও পুরো শুকোয় নি। মুখ্যমন্ত্রী হবার পর ক্ষমতা নামক বস্তুটিকে আমার বড় রহস্যময় মনে হ'ত। ভাবতাম, আমরা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছি, অথচ দেশ স্বাধীন হবার পরে যে বিরাট দায়িত্ব আমাদের কাঁধে চাপবে তার জন্যে তৈরী হই নি। আজ আমার মত এক অতি সাধারণ মানুষের হাতে বিধাতা এ কি অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন? এ ক্ষমতা বহন করবার যোগ্যতা আমার কতটুকু? সৃষ্টি ও বিনাশের ক্ষমতা দিয়ে ঈশ্বর আমাকে এক ছোটখাট বিধাতা বানিয়েছেন! মনে পড়ছে, ত্রিপাঠীজী, প্রথম যেবার আই. জি. এসে প্রয়োজনমত গুলী চালাবার অনুমতি চাইলেন, সেদিনকার কথা। ধাঙড়দের নিয়ে একটা গোলমাল

চলছিল। লালা মুনসীরামের ধাঙড় বস্তি—আপনার মনে পড়বে। বস্তি সাফ ক'রে মুনসীরাম ভাড়া দেবার জন্যে ফ্ল্যাট-বাড়ী তৈরী করবে, ধাঙড়রা বস্তি ছাড়বে না। গোলমাল শেষে দাঙ্গায় পরিণত হ'ল। আমাদেব মন্ত্রীসভায় যিনি তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, তাকে ধাঙড়রা হাঁকিয়ে দিল। দুষ্ট লোকেরা হঠাৎ একদিন কিছু দোকানপাট লুট ক'রে বসল—কেউ কেউ আমায় বলল, তারা আপনারই লোক, যদিও আমি তাদের কথায় কান দিই নি। বিলাসপুরে সেদিন নতুন এক স্কুল উদ্বোধন ছিল, আমায় বক্তৃতা দিতে হ'ল। বেশ জোর দিয়েই বললাম, 'আমরা হিংসা, রক্তপাত, হত্যা চাই নে, আমাদের হাত গান্ধীজীর মন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু শাসনভার যখন জনগণ আমাদের এ হাতে ন্যস্ত করেছেন, শান্তি ও শৃঙ্খলা আমাকে রক্ষা করতেই হবে। দরকার হ'লে যে-হাতে আমরা চরকা কেটেছি, সে হাতে বন্দুক ধরব। যারা অশান্তি, হিংসা, বিদ্বেষ বাধিয়ে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত করতে বদ্ধপরিকর তাদের আমি সতর্ক করছি। দেশের স্বার্থের জন্যে রক্তপাত দরকার হ'লে, আমাদের হাত টলবে না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মৃদু হেসে ব'লে চললেন, "বাইরের দৃষ্টিতে দেখলে ঘটনাটা কিঞ্চিৎ হাস্যকর। জীবনে আমি কোনওদিন বন্দুক ধরি নি। অথচ এক বিরাট বন্দুকধারী পুলিসবাহিনী আমার আজ্ঞাধীন। কোন্‌টা কোন্ জাতের রাইফেল আমি জানি নে। অথচ আমি 'সেনাপতি'। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আই. জি. এসে বলল, স্যর, বন্দুক ছাড়া অবস্থা আয়ত্তে আনা যাবে না। আপনি আজ যা বলেছেন তা অতি সত্যি কথা। আদেশ দিন, দরকার মত আমরা বন্দুক চালাব। আদেশ না দিয়ে উপায় ছিল না। দাঙ্গাকারীদের হাতে ডজন খানেক পুলিস জোর জখম হয়েছিল, একজন এস. আই, মাথা ফেটে হাসপাতালে। আদেশ দিতে হ'ল। কিন্তু সে কি ভীষণ অশান্তি! সারারাত ঘুম হ'ল না। পরের দিন আই. জি-কে

বললাম, গুলী না চালিয়ে পারলে হুকুম দেবেন না। প্রথম প্রথম ফাঁকা আওয়াজ করবেন। গুলী করলেও, দেখবেন, কেউ যেন প্রাণে না মরে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনায় তা হ'ল না। ধাঙড়রা পুলিসদের আক্রমণ করল, পুলিস গুলী চালাল, চারটে ধাঙড়েব মৃত্যু হ'ল। নেপথ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের অবস্থাটা লোকের অগোচরেই রয়ে গেল।"

হরিশংকর ত্রিপাঠী বললেন, "স্বাধীন ভারতে পুলিসের গুলী কম চলছে না, কোশলজী।"

"চলছে। চলবার দরকার হচ্ছে। কিন্তু আমি উদয়াচলে পুলিস ও সৈন্যের রাজত্ব একদিনের জন্যেও চালাতে চাই নে। ভারতবর্ষে উদয়াচলের মান-সম্মান তা হ'লে আর থাকবে না। আমাদের গর্ব করবার বিশেষ কিছু নেই। শিল্পে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে গর্ব করবার আমাদের কিছু নেই। আমাদের গর্ব শুধু শান্তি ও সম্প্রীতিতে। এ বছর দিল্লীতে রাজ্যপালদের বাৎসরিক সভায় উদয়াচলকে দেশে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ প্রদেশ ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তানে ও ভারতে কতবার ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হ'ল, কিন্তু উদয়াচলে এর আগে এ-আগুন লাগে নি। ত্রিপাঠীজী যদি এ আগুনের পেছনে আপনার অনুচরদের উস্কানি থাকে, আপনি আমার বুকে বড় আঘাত করেছেন, আমার মাথা হেঁট ক'রে দিয়েছেন।"

"এ মিথ্যা প্রচার আপনি বিশ্বাস করেন?"

"না, করি না। তবে জানি, এ দাঙ্গা আপনি বন্ধ করতে পারেন। এবং সে অনুরোধই আপনাকে করছি।"

হরিশংকর ত্রিপাঠী দাঙ্গা বন্ধ করেছিলেন।

তিন মাস পরে মন্ত্রীসভার বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য শ্রীরাম চৌহানের মৃত্যু হ'ল। নতুন মন্ত্রী নিয়োগ ও দপ্তর পুনর্বণ্টনের সুযোগে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হরিশংকর ত্রিপাঠীকে শিল্প-মন্ত্রী করলেন।

দুর্গাভাইকে তিনি বোঝালেন, "শ্রমিকদের ওপর হরিশংকর ত্রিপাঠীর প্রভাব কমাতে হবে। তাঁর 'প্রাইভেট আর্মি' ভেঙ্গে দেওয়া দরকার হ'য়ে পড়েছে।"

হরিশংকর যা চেয়েছিলেন, পেলেন। কিন্তু যে-ভাবে চেয়েছিলেন, সে-ভাবে পেলেন না।

বার

হরিশংকর ত্রিপাঠী শিল্পমন্ত্রী হবার কিছু পরেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁর পাখা কেটে দিলেন।

রাজনীতিতে বাইরের লড়াই সবাকার চোখে পড়ে। দলে দলে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, নীতিতে নীতিতে লড়াই। সে-লড়াই যখন সংবিধান-অনুমোদিত খোলা রাজপথে সবাকার দৃষ্টির সামনে ঘটে, তাকে বলা হয় গণতন্ত্র। তন্ত্র যাই হোক, বাইরের লড়াই ছাড়া রাজনীতি নেই।

যা লোকচক্ষুর বাইরে তা হ'ল রাজনীতির গোপন সংঘাত। ঠাণ্ডা লড়াই। ক্ষমতার উত্তাপে রাজনীতির গর্ভদেশ সর্বদা জ্বলে; সেখানে সহকর্মীদের মধ্যে রেষারেষি, দুই আপাত-সমভাবীর মধ্যেও ভাবনা ও উচ্চাশার সংঘষ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাজনীতির এদিক বেশ ভাল জানেন; শীতল সংঘাতে হাত তাঁর পাকা। হরিশংকর ত্রিপাঠীর সঙ্গে তাঁর মনের বা মতের মিল ছিল না। নিজেকে তিনি কখনও বিদ্বান্ উচ্চশিক্ষিত ভেবে অহংকার করতেন না, বড় বড় কিতাব পড়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতিতে যাঁরা পারদর্শী, তাঁদের দলে ছিলেন না কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। কিন্তু হরিশংকর ত্রিপাঠী যে স্কুলের পরে কলেজের মুখ দেখেননি এজন্যে তাঁকে তিনি কিছুটা তাচ্ছিল্য করতেন।

শ্রমিক-নেতৃত্ব ব্যাপারটা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে কখনও হাস্যকর, কখনও মেকি চাল মনে হ'ত। সমাজবাদী বা সাম্যবাদীরা শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে রাজনীতির হাতিয়ার রূপে কাজে লাগাবে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তা বুঝতে পারতেন। তারা শ্রেণী-সংগ্রামে কম বেশি বিশ্বাসী; সমাজের চতুবর্ণ নিয়ে যে-সংগঠন, তার এক বর্ণের সবাধিপত্য তাদের লক্ষ্য।

কিন্তু কংগ্রেস ত শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাস করে না! কংগ্রেস চায় চতুর্বর্ণের যুগপৎ সর্বোদয়; তার কাছে মালিক ও শ্রমিক, জমিদার ও চাষী, দুই কণ্ঠ-পাকড়ি-ধরিছে-আকড়ি শত্রু নয়।

গান্ধীজী ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম প্রজা-বিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কৃষাণ সভা গঠন করে তার নেতা হয়ে বসেন নি। বল্লভভাই প্যাটেল 'সর্দার' খ্যাতি পেয়েছিলেন মজদুরদের সংঘবদ্ধ সংগ্রামে জয়লাভ করিয়ে: তিনিই সত্যিকার ভারতের প্রথম শ্রমিকনেতা; অথচ, কই, তিনি ত পরিণত রাজনৈতিক জীবনে শ্রমিকনেতার ভগ্ন ভূমিকা গ্রহণ করেন নি! অতএব, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিশ্বাস করতেন, কংগ্রেসে থেকে শ্রমিক-নেতা, কৃষাণ-নেতা, মালিক নেতা, জমিদার-নেতা হওয়া অবাঞ্ছনীয়, বেআইনী।

তা ছাড়া হরিশংকর ত্রিপাঠীর শ্রমিক-নেতৃত্বের গোপন তথ্য তাঁর জানা ছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বলিষ্ঠ চরিত্র ভেজাল পছন্দ করত না। দুর্গাভাইএর গান্ধীপন্থী আদর্শবাদ তিনি শ্রদ্ধা করতেন। মন্ত্রীসভায় এমন চার-পাঁচজন সহকর্মী ছিলেন, কর্মক্ষমতা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব পরিমিত হ'লেও, তাঁদের মধ্যে ভেজাল ছিল না। কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন তাঁদের স্নেহ করতেন, কিছুটা শ্রদ্ধাও। শ্রদ্ধা তাঁর একেবারে ছিল না মাধব দেশপাণ্ডের মত ভীরু স্বার্থান্বেষীর প্রতি অথবা হরিশংকর ত্রিপাঠীর মত (তাঁর মতে) ভেজাল শ্রমিক-নেতাকে।

মনুষ্যচরিত্রের রহস্য ঘাটতে হ'ত কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে প্রতিদিন। তাঁর নিজের মধ্যেও তিনি রহস্য খুঁজে বেড়াতেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আত্মচেতনা ছিল রাজনৈতিক নেতার নয়, শিল্পীর। প্রদীপকে তিনি পাদদেশের অন্ধকারটুকু নিয়েই গ্রহণ করতেন। দেবতার পায়ে যে কাদা লেগে রয়েছে এ জ্ঞানটুকু তিনি কদাচ হারাতেন না। রাজনীতি করতে গিয়ে যতটা সম্ভব রসিক মন বাচিয়ে রাখতেন; তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে একটি গোপন কৌতুক-হাস্য সর্বদা

চিক্ চিক্ করত। তিনি জানতেন রাজনীতির খেলা খেলতে গিয়ে তাঁকে অনেক ভেজাল ব্যবহার করতে হচ্ছে। এ প্রয়োগ অনেক সময় তিনি কৌতুকবোধ নিয়ে করতেন। জানতেন, ক্ষমতার তপ্ত-স্বাদ তাঁর প্রিয়, পাওয়ারের মাদকতা রূপসী রমণীর কাঞ্চন যৌবনের মত নেশাপ্রদ। স্ত্রীলোকের নেশা কাটে, ক্ষমতার মাদকতা কাটতে চায় না। জানতেন, এ মাদকতা ব'য়ে বেড়াবার উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব উদয়াচলে একমাত্র তাঁরই আছে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিষ্কলুষ ছিল না; রাজনীতি করতে গিয়ে নিজের সন্তানদের ভবিষ্যৎকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। কিন্তু তাঁর নীতিবোধ বর্ণ-পরিচয়ের সদা-সত্য-কথা-বলিবে, না-বলিয়া-পরদ্রব্যে-হাত-দিও-না-র নিস্তেজ সীমানায় বন্দী ছিল না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিশ্বাস করতেন, জীবনের নীতিবোধ দু'রকম, দুর্বলের ও সবলের। যে দুর্বল তার নীতিবোধ হওয়া উচিত শান্ত, শিষ্ট, সদাচার-আশ্রিত। যে সবল, যে স্রষ্টা, সে তার নিজের নীতি-মালার রচয়িতা। সিসিল রোডস্ দুর্নীতি করেছিলেন, আবার তেমনি পূর্ব-আফ্রিকায় ইংরেজের সাম্রাজ্যও স্থাপন করেছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কার্লাইলের কথায় সায় দিয়ে বলতেন, জীবনে চলতে গিয়ে শেষপর্যন্ত একটা প্রশ্ন বড় হয়ে দাঁড়ায়—হোয়েদার ইউ ওয়াণ্ট টু বি এ হিরো অর এ কাওয়ার্ড। তুমি বীর হ'তে চাও, না ভীরু?

হরিশংকর ত্রিপাঠীর রাজনৈতিক পাখা কাটতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মিছরি-ছুরি ব্যবহার করলেন।

একদিন ডেকে পাঠালেন ত্রিপাঠীজীকে জরুরী পরামর্শের জন্যে।

দুজনে একত্র হয়ে দু'চার দশটা সাধারণ কথাবার্তার পর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আসল বিষয়ের অবতারণা করলেন।

মন্ত্রীদের মধ্যে কিছু কিছু দপ্তরের পুনঃ বণ্টন প্রয়োজন হয়েছে। কয়েকটি দপ্তরের পরিচালনায় তিনি সুখী বা সন্তুষ্ট নন। কোন

কোন মন্ত্রীর সুদক্ষতার প্রমাণ পেয়ে তিনি তাঁদের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতে মনস্থির করেছেন। তাঁর নিজের দপ্তর-ভারও কিঞ্চিৎ লাঘব করা প্রয়োজন।

হরিশংকর ত্রিপাঠী বললেন, "আপনার এ সংকল্প প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই। আশা করি শ্রমিক-দপ্তর পরিচালনা আপনাকে কোনওরূপে হতাশ করে নি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিবেদন করলেন. "বরঞ্চ উল্টো, ত্রিপাঠীজী। আপনার সুদক্ষ নেতৃত্ব দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছি। মন্ত্রীসভা গঠনের সময় আপনি অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ দপ্তর চেয়েছিলেন। অকপটে স্বীকার করছি, তখন আপনাকে আমি পুরো বিশ্বাস করতে পারি নি। না, না, মানুষ হিসাবে, কংগ্রেসের নিরলস কর্মী হিসাবে আপনাকে আমি চিরদিন শ্রদ্ধা করে এসেছি। কিন্তু মন্ত্রীত্বে আপনি কতখানি যোগ্যতা দেখাতে পারবেন, আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। তা ছাড়া, যাঁরা আপনাকে আমার চেয়ে তখন বেশি জানতেন, অর্থাৎ আপনার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাদেব কেউ কেউ—নাম বলতে অনুরোধ করবেন না—আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আজ অবশ্য আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ ক'বছর সেভাবে আপনি শ্রমিক-দপ্তরের নেতৃত্ব ক'রে এসেছেন, তাতে আপনার যোগ্যতার প্রচুর প্রমাণ আমি পেয়েছি। সুতরাং আপনাকে আমি অন্য কোনও দপ্তরের দায়িত্ব দিতে চাই।"

বিগলিত হরিশংকর জোড় হাতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নমস্কার করলেন।

বললেন, "কোশলজী, কারা আপনার কানে আমার সম্বন্ধে কুৎসা রটিয়েছে আমি জানি নে। কিন্তু আমি কায়মনোবাক্যে আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। আজ যদি আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে আপনি নিঃসন্দেহ হয়ে থাকেন, সে আপনার গৌরব। শুধু এটুকু বলতে চাই, যে দায়িত্বই আমাকে দেন না কেন, আমি

যথাসাধ্য পালন করব। এবং, আমাকে বিশ্বাস করে আপনি কদাচ ঠক্‌বেন না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে বললেন, "সে আমি জানি, হরিশংকরজী।"

কিঞ্চিৎ ইতস্তত ক'রে হরিশংকর প্রশ্ন করলেন, "কোন্‌ দপ্তরের ভার আমার ওপর ন্যস্ত হবে জানতে পারি কি?"

"এখনও তা আপনাকে সঠিক বলতে পারব না, ত্রিপাঠীজী। একাধিক দপ্তরের কথা আমি ভাবছি। কিন্তু পুনঃ বণ্টনের ব্যাপারে একসঙ্গে অনেক কথা বিচার করতে হচ্ছে। যে দপ্তরের ভারই আপনাকে দি' না কেন, বর্তমানের চেয়ে আপনার দায়িত্ব অনেক বেড়ে যাবে।"

এই কথাবার্তার এক সপ্তাহ পরে মন্ত্রীসভার দপ্তর পুনর্বণ্টিত হয়েছিল। হরিশংকর হয়েছিলেন শিল্পমন্ত্রী। নিজের একান্ত বিশ্বাস-ভাজন নিরঞ্জন পরিহারকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিয়েছিলেন শ্রমিক দপ্তরের দায়িত্ব।

হরিশংকর ত্রিপাঠী প্রথমে বেশ খুশি হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, তাঁর নিজস্ব শ্রমিক-দলের সাহায্যে শিল্পপতিদের সঙ্গে এক নতুন ধরনের সম্পর্ক তিনি স্থাপন করতে পারবেন। ভেবেছিলেন, প্রাদেশিক শ্রমিক কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে মালিকদের কাছে তিনি অসামান্য খাতির পাবেন; শ্রমিক ও মালিকদের সহ-যোগিতার নতুন পথের হবেন দিগ্‌দর্শক।

বছর খানেকের মধ্যে এ স্বপ্ন তাঁর ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

প্রথম ধাক্কা এল মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। শাসনযন্ত্রকে উন্নত করবার জন্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রস্তাব করলেন মন্ত্রীদের কেউ কংগ্রেসের সংগঠন-ক্ষেত্রে নেতৃত্ব-পদে বহাল থাকবেন না। হাই কমাণ্ড প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। হরিশংকর ত্রিপাঠীকে প্রাদেশিক জাতীয়

মজদুর কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইস্তফা দিতে হ'ল। শুধু তাই নয়, নিরঞ্জন পরিহার, সুকৌশলে যাঁকে এ পদে বহাল করলেন তাঁর সঙ্গে হরিশংকরের প্রাচীন ব্যক্তিগত বৈরিতা।

কিছুদিনের মধ্যে বিলাসপুরের কাপড়ের কলে ধর্মঘট বাধল। দেখা গেল, নিরঞ্জন পরিহারের শ্রমিক-নীতি অন্যপথ ধরেছে। তিনি শ্রমিকদের অধিকাংশ দাবি সমর্থন করলেন। মালিকরা ভূতপূর্ব মন্ত্রীর নীতি আঁকড়ে ধ'রে শ্রমিকদের কাছে হরিশংকর ত্রিপাঠীর মানমর্যাদা অনেকখানি কমিয়ে দিলেন। নিরঞ্জন পরিহার মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ণ সমর্থন নিয়ে শ্রমিক-মালিক বিবাদ মেটাবার জন্যে এ্যাডজুডিকেটর নিযুক্ত করলেন। শ্রমিকরা পেল অনেককিছু। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রভাব বেড়ে গেল তাদের মধ্যে। এ্যাডজুডিকেটরের আদালতে নিরঞ্জন পরিহারের উৎসাহ পেয়ে শ্রমিকদের মুখপাত্ররা এমন অনেক কিছু গোপন তথ্য প্রকাশ ক'রে দিল, যাতে সাধারণ শ্রমিকদের জানতে বাকী রইল না যে, হরিশংকর ত্রিপাঠী আসলে তাদের চেয়ে মালিকদের স্বার্থকেই বেশি রক্ষা ক'রে এসেছেন।

হরিশংকর ত্রিপাঠীর রাজনৈতিক জীবনে শ্রমিকনেতার ভূমিকায় যবনিকা পড়ল।

এই নাটকীয় ঘটনার বৎসরাধিক পরে উদয়াচলের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে একটি নারীর আবির্ভাব হ'ল। তার নাম সরোজিনী সহায়। হরিশংকর ত্রিপাঠী যে শ্রমিক-নেতৃত্ব চিরদিনের জন্যে ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, যে নেতৃত্ব গ্রহণ করবার যোগ্যতা নিরঞ্জন পরিহারের ছিল না, যার মূল্য বা প্রয়োজন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল তখনও অনুভব করেন নি, সে-নেতৃত্ব হঠাৎ দখল ক'রে বসল সরোজিনী সহায়। পরবর্তীকালে দেখা গেল সরোজিনী সহায় উদয়াচলের রাজনীতিতে দিকভ্রষ্ট উর্বশী।

হরিশংকর ত্রিপাঠী ও সুদর্শন দুবে একসঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের

বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখ্যমন্ত্রীপদে পুনর্নির্বাচনের বিরোধিতা করছিলেন।

সুদর্শন দুবের উচ্চাশা মুখ্যমন্ত্রীত্ব নিজের আয়ত্তে আনা। কিন্তু হরিশংকরের সঙ্গে হাত মেলাতে গিয়ে তিনি এ উচ্চাশা সাময়িকভাবে হজম করতে প্রস্তুত ছিলেন। ত্রিপাঠীজীকে তিনি বুঝিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী হবার যোগ্যতা তাঁরই সবচেয়ে বেশি।

চন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে নিজের খাস দপ্তরঘরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যখন কথা বলছিলেন, তখন মধ্যাহ্ন আহারের অবসরে হরিশংকর ত্রিপাঠীর বাড়ীতে একটি রাজনৈতিক চক্রের বৈঠক বসেছিল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হরিশংকর, সুদর্শন দুবে, মহেন্দ্র বাজপাঈ, প্রজাপতি শেউড়ে এবং আরও চারজন কংগ্রেসী নেতা, যাঁদের সহযোগিতায় সুদর্শন দুবে অনেকখানি নির্ভর করছিলেন।

সুদর্শন দুবে বলছিলেন, "হাই কমাণ্ড থেকে আজ পরিষ্কার নির্দেশ আসবার কথা। আমরা চাইছি, হাই কমাণ্ড নির্দেশ দিন কোশলজী মুখ্যমন্ত্রীত্বের জন্যে দাঁড়াতে পারবেন না। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের যে স্মারকলিপি পাঠান হয়েছে সে বিষয়ে আমরা হাই কমাণ্ডের অভিমত চেয়েছি।"

প্রজাপতি শেউড়ে বললেন, "নিরঞ্জন পরিহারেব দিল্লী মিশন সম্বন্ধে পাকা খবর পেয়েছেন?"

সুদর্শন জবাব দিলেন, "যা জানতে পেরেছি তাতে হাই কমাণ্ডের মনোভাব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।"

প্রজাপতি শেউড়ে পকেট থেকে একখানি পত্র বার করলেন। বললেন, "এই চিঠি গতকাল দিল্লী থেকে এসেছে। রমেশ পাতিলের চিঠি। লিখেছে, আমাদের অভিযোগে হাই কমাণ্ড খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ কবছেন না। তা ছাড়া, কোশলজীর অনুপস্থিতিতে উদয়াচলে স্থায়ী ও বলিষ্ঠ মন্ত্রীসভা গঠন সম্ভব কি না সে বিষয়েও হাই কমাণ্ডের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

সুদর্শন দুবে বললেন, "এ সন্দেহ দূর করতে হবে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ছাড়াও উদয়াচলে কংগ্রেসী শাসন চলবে, বরং আরও ভালভাবে চলবে. হাই কমাণ্ডকে তা বোঝাতে হবে।"

মহেন্দ্র বাজপাঈ মন্তব্য করলেন, "আপনি ত বোঝাবার চেষ্টা কম করেন নি। কিন্তু বড় কর্তারা বুঝছেন কই?"

উত্তেজিত কণ্ঠে সুদর্শন দুবে বললেন, "যদি না বুঝে থাকেন, সে দায়িত্ব আপনাদের। আপনারা আমার সঙ্গে একমন নিয়ে দাঁড়াচ্ছেন না।"

এমন কঠিন অভিযোগের হরিশংকর ত্রিপাঠী ছাড়া সবাই প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন।

সুদর্শন দুবে ব'লে চললেন, "আপনাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি সত্যিকারের মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। কোশলজীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও আপনারা তলে তলে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আসছেন। যদি আমি হারি, আপনাদের যাতে অন্তত মন্ত্রীত্বটুকু থাকে।"

এমন সময় চাকর এসে খবর দিল মাধব দেশপাণ্ডের উপস্থিতির।

মাধব দেশপাণ্ডে ঘরে ঢুকে দেখলেন আহার্য-সামগ্রী অর্ধভুক্ত প'ড়ে আছে, ঘরময় থমথমে গাম্ভীর্য।

বিব্রত হয়ে দেশপাণ্ডে বললেন, "অবস্থা বুঝি আশাপ্রদ নয়?"

সুদর্শন দুবে শুধু বললেন, "বসুন।"

মাধব দেশপাণ্ডে আসন গ্রহণ করলে হরিশংকর ত্রিপাঠী প্রথম কথা বললেন।

"কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল সহজ প্রতিপক্ষ নন। একবার হারলেও দ্বিতীয়বার তিনি হারতে চাইবেন না। সুদর্শন ভায়া, আপনি বোধ করি যথেষ্ট তৈরী না হয়েই সমরে নেমেছেন।"

সুদর্শন দুবে বললেন, "মোটেই নয়। প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রায় সম্পূর্ণ আমাদের সঙ্গে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে পদত্যাগ করতে আমরা

বাধ্য করেছি। দেখেছেন ত, বিধান সভার অধিকাংশ কংগ্রেসী সদস্য আমাদের পক্ষে ভোট দিয়েছে।"

"দিয়েছিল", হরিশংকর ত্রিপাঠী সুদর্শন দুবেকে সংশোধন করলেন। "প্রথম পর্বে আমরা জিতেছি। কিন্তু সে জেতার মধ্যেও অর্ধেক পরাজয়। মাত্র পাঁচ ভোটে জিতে আমরা হেরেছি। তাছাড়া, যদি সেদিন সে-সভায় আপনি নতুন নেতা নির্বাচন করিয়ে নিতে পারতেন, জয়লক্ষ্মী আপনার বশীভূত হতেন। আপনি— আমরা—তা পারি নি। কোশলজী কয়েক দিনের সময় পেয়ে আসল সংগ্রামে অর্ধেক জিতে গেছেন।"

সুদর্শন দুবের মুখে কথা সরল না। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পরে নিরুত্তেজ স্বরে প্রশ্ন করলেন, "তা হ'লে এখন কি আমরা রণে ভঙ্গ দেব?"

ত্রিপাঠী বললেন, "না। আমাদের কাউকে দিল্লী যেতে হবে।"

"সময় কোথায়?"

"সময় চাইতে হবে। নতুন নেতা নির্বাচন এক সপ্তাহ পরে হোক। আমাদের সময়ের বড় দরকার।"

"কে যাবে?"

"আপনি।"

"আমি যেতে প্রস্তুত। কিন্তু এখানকার সব কিছু আপনারা সামলাবেন ত?"

সাংগঠনিক চারজন নেতা একসঙ্গে বললেন, বর্তমান সঙ্গীন মুহূর্তে সুদর্শন দুবের বিলাসপুর ত্যাগ করা উচিত হবে না।

মহেন্দ্র বাজপাঈ বললেন, "উড়ে যাবেন, উড়ে আসবেন। দুদিনে এখানে এমন কি গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হবে?"

নেতা চারজন পুনরায় বললেন, এ কাজ উচিত হবে না।

সুদর্শন দুবে বললেন, "আমি যেতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি উপস্থিত না থাকলে দল ভাঙ্গিয়ে নেবেন কে. ডি. কোশল। তা ছাড়া,

দিল্লীতে এমন একটা ধারণা জন্মেছে যে আমি ব্যক্তিগত কারণে কোশলজীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি।"

হরিশংকর ত্রিপাঠী মৃদু হেসে বললেন, "সুদর্শনজী, দু'দিনের জন্যে যাদের ছেড়ে যেতে ভয় পান, তেমন সমর্থকদের নিয়ে রাজত্ব করা আপনার কঠিন হবে।"

সুদর্শন দুবে কঠোর স্বরে জবাব দিলেন, "আনুগত্য, ত্রিপাঠীজী, একমাত্র ক্ষমতার তাপে শক্ত হ'য়ে লেগে থাকে। যতক্ষণ দলের সদস্যরা ভাববেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলই মুখ্যমন্ত্রীত্বে বহাল থাকছেন, ততক্ষণে তাদের আনুগত্য পদ্মপাতায় শিশিরবিন্দু। কিন্তু যে-মুহূর্তে আমরা তাকে গদিচ্যুত করতে পারব, সে মুহূর্তে সবাই একে একে দলে দলে আমাদের সঙ্গে আঁঠার মত লেগে থাকবেন।"

মাধব দেশপাণ্ডে অভ্যাসবশত ব'লে উঠলেন, "নারায়ণ! নারায়ণ!"

মহেন্দ্র বাজপাঈ বললেন, "দুবেজী যদি দিল্লী যেতে না পারেন, তা হ'লে এ গুরু কর্তব্যের দায়িত্ব বহন করতে পারেন একমাত্র দেশপাণ্ডেজী।"

মাধব দেশপাণ্ডে ব'লে উঠলেন, "অসম্ভব। আমি কদাচ এ কাজ গ্রহণ করতে পারব না।"

সুদর্শন দুবে প্রশ্ন হাঁকলেন, "কেন?"

"আমার দেহ সুস্থ নেই। কাল থেকে বাতের ব্যথাটা বড় বেড়েছে।"

"কূটনৈতিক অসুস্থতা?"

"অসুস্থাতাটা সত্যিকারেরই। তবে ইচ্ছে হ'লে কূটনৈতিকও বলতে পারেন। আমার পক্ষে এ ব্যাপারে দিল্লী যাওয়া যে কতখানি নিরর্থক, দুবেজী ভালই জানেন। উদয়াচলের রাজনীতিতে মহারাষ্ট্র-সম্প্রদায়ের স্থান নগণ্য। এ রাজনীতির নেতৃত্ব আপনাদের। হাই কমাণ্ডকে যদি বোঝাতে হয় আপনারাই বোঝাবেন।"

সুদর্শন ডুবে ঈষৎ হেসে বললেন, "কিন্তু আপনাকে ও আমরা মুখ্যমন্ত্রী করব ভেবে এসেছি।"

মাধব দেশপাণ্ডেও পাণ্ডুর হাসলেন।

"দুবেজী, আপনি রসিক লোক ব'লে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু বাতব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষের রসবোধটা যদি প্রখর না থাকে তা হ'লে মার্জনা করবেন।"

সুদর্শন ডুবে বললেন, "অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী হ'তে আপনি চান না।"

মাধব দেশপাণ্ডে জবাব দিলেন, "সত্যি বলছি, চাইনে। আমাকে মুখ্যমন্ত্রী ক'রে উদয়াচলে যে আপনি কংগ্রেসী শাসন চালু করবেন এ কথা, ডুবেজী, হাই কমাণ্ডের কানে গেলে আপনার যে-টুকু বা চান্স আছে, ধুলিসাৎ হবে।

সুতরাং দিল্লী যদি যেতে হয় তাহ'লে হয় আপনি যান, নয়তো ত্রিপাঠীজীকে পাঠান।"

মহেন্দ্র বাজপাঈ বললেন, "হরিশংকরজী গেলেই ভাল হয়।"

হরিশংকর ত্রিপাঠী নীরবে মাথা নাড়লেন।

প্রজাপতি শেউড়ে বললেন, "আগামী কাল নির্বাচন। এই শেষ মুহূর্তে হাই কমাণ্ড আমাদের দাবি মানতে রাজী হবেন না। ~~হাই ক~~মাণ্ডের প্রতিনিধি কাল বেলা এগারটায় বিলাসপুরে পৌঁছবেন। পাঁচটায় আমাদের সভা শুরু। সভা স্থগিত রাখবার দাবী অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা আগে জানানো উচিত ছিল।"

সুদর্শন ডুবে বললেন, "চব্বিশ ঘণ্টা আগে অবস্থা অন্যরকম ছিল।"

প্রজাপতি শেউড়ে একটু উত্তেজিত হ'য়ে প্রশ্ন করলেন, "চব্বিশ ঘণ্টায় অবস্থার এমন পরিবর্তন হল কি করে?"

উত্তরে সুদর্শন ডুবে সবাকার মুখের দিকে এক এক বার তাকালেন। হরিশংকর ত্রিপাঠীর বিরাট মুখমণ্ডল হাসির রেখায় কুঞ্চিত হল। মাধব দেশপাণ্ডে ব্যথা-কাতর কোমর নিয়ে নড়ে-

চড়ে বসলেন। মহেন্দ্র বাজপাঈ-এর গলা হঠাৎ খুস খুস ক'রে উঠল। তিনি কাশলেন।

সুদর্শন দুবে বললেন, "আপনারা কেউ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরুদ্ধে দরবার করতে হাই কমাণ্ডের কাছে যেতে রাজী নন। তবু আমি একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখবো। আপনাদের আমি বাধা দিতে চাই নে। কাল পর্যন্ত দলের অধিকাংশ সভ্য আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমাদের অন্তত দশ ভোটে জয় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু আজ অবস্থা অন্য রকম। আজ সম্ভবত সমান সমান। এখনও চব্বিশ ঘণ্টার বেশি আছে দলের সভার। এর মধ্যে কোশলজী আরও কিছু সভ্যকে হাত করতে হয়তো পারবেন। এমন সব হাতিয়ার তিনি ব্যবহার করছেন যা আমরা কিছুতেই পারবো না। এতো নীচে তিনি নেমে এসেছেন যে তাও আমরা পারবো না। দুর্গাভাইজীকে হাত করতে পারলে তবু আমাদের চান্স ছিল। কিন্তু দুর্গাভাই কোশলজীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে রাজী নন। বড়জোর নিরপেক্ষ থাকতে রাজী, যদি দেখতে পান যে আমাদের জয়ের সম্ভাবনা অবাস্তব নয়।"

প্রজাপতি শেউড়ে বললেন, "অর্থাৎ দুর্গাভাইকে আমরা পাচ্ছি না।"

সুদর্শন দুবে মন্তব্য করলেন, "বাস্তবে ব্যাপারটা তাই দাঁড়ায়। দলপতি পুনঃনির্বাচিত হবার জন্যে কে. ডি. কোশল কি কি দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন তার একটা স্মারকলিপি আমি হাই কমাণ্ডের কাছে আজ তারযোগে পাঠিয়েছি। তার সঙ্গে আমাদের দাবী: নির্বাচন কয়েক দিন পিছিয়ে দিয়ে এ বিষয়ে অনুসন্ধান হোক। কাজ হবে কি না ভগবান জানেন। এই সন্ধিক্ষণে আপনাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে।"

বিনা বাক্যে সকলে অনুরোধের প্রতীক্ষায় রইলেন।

সুদর্শন দুবে বললেন, "কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল, ত্রিপাঠীজী ঠিকই

বলেছেন, সহজ প্রতিপক্ষ নন। তা ছাড়া তাঁর হাতে ক্ষমতা আছে, অনেককে অনেক কিছু তিনি দিতে পারেন, অনেক লোভ তিনি দেখাতে পারেন। আপনারা এ সংকটে কংগ্রেসের প্রকৃত আদর্শ ও নীতি রক্ষার জন্য একজোট হ'য়ে আমার সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন। আপনারা জানেন, মুখ্যমন্ত্রীত্বে আমার ব্যক্তিগত লোভ নেই। আমি আপনাদের মধ্যেই যোগ্যতম ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রীত্বের পদে বরণ করতাম। যদি এই সংকট মুহূর্তে আপনারা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কূট জালে ধরা পড়েন তাহলে আমাদের জয়ের যেটুকু-বা আশা আছে তাও থাকবে না। কে. ডি. কোশল আপনাদের প্রত্যেককে লোভ দেখাবেন, ভয় দেখাবেন,—হয়তো বা দেখিয়েছেনও। আমার অনুরোধ আজ এবং কাল আপানারা আমাদের ঐক্য বাঁচিয়ে রাখবেন।"

হরিশংকর ত্রিপাঠী সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

মহেন্দ্র বাজপাঈ বলে উঠলেন, "আলবৎ। অবশ্য।"

প্রজাপতি শেউড়ে বললেন, "নিশ্চয়! একথা আবার বলতে!"

মাধব দেশপাণ্ডে, অভ্যাসবশত, "নারায়ণ! নারায়ণ!"

সভার শেষে সুদর্শন দুবে ও হরিশংকর ত্রিপাঠীর মধ্যে আরও কিছুক্ষণ গোপনে কথাবার্তা হল।

বিদায় নেবার সময় সুদর্শন দুবে বললেন, "একটা কাজ করতে পারেন, ত্রিপাঠীজী?"

হরিশংকর জিজ্ঞাসু নয়নে তাকালেন।

"সরোজিনীকে একবার দুর্গাভাইএর কাছে পাঠাতে পারেন?"

"তাতে লাভ?"

"লাভ কিছু হ'তে পারে। ক্ষতি তো কিছু নেই!"

"আপনার মনে আছে?"

"আছে। সেবার দুর্গাভাই সরোজিনীর সঙ্গে একটা কথাও বলেন নি।"

"চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। তবে, আপনার রণকৌশলটা বুঝলাম না।"

"কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও দুর্গাভাইএর মধ্যে—"

"আচ্ছা! বেশ তো। চেষ্টা করবো। কিন্তু সুদর্শনভাই—"

"বলুন ?"

"কে. ডি. কোশলকে আপনি এত দীর্ঘকাল দেখে আসলেও সম্যক জানেন না। তার চেয়ে এক কাজ করুন।"

"কি কাজ?"

"হাত মেলান। কে. ডি. কোশলের সঙ্গে হাত মেলান। হাত মিলিয়ে দুর্গাভাইকে নাজেহাল করুন। তা নইলে মুখ্যমন্ত্রী হ'তে কদাচ পারবেন না।"

"মুখ্যমন্ত্রী তো আমি হ'তে চাইনে!"

"ও-কথা অন্যদের বলবেন," হরিশংকর ত্রিপাঠী হেসে বললেন। "আমার কাছে বলে কোনও লাভ নেই।"

তের

সকালে পূজার ঘরে পদ্মাদেবী যখন মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, "তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে," প্রশ্ন করেছিলেন, "কখন সময় হবে ?" তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না এই নিশ্ছিদ্র ব্যস্ততার দিনে পত্নীর সঙ্গে কথোপকথনে সময় নষ্ট করেন।

কিন্তু পদ্মাদেবীর প্রশ্নের মধ্যে নিহিত কঠিন দাবির ঘনীভূত ব্যঞ্জনা তখনই তাঁর কানে লেগেছিল। পরমুহূর্তে, তাঁর নিস্তেজ আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে পদ্মাদেবীর অনুরোধ আদেশের চেয়েও কঠোর ভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল : "দুপুরে বাড়ী এসে খেও। তারপর কথা হবে।" কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বুঝেছিলেন, এ দাবি না মেনে উপায় নেই।

সারাদিনে আজকাল বহুদিন পদ্মাদেবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ সামান্য। বহুদিন দুপুরে খাবার পর্যন্ত তাঁকে দপ্তর-বাড়ীতে গ্রহণ ক'রে সারা অপরাহ্ণ অবিরাম কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। রাত্রেও অনেক সময় দপ্তর-বাড়ীতেই তিনি শয্যাগ্রহণ করেন। পত্নীর সঙ্গে যে সাক্ষাৎটুকু তিনি একেবারে এড়াতে পারেন না তা হ'ল প্রাতঃকালে পূজার ঘরে পদ্মাদেবীর নীরব উপস্থিতি। পূজার সময় পদ্মাদেবী কথা বলেন না; দু'ঘণ্টা গৃহ-দেবতার পদতলে চোখ বুঁজে নীরবে স্বামীর দূরত্ব উপেক্ষা ক'রে তাঁর সঙ্গে একত্র ব'সে থাকেন।

পূজার পর কখনও বা দু'চারটে মামুলী কথাবার্তা হয়, কোন দিন বা হয় না। যেদিন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুপুরে আহারের জন্যে বাড়ী আসেন, পদ্মাদেবী নিজের হাতে তাঁকে ভোজ্য পরিবেশন করেন। সাধারণতঃ এ সময়ে আরও কেউ কেউ নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রাজনীতি বা দলনীতি নিয়ে আলোচনা

চলে, পদ্মাদেবী নিজের উপস্থিতিকে যত সম্ভব সংক্ষিপ্ত, সংকুচিত রাখেন। মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাড়ীতে শুতে আসেন। পদ্মাদেবী স্বামীকে বিছানায় শুইয়ে মশারি গুঁজে দিয়ে কখনও কদাচিৎ পাশের চেয়ারে বসে দু'চারটে কথা বলেন নিতান্ত সাংসারিক বিষয়ে। আবার কখনও কোন কথাই বলেন না।

স্বামী-স্ত্রীর এ বিরাট্ ব্যবধান ধীরে ধীরে বহুদিনে তৈরী; এখন দু'জনেরই প্রাচীন অভ্যাস। পরিণত যৌবনে জনসাধারণের কর্ম-পরিধিতে প্রবেশ করার পর কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জীবনে অন্য রমণীর পদসঞ্চার ঘটেছে, কিন্তু পদ্মাদেবীর সঙ্গে ব্যবধানের তাই একমাত্র কারণ নয়। প্রধান কারণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রাজনীতি। তার সঙ্গে পদ্মাদেবী নিজেকে মানিয়ে নিতে একবারে পারেন নি; পদ্মাদেবীর কোন প্রয়োজন বোধও করেন নি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। দৈহিক সম্পর্ক তাঁদের মধ্যে বহু বছর শেষ হয়ে গেছে; আত্মিক কোনও সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে নি। পদ্মাদেবীর নীতিবোধ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে দুর্বল প্রতিবাদের চেয়ে বেশী মর্যাদা পায় নি। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ঘরের সুনীতি দিয়ে যে রাজনীতি করা যায় না পদ্মাদেবীকে তিনি বার বার তা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। সেও কয়েক বছর আগেকার কথা।

চন্দ্রপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়েই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দপ্তর-বাড়ী থেকে নামলেন। সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে নীচে আসতে দেখতে পেলেন তিওয়ারী দাঁড়িয়ে।

"দুর্গাপ্রসাদ ভাই তিনটের সময় আসছেন।"

"কে?"

"দুর্গাপ্রসাদভাই।"

"সে আসছে, না? বেশ। তার আসা বড় দরকার।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হঠাৎ গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। তিওয়ারীর মনে হল, তিনি বহু দূরে।

"গোপালকৃষ্ণণকে চারটের সময় আসতে বলেছি।"

অনেক দূর থেকেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "বেশ"।

পা বাড়ালেন।

"আরও খবর আছে।"

"বল।"

"কিছুক্ষণ আগে হরিশংকরজীর বাড়িতে ও-পক্ষের বৈঠক বসেছিল।"

"কে কে ছিল?"

"ত্রিপাঠীজী, দুবেজী, প্রজাপতি শেউড়ে, মহেন্দ্র বাজপাঈজী, দেশপাণ্ডেজী।"

"ঐ মেয়েটি ছিল না?"

"না।"

"তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছ?"

"সন্ধ্যাবেলা করব।"

"তুমি নিজে যেয়ো না।"

"না।"

"বৈঠকে কি হ'ল?"

"দুবেজী নাকি খুব গরম গরম কথা বলেছেন।"

"হুঁম্। একটা কাজ কর।"

"বলুন।"

"আচ্ছা, এখন থাক। আমি খেতে যাচ্ছি। তুমি খেয়েছ?"

"না।"

"খেয়ে নাও। পরে দেখা ক'রো।"

তিওয়ারী বিদায় নিলে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চন্দ্রপ্রসাদকে বললেন, "তোমার খাওয়া হয়েছে, রাজকুমার?"

"অনেকক্ষণ, পিতাজী। বেকার মানুষের ভয়ংকর ক্ষিধে পায়।"

“পাইলট হ’তে যাচ্ছ। দেহ মজবুত রাখতে হবে ত!”

“দেহ খুব মজবুত আছে, পিতাজী।”

“তুমি একটা কাজ করতে পারবে?”

“নিশ্চয় পারব।”

“কি কাজ না জেনেই বলছ?”

“আপনি কি এমন কিছু কাজ আমায় দেবেন যা আমার অসাধ্য?”

“এ কাজটা সহজ নয়।”

“আপনার জন্যে দু-একটা কঠিন কাজ আমি করেছি, পিতাজী।”

“তা করেছ।”

“তা হ’লে বলুন।”

“বসন্তকে বিয়ে করতে পারবে?”

চন্দ্রপ্রসাদকে চুপ দেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তার কাঁধে হাত রাখলেন।

“চুপ কেন? লজ্জা করছে?”

“না, পিতাজী।”

“যদি পার ক’রে ফেল। তোমরা দুজনে রাজী হ’লে আমি গিয়ে দুর্গাভাইএর কাছে প্রস্তাব করব।”

“আপনি?”

“দুর্গাভাই এ প্রস্তাব নিয়ে কদাচ আমার কাছে আসবেন না।”

“তাতে আপনার অসম্মান হবে, পিতাজী।”

“অসম্মান? অসম্মান হবে কেন? তুমিই ত একটু আগে বলছিলে তোমাদের জন্যে সত্যিকারের সম্মানজনক কিছু আমি করি নি। তুমি এয়ার ফোর্সে যাচ্ছ, তাও আমার কিছুমাত্র সাহায্য না নিয়ে, জেনে বড় আনন্দ হচ্ছে, রাজকুমার। তোমার জন্যে এটুকু করতে আমার অসম্মান হবে না।”

“কিন্তু, পিতাজী, কন্যাপক্ষেরই ত আপনার কাছে আসা উচিত।”

“দুর্গাভাই মেহতা সাধারণ লোক নন। তাঁর নীতিবোধ অত্যন্ত

প্রখর। আমি যতদিন মুখ্যমন্ত্রী, আমার পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে কখনও তিনি এ গৃহে উপস্থিত হবেন না।"

বাড়ীতে ঢুকে দেখলেন পদ্মাদেবী বারান্দায় অপেক্ষা করছেন।

হালকা সুরে বললেন, "আমি কি অতিথি যে দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমার অপেক্ষা করছ?"

পদ্মাবতী মৃদু স্বরে বললেন, "বড় দেরি হয়ে গেল। এত বেলায় খেলে শরীর ঠিক থাকে না।"

"তবু ভাল আজ নিমন্ত্রিত কেউ নেই।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্নানঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুলেন। খাওয়ার বড় ঘরের দিকে পা বাড়াতে পদ্মাদেবী বললেন, "ও-ঘরে নয়। আমার ঘরে তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে।"

এঘর বাড়ীর ভিতরের দিকে, পেছনের বাগানের গায়ে। বহুদিন পরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পত্নীর ঘরে প্রবেশ করলেন।

মেঝেয় রেশমী আসন পেতে আহারের ব্যবস্থা। কাঁসার থালায় গরম পুরি, বেগুন ভাজা ও তরকারি। আচমন ক'রে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আহারে প্রবৃত্ত হলেন। পদ্মাদেবী অদূরে মেঝেয় বসলেন।

তরকারি মুখে দিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, নিজের হাতে রেঁধেছ দেখছি।"

পদ্মাদেবী ম্লান হাসলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "কি সব কথা আছে বলছিলে। ব্যাপারটা গুরুতর মনে হচ্ছে। বলতে শুরু কর।"

"আগে খেয়ে নাও।"

"জানই ত আমি ধীরে-আস্তে খাই। খাওয়ার পরে বেশিক্ষণ বসতে পারব না। আজ এক মুহূর্তের অবকাশ নেই।"

"তা হ'লে বলি। আমার কোনও কথা তুমি কোনও দিন শোন নি। জানি আজও শুনবে না। তবু বলব।"

"বল।"

"তোমার সংগ্রামের সংবাদ কি ?"

"জয় নিশ্চিত মনে হচ্ছে।"

"তা হ'লে আমাকে বলতেই হবে।"

"বলো না।"

"তুমি এই গদি এবার ছেড়ে দাও।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নীরবে একখানা প্যার শেষ করলেন।

তারপর বললেন, "কেন ?"

"তোমার বয়স হয়েছে। এ পরিশ্রম আর তোমার সইবে না। দেহ ভেঙ্গে যাবে।"

"অর্থাৎ, মরে যাব। এ বয়সে মৃত্যুকে ত ভয় পাবার কথা নয়।"

"মরে যাওয়া-না-যাওয়া ভগবানের হাত। তোমার বয়স হয়েছে। অনেকদিন ত এ কাজ করলে। এবার অন্যরা করুক।"

"যাদের করার সম্ভাবনা তাঁদের বয়স আমার চেয়ে বিশেষ কম নয়।"

"তা হ'লে নতুন কাউকে এ দায়িত্ব দিয়ে দাও।"

"মুখ্যমন্ত্রীত্ব ত আমার জমিদারী নয় যে উইল ক'রে কারুর হাতে তুলে দেব! এ হ'ল রাজনীতির লড়াই। আজ যদি আমি না থাকি, তবে কার হাতে যাবে আমি কি ক'রে বলব ?"

"দেশ-শাসন কেবলমাত্র রাজনীতি হয়ে গেল কেন ? দীর্ঘকাল তোমরা দেশের সেবা করে এসেছ। এখন করছ দেশের কল্যাণ, উন্নতি, সংগঠন। এর চেয়ে বড় কাজ আর কি হ'তে পারে ? এত বড় উত্তরাধিকার বইতে পারার মত মানুষ তোমরা তৈরী করছ না কেন ? কেন এই দেশকল্যাণ কেবল রাজনীতি হয়ে উঠল ?"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সহজে প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "এ প্রশ্ন আমার মনেও অহরহ জেগে রয়েছে। আমরা স্বাধীনতা পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের প্রায় সব নেতা-

দেরই শাসনকার্যে যোগ দেবার আহ্বান এল। এমন যে নীতি-পরায়ণ দুর্গাভাই, তিনিও সরকারের বাইরে থাকতে পারলেন না। ক্ষমতার উত্তাপে আমাদের অন্তরে ঘুমন্ত সকল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল; শাসনকার্যকে আমরা রাজনীতি ক'রে তুললাম। অথচ হাজার হাজার দেশকর্মী, যারা বছরের পর বছর ইংরেজ আমলে দেশের জন্যে আত্মত্যাগ করেছে, তাদের আমরা রাখলাম শাসন ও সংগঠনের বাইরে। পুরাতন আমলাতন্ত্র নিয়েই শুরু হ'ল আমাদের জনকল্যাণ রাজত্ব। আজ আমরা রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে এমন জড়িয়ে গেছি যে, এর থেকে মুক্তির পথ বুঝি আর খোলা নেই। এর মধ্যে, এই আমাদের সবকিছু প্রচেষ্টার মধ্যে, কোথায় যেন মস্ত বড় ফাঁক আর ফাঁকি রয়ে গেছে। তার আন্দাজ পাই, অথচ তার চেহারা খুঁজে বার করবার অবকাশ নেই, উপায় নেই। প্রদীপের আলো যখন কমে আসে, সে দপ্ দপ্ করে বেশি তেজে জ্বলতে চায়; নতুন তেল না হ'লে যে সে আর জ্বলবে না এ জ্ঞান তার থাকে না।"

"তুমি ত অনেক করেছ। এবার তুমি এ দায়িত্ব ছেড়ে দাও।"

"আমি করি নি কিছুই, পদ্মাবাঈ। পাঁচ বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকবার পরে এখন যেন পরিষ্কার দেখতে পাই কত কিছু না-করা রয়ে গেছে, যা-কিছু করেছি তার মধ্যে কত ফাঁক, কত ভেজাল। এ দেশের মাটিতেই বুঝি এমন কিছু রয়েছে যা পূর্ণতার পথ চিরদিনই আগলে দাঁড়ায়। ধরো, এই এমন সাধের আমার বিদ্যামন্দিরগুলি। ভেবেছিলাম সমস্ত উদয়াচলে হাজার হাজার বিদ্যামন্দির স্থাপন ক'রে দশ বছরে নিরক্ষরতা অনেকখানি দূর ক'রে দেব। গ্রামে গ্রামে স্কুল খোলা হ'ল, শিক্ষক নিযুক্ত হ'ল, অর্থ খরচ হ'ল অনেক। অথচ পরিণামে দেখা গেল, স্কুল আছে ত শিক্ষক নেই, শিক্ষক আছে ত ছাত্র নেই। এমন কি এমন অনেক 'স্কুল' আছে যার অস্তিত্ব কেবল সরকারী ফাইলে, রিপোর্টে।"

"এ গলদ দূর করবার ক্ষমতা তোমার আর নেই। তুমি বৃদ্ধ হয়েছে, তোমার শক্তি কমে গেছে। এবার তুমি ছেড়ে দাও।"

"বার বার তুমি একথা বলছ কেন।" কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কণ্ঠে এবার উষ্মা।

"শুধু এ জন্যে, যে আমাব ভয় করছে।"

"কিসের ভয়?"

"এতকাল তুমি উদয়াচলের নেতৃত্ব করে এসেছ। তোমার দুর্বলতা আর কেউ না জানুক, আমি জানি। অন্যায় করেছ, স্খলন হয়েছে বার বার তোমার। তবু তোমার অসীম শক্তিতে তুমি তাদেব উর্ধ্বে উঠতে পেরেছ। অনেকে তোমার বদনাম করে, নিন্দা করে, কিন্তু সবাই তোমাকে শ্রদ্ধাও করে। জানে, তুমি দশ ভাগ অন্যায় করেও নব্বুই ভাগ ন্যায় ক'রে থাক। গত পাঁচ বছরে তুমি মুখ্যমন্ত্রীব সমুচিত অনেক কিছু করেছ; সঙ্গে সঙ্গে উদয়াচলের জন্যে যা করতে পেরেছ আর কেউ তা পারত না।"

"তা হ'বে।"

"কিন্তু এবার তোমার পতন হ'তে শুরু করেছে।"

"পতন!"

"হ্যাঁ। তুমি ক্ষমতার লড়াইয়ে জড়িয়ে গেছ, জিতবার জন্যে এমন মূল্য নেই যা তুমি দিতে তৈরী নও।"

"মিথ্যে কথা।"

"মিথ্যে কথা যে নয় তা তুমি খুব ভাল করে জান। তুমি শঠতা, ছল, চাতুরি, কূটনীতি সব কিছুর আশ্রয় নিয়েছ লড়াইয়ে জিতবার জন্যে। তুমি এমন লোকেদের সাহায্য নিচ্ছ যারা তোমার সামনে এসে দাঁড়াতে ভয় পেত। জিতবার পর তারা যা চাইবে, না দিয়ে তুমি পারবে না। সুদর্শন দুবের সঙ্গে লড়বার জন্যে তুমি তারই মত নীচে নেমে এসেছ। পাঁচ বছর আগে মুখ্যমন্ত্রীত্ব তুমি আপন

গৌরবে অধিকার করেছিলে। দুর্গাভাইজী পর্যন্ত তোমার নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজ তুমি আর তা নও।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নীরবে ভোজন করতে লাগলেন।

পদ্মাদেবী কাতর কণ্ঠে বললেন, "তা ছাড়াও তুমি অন্যায় করেছ। তোমার ছেলেদের ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্যে তুমি যা করেছ—অনেক গোপনে করলেও—আমি তা জানি।

"মা হয়ে তোমার তাতে আপত্তি করা উচিত নয়।"

"আমি শুধু মা নই, তোমার স্ত্রীও। তুমি আমার সঙ্গে সম্পর্ক বহুদিন নষ্ট করেছ, তবুও আমি তোমার স্ত্রী। তুমি নিজের ন্যায় পরিশ্রমে ছেলেদের জন্যে কিছু রেখে যেতে পারলে আমার গৌরব হ'ত। তোমার ক্ষমতার আসন থেকে লুকিয়ে যা করেছ তাতে আমার গৌরব নেই, আছে অপমান।"

"থাক। অত বক্তৃতা দিও না।"

"বক্তৃতা দিতে আমি চাই নি। শুধু তোমায় বলতে চেয়েছি, এখনও তোমার মান, যশ, সুনাম অনেক। এসব তুমি সারা জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমে অর্জন করেছ। যদি এখন তুমি অবসর নাও, দেশশুদ্ধ লোক তোমায় ধন্য দেবে। যদি না নাও, যদি আবার তুমি মুখ্যমন্ত্রী হও, তা হ'লে এতকালের অর্জিত সব কিছু কয়েক বছরে তুমি হারাবে। যাদের নিয়ে, যে অস্ত্রের ব্যবহারে তুমি জিতবে তারা তোমায় একেবারে নীচে নামিয়ে আনবে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আহার শেষ হয়ে গেল। গণ্ডূষ ক'রে তিনি ন'ড়ে বসলেন। চোখে মুখে তাঁর ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। বরং এক ক্লান্ত ঔদাসীন্য গৌরবর্ণকে পাণ্ডুর করেছে।

বললেন, "এ সব কথা আমিও যে না-ভাবি তা নয়। কিন্তু উপায় নেই। আমরা যারা দেশ-চালনার দায়িত্ব নিয়েছি, আমরণ সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। যারা আমার নেতৃত্ব ভাঙ্গতে চায় তাদের ভাঙ্গতে না পারলে আমার তৃপ্তি নেই। ক্ষমতার নেশা

আছে মানি। কিন্তু আমার এ জেদ নেশাজাত নয়। আমি জানি উদয়াচলের শাসনদায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে এমন ব্যক্তি এখনও একমাত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। বাকী সবাই ভীরু, অপদার্থ, কাপুরুষ। দুর্গাভাই মেহতা পর্যন্ত। তাঁর সাহস নেই দলের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন, আমি তোমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত। শুচিবাইগ্রস্ত বিধবার মত তিনি নিজের সুনাম বাঁচাবার জন্যে ব্যস্ত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি শুচিশুদ্ধ। পদ্মাবাঈ যে বীর—যার যোগ্যতা আছে, যে বড় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অনেক অন্যায় তার দেহ স্পর্শ করে না। মহাভারতের কথা ভেবে দেখ। ভীম, অর্জুন, ভীষ্ম—অন্যায় করেন নি কে? অমন যে যুধিষ্ঠির তাঁকে পর্যন্ত যুদ্ধে জিতবার জন্য মিথ্যা বলতে হয়েছিল। যে সংগ্রামে নেমেছি তাতে জয়লাভই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। জয়ের পরেকার ক্লান্ত দিনগুলি অবসাদ আনবে জানি। অনেক ভেজাল, অনেক মিথ্যা দিয়ে জয়লাভের পর মোটা মাশুল দিতে হবে, তাও জানি। কিন্তু পেছুবার আর উপায় নেই।”

পদ্মাদেবী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন,“এবার আমি চলি। কাজ রয়েছে।”

পদ্মাদেবী বললেন,“কাল ভোরে আমি কাশী যাচ্ছি।”

“কোথায়?”

“কাশী।”

“কার সঙ্গে?”

“একজন কাউকে সঙ্গে নেব।”

“কবে ফিরবে?”

“কিছুদিন থাকব।”

“বাড়ীটা খালি আছে?”

“আছে।”

“বেশ। যাও।”

"আর একটা কথা আছে"

"বলো।"

"কমলাকে আমি কিছু গহনা আর টাকা দিতে চাই।"

"কোন্ কমলা?"

"তোমার পুত্রবধূ। দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রী।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নীরব রইলেন।

"বিয়ের পর থেকে সে কিছু পায় নি। আমার বাপের বাড়ীর দেওয়া গহনার অর্ধেক আমি তাকে দিতে চাই। আমার নামে যা টাকা আছে তা থেকে পাঁচ হাজার টাকাও।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তখনও নীরব।

"কমলা কখনও কিছু চায় নি। নেবে কিনা তাও জানি নে। কিন্তু দিতে আমাকে হবেই। এবং আজই।"

"আজই?"

"হ্যাঁ। আজ রাত্রে আমি তার কাছে যাচ্ছি।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে, ক্লান্ত স্বরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "বেশ।"

দরজার বাইরে যাবার মুখে ফিরে দাঁড়ালেন।

"একটা কাজ করো।"

"কি?"

"দুর্গাপ্রসাদের পত্নীকে দেব বলে একবার এক ছড়া হার কিনে এনেছিলাম। সেটা আছে?"

"আছে।"

"ওদের একটি মেয়ে আছে, না?"

"আছে। খুব সুন্দর দেখতে।"

"তার জন্যে নিয়ে যেয়ো।"

চৌদ্দ

দুর্গাভাই মেহতার বাংলোবাড়ী বিলাসপুর শহরের উত্তর-প্রান্তে। একদা বিস্তীর্ণ সংরক্ষিত অরণ্যে উত্তর প্রান্ত ছিল জনবিরল। ইংরেজ আমলে গভর্ণররা অরণ্যে পশু শিকার করতেন। অরণ্য ঘিরে রয়েছে আরাবল্লী পর্বতমালার একাংশ; শাল, সেগুন ও অনেক রকম বন্য গাছের মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে সরু পথ। এখন অরণ্যের অনেকখানি জনপদে পরিণত। নতুন নতুন কলোনী তৈরী হয়েছে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের রাজত্বে। একটি কলোনীর নাম কোশলনগর। অন্য নাম কে. ডি. নগর। কোশলনগরে তৈরী হয়েছে মন্ত্রী এবং উচ্চস্তরের রাজপুরুষদের জন্যে নতুন বাংলো। এর একটি দুর্গাভাই মেহতার। বাংলোটি এক পাহাড়ের ওপর। নীচে থেকে বেশ খানিক উঁচুতে উঠে গেছে পীচের রাস্তা বাংলোর গেট পর্যন্ত। গাড়ি সহজে উঠতে পারে, কিন্তু সাইকেল-রিকশা টেনে তুলতে মানুষ শীতেও ঘর্মাক্ত হয়। বাংলোর সামনে ফুলের বাগান। দক্ষিণ কোণে দুর্গাভাইএর খাস দপ্তর।

মধ্যাহ্ন আহারের পরে দুর্গাভাই কদাচ বিশ্রাম নেন না। সারাদিন কর্মব্যস্ততা গান্ধী-শিষ্য-জীবনের প্রাচীন অভ্যাস। আজও আহারান্তে বাগানে পাইচারি করছিলেন। মন অশান্ত। জীবনে অনেক সিদ্ধান্ত-সংকটে পড়েছেন দুর্গাভাই। কিন্তু আজকের, বর্তমানের, সংকট অন্য রকমের। যৌবনে সরকারী কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ ক'রে গান্ধীজীর আহ্বানে স্বাধীনতা সংগ্রামের অহিংস সৈনিক হবার সময়ও সংকট দেখা দিয়েছিল। মনস্থির করতে কষ্ট হয় নি; মনস্থির ক'রে আনন্দ, তৃপ্তি, গৌরব হয়েছিল।

স্বাধীনতার পরে পুনরায় সংকটে পড়েছিলেন। মন চাইছিল গান্ধীজীর শিষ্য থেকেই শাসনপর্বের বহুদূরে গ্রামাঞ্চলে কাজ করতে।

পারেন নি। উদয়াচলের কংগ্রেস কর্মীদের দাবি, পত্নী মনোরমার সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পুত্রকন্যাদের অনুচ্চারিত ক্ষোভ—সব উপেক্ষা করবার সাহস ছিল, ছিল না মহাত্মার আদেশ লঙ্ঘনের।

মন্ত্রীত্ব ক'রে পাঁচ বছর কেটে গেল। পাঁচ বছরে দেশের, দেশবাসীর যে-পরিচয় দুর্গাভাই পেয়েছেন তাব কিছুই প্রায় জানা যায় নি সুদীর্ঘকালের দেশসেবায়। আজ একেবারে নতুন সংকট। দুর্গাভাই জানেন, ইচ্ছে করলে উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী তিনি হ'তে পারেন। একদিক থেকে দেখতে গেলে হওয়া তাঁর দায়িত্ব, কর্তব্য। কংগ্রেস দলে যে ভাঙ্গন ধরেছে, জয়লাভ করলেও, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তা জুড়তে পারবেন না। পদ্মাদেবী ঠিক বলেছেন, জয়ের মধ্যেও কোশলজীকে পরাজয় মানতে হবে। পাঁচ বছর আগে তিনি যে-মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আগামী কাল, দলীয় সংগ্রামে জিতেও, তিনি আর সে-মুখ্যমন্ত্রী হ'তে পারবেন না। যাদের সাহায্য নিয়ে তাঁর জয় হবে, তাদের পুরস্কৃত করতে গিয়ে নিজের বল ও মর্যাদা তিনি অনেকখানি হারাবেন। যারা হারবে, তারা গোপন হিংসায় অনবরত ষড়যন্ত্র ক'রে যাবে, যতদিন না প্রতিশোধের উল্লাসে তাদের চিত্ত বিত্তহীন হয়ে উঠবে।

কংগ্রেস-শাসনকে এ সংকট হ'তে বাঁচাতে পারেন একমাত্র দুর্গাভাই। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আজও তাঁকে রাজমুকুট ছেড়ে দিতে রাজী আছেন। গতকালও বলেছেন, 'আপনি যদি মুখ্যমন্ত্রী হন, দুর্গাভাইজি, আমি সানন্দে অবসর নেব'। কোশলজীর প্রতিপক্ষও দুর্গাভাইকে প্রাধান্য দিতে তৈরী। সুদর্শন দুবে আজ সকালেও টেলিফোনে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হবার অনুরোধ করেছেন। হাইকমাণ্ড থেকেও তাঁর অভিমত জানতে চাওয়া হয়েছে। মনোরমা পুত্রকন্যাদের নিয়ে রীতিমত রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু ক'রে দিয়েছেন।

অথচ দুর্গাভাই কিছুতে মনস্থির করতে পারছেন না।

আজ সকালে এ নিয়ে মনোরমার সঙ্গে আবার ঝগড়া হয়ে

গেছে। মনোরমা যে সুদর্শন দুবের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করেছেন দুর্গাভাই তা জানতেন না। খবর পেয়ে গেলেন অপ্রত্যাশিতভাবে কন্যা বসন্তের কাছে।

রাত্রে শুতে যাবার আগে বসন্ত তাঁর জন্য এক গ্লাস দুধ নিয়ে আসে। কালও এসেছিল। দুধ পান করে গ্লাস ফিরিয়ে দিতেও বসন্ত দাঁড়িয়েছিল।

দুর্গাভাই প্রশ্ন করেছিলেন, "কিছু বলবে?"

"আপনি যদি অনুমতি দেন"

"বল"

"কোশলজী কি হেরে যাবেন?"

"তুমিও রাজনীতি করছ নাকি?"

"না। শুধু জানতে চাইছি।"

"মনে হয় না হারবেন।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"তা হ'লে কি আপনি হারবেন, পিতাজী?"

"আমি? আমি ত হেরেই আছি।"

"কোশলজী যদি জেতেন, তবে ত আপনার হার হবে।"

"কেন? আমি ত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নই!"

"নন?"

"না ত।"

"তবে যে মা বললেন—"

"মা কি বললেন?"

"মা বললেন, সুদর্শনজী আপনাকে কোশলজীর প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করাবেন। আর, আপনি তাতে রাজী হয়েছেন।"

"মা কি করে জানলেন?"

"গতকাল সুদর্শনজী এসেছিলেন।"

"কেন ? কখন ?"

"দশটায়। মা'র সঙ্গে কথা বলতে।

"হঠাৎ মা'র সঙ্গে কথা বলার কি দরকার হ'ল ?"

"হঠাৎ নয়, পিতাজী !"

"ও ! কথাবার্তা তা হ'লে চলে আসছে ?"

"মা বললেন, এবার কোশলজীর পতন অনিবার্য।"

"তোমার মা রাজরাণী হ'তে চান। বহুদিনের সখ।"

"আপনি কি প্রতিদ্বন্দ্বী নন, পিতাজী ?"

"না। রাজা হবার সখ আমার নেই। মন্ত্রীত্বই হজম করতে পারি নি, আবার রাজা !"

"আমি যাই, পিতাজী।"

"শোন। তুমি কোন্ দলে জানতে পারি কি ?"

"আপনার দলে, পিতাজী।"

"তুমি চাও আমি মুখ্যমন্ত্রী হই ?"

"না, পিতাজী।"

"কেন ?"

"জানি না।"

"আচ্ছা, এস।"

বসন্তের সুন্দর মুখখানায় খুশির ছটা দেখতে পেয়েছিলেন দুর্গাভাই মেহতা। কারণ বুঝতে পারেন নি। ভেবেছিলেন, পিতার প্রতি অন্ধ অনুরাগ। বোঝেন নি, বসন্তের ভয়, আশা, আশংকা। কোশল পরিবারের সঙ্গে সে সংগোপনে একটি অনুরাগের সেতু তৈরী করেছিল। মনোরমা কোশলদের কোনদিন সুনজরে দেখেন নি। অধুনা তাঁদের নাম পর্যন্ত শুনতে পারেন না। এর ওপর যদি দুর্গাভাই ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তার সেতুটি ধূলিসাৎ হবে।

প্রাতঃরাশের সময় তুর্গাভাই পত্নীকে কঠিন ভাষায় বলে উঠলেন, "তুমি রাজনীতি করতে চাও, কর। কিন্তু আমাকে নিয়ে নয়।"

"তার মানে?"

"সুদর্শন তুবের সঙ্গে তোমার কি-সব কথাবার্তা চলছে?"

"কে বলল তোমাকে একথা?"

"যেই বলুক।"

"নিশ্চয় কে. ডি. কোশল! মূর্তিমান শয়তান। সর্বত্র গুপ্তচর ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। আমি জানতাম তার লোক আমাব পেছনে লেগে রয়েছে।"

"কোশলজী বলেন নি। কিন্তু কথা তা নয়। কথা হচ্ছে, তুমি এ ব্যাপারে মাথা গলিও না।"

"কেন? আমি উদয়াচলের নাগরিক। কংগ্রেসেব কাজ আমিও করেছি। উদয়াচলের শাসনে আমাবও অধিকার আছে। কে মুখ্যমন্ত্রী হ'লে প্রদেশের ভাল হবে সে বিষয়ে আমাবও বলবার আছে, করবার আছে।"

"তা আছে! কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যেই হোক, আমি হচ্ছি না।"

"কেন? তুমি কেন হবে না? প্রদেশের সবাই তোমাকে চাইছে। কংগ্রেসী দলের সবাই তোমাকে চায়। হাইকমাণ্ড তোমাকে চায়। তোমার কি অধিকার আছে এত মানুষেব দাবি উপেক্ষা করার?"

"অধিকার আছে। বিবেকের অধিকার।"

"বিবেক! আসলে তুমি ভীরু, কাপুরুষ! দায়িত্বের ভয়ে তুমি অস্থির। কে. ডি. কোশলের ছায়ায় ব'সে মন্ত্রীত্বের চেয়ে বড় কিছু তুমি ভাবতে পার না।"

"হয়ত তাই।"

"কিন্তু কেন তুমি ভাবতে পারবে না? তোমার মত নেতা ভারতবর্ষে ক'জন আছে? তুমি কত ভাল করতে পার উদয়াচলের!

কংগ্রেসের মধ্যে যে মরণ-বিষ আজ ঢুকে গেছে তুমি তাকে বার করে দিতে পার। কে. ডি. কোশলের রাজত্বে যে ভীষণ দুর্নীতি ; দৌরাত্ম্য, অত্যাচার, অনাচার, আত্মীয়পোষণ চলে এসেছে তুমি তা সব বন্ধ করতে পার। তোমার নেতৃত্বে উদয়াচলে রামরাজত্বের সূচনা হ'তে পারে।"

"অন্তত তুমি নিজেকে রাজরাণী মনে করতে পার।"

"চিরদিন তুমি আমায় বঞ্চিত রেখেছ। কোনও আশা আমার পূর্ণ হ'তে দাও নি। আজ, মরবার আগে, তোমাকে আমি সবার উচ্চাসনে দেখতে চাই। যে গৌরব, যে সম্মান, যে মর্যাদা তোমার প্রাপ্য, তা তুমি পেয়েছ, দেখতে চাই। তুমি আজও আমাকে বঞ্চিত রাখবে। এই তোমার বিচার ?"

দুর্গাভাই তিক্ত, ভারি মন নিয়ে দপ্তর-ঘরে চলে এসেছিলেন। রমণীর মনে যখন উচ্চাশার আগুন জ্বলে, তখন বুঝি সর্বনাশ সমাসন্ন।

মনোরমাকে দেখে, তাঁর কথা শুনে আর একটি নারীকে মনে পড়েছিল দুর্গাভাই-এর। তিনি তাঁর স্বামীর মাথা থেকে রাজমুকুট সরিয়ে নেবার জন্যে ব্যাকুল। যে-মুকুটের জন্যে মনোরমার লোভ অসীম, তাতে তাঁর নিস্পৃহা সীমাহীন। অথচ একদিকের লোভ অন্যদিকের নিস্পৃহা : দুই-ই সমান দুর্বল।

রাজনীতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকার দরুণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দৈনন্দিন শাসনভার প্রায় সম্পূর্ণ দুর্গাভাই-এর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। বর্তমান অন্তবর্তীকালে বড় কোনও কাজ সরকার হাতে নিচ্ছিলেন না ; নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি স্থগিত রাখা হচ্ছিল। তবু একটা প্রদেশের দৈনন্দিন শাসনের সমস্যা কম নয়। সাধারণতঃ যে-সব বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মতামত দরকার তার প্রায় সবগুলিই এ ক'দিন দুর্গাভাইকে দেখতে হচ্ছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এ অনুরোধ তিনি

উপেক্ষা করতে পারেন নি। অনুরোধকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নীতির প্রলেপ লাগিয়ে আরও বাধ্যতামূলক করেছিলেন। একখানা পত্রে দুর্গাভাইকে লিখেছিলেন, "মন্ত্রীসভা পদত্যাগের পর এক অনিবার্য অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। আপনি জানেন, মুখ্যমন্ত্রীত্বের জন্য আমি দলের সমর্থন চাইছি। যদি এই অনিশ্চিত সপ্তাহগুলিতে রাজকার্য আমি চালাই, কারুর কারুর সন্দেহ হ'তে পারে আমি শাসনযন্ত্রকে নিজের স্বার্থ-সাধনে বিনিয়োগ করছি। সুতবাং আমি দু'টি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। প্রথম, দৈনন্দিন শাসন-নেতৃত্বের দায়িত্ব অন্তবর্তী-কালে আপনাকে গ্রহণের অনুবোধ করা। দ্বিতীয়ত, কোনও গুরুত্ব-পূর্ণ বিষযে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে না চাইলে তাকে ক্যাবিনেটে উত্থাপন করা। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ইচ্ছে বা প্রয়োজন হ'লে আপনি সর্বদা আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। না করলেও আমি আপত্তি জানাব না, কারণ উদয়াচলের স্বার্থ আপনার হাতে ন্যস্ত থাকলে আমার বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তার কারণ থাকবে না। আশা করি আমার এ অনুরোধ আপনি রক্ষা করবেন"

পত্রখানা সারা ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

দুর্গাভাই সবকারেব দৈনন্দিন দায়িত্ব গ্রহণে আপত্তি জানান নি। মন্ত্রীসভা পুনর্গঠনের ব্যাপারে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আগাগোড়া তাঁকে শ্রদ্ধা, সম্মান ও সমীহ ক'রে আসায় তিনি প্রীত হয়েছিলেন দুর্গাভাইএর চরিত্রের দুর্বলতাটুকু কৃষ্ণদ্বৈপায়নের যতটা জানা ছিল তাঁর নিজের ততটাই ছিল অজানা। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানতেন দুর্গাভাইএর কঠিন নীতিবোধ ও কৃচ্ছ্রসাধনার পশ্চাতে রয়েছে তীক্ষ্ণ আত্মাভিমান। দুর্বলের, দুষ্টের প্রশস্তির উদ্দেশ্য তিনি বুঝতে পারতেন, কিন্তু যোগ্যের কাছে প্রশংসা ও সুখ্যাতির ওপব তাঁর দুর্বলতা প্রচণ্ড।

আজ সারা সকাল দুর্গাভাই সবকারী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এরই মধ্যে বিলাসপুরের রাজনৈতিক সংঘাত কয়েকবার তাঁকে স্পর্শ করে

গেছে। কাজের মধ্যে একবার সুদর্শন দুবে টেলিফোন করেছিলেন। দুর্গাভাইকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীত্বের জন্যে দাঁড়াবার পুনর্বার অনুরোধ। দুর্গাভাই অনুরোধ রাখতে অসামর্থ জানিয়ে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় টেলিফোন এসেছিল এক অপ্রত্যাশিত ব্যক্তির কাছ থেকে।

তাঁর নাম হরিশংকর ত্রিপাঠী।

"নমস্তে দুর্গাভাইজী। আমি ত্রিপাঠী বলছি। হরিশংকর ত্রিপাঠী।"

"নমস্তে। বলুন।"

"খুব ব্যস্ত আছেন?"

"না। ব্যস্ত কোথায়?"

"আপনাকে একটা ফাইল পাঠিয়েছি। হিন্দুস্থান অটমোবাইল কোম্পানীর নতুন কারখানা বিষয়ে।"

"ফাইল আমি পড়েছি।"

"এ বিষয়ে ক্যাবিনেটে একবার আলোচনা হয়ে গেছে কোম্পানী বিলাসপুরের কয়েকজন ব্যবসায়ী গঠন করেছেন। সরকারী ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব ক্যাবিনেট মঞ্জুর করেছেন। এখন বাকী কাজটা শেষ হয়ে গেলে ভাল হয়।"

"কিন্তু, ত্রিপাঠীজী, এ ব্যাপারটা নিয়ে কতগুলি অভিযোগ কাগজে বেরিয়েছে।"

"মিথ্যা অভিযোগ।"

"তা হ'তে পারে। আমার মনে হয়, এ বিষয়টা বর্তমানে স্থগিত থাক। নতুন ক্যাবিনেট সব বিষয় পুনর্বিবেচনা ক'রে যা কর্তব্য করতে পারবেন।"

"কিন্তু, দুর্গাভাইজী, আমি যে ওদের কথা দিয়েছি—"

"সে কথার কি এখন কিছু দাম আছে, ত্রিপাঠীজী? আজ বাদে কাল আপনি বা আমি মন্ত্রীসভায় থাকব কি না তার নিশ্চয়তা নেই।

আবার আপনি হয়ত মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসবেন। ব্যাপারটা কিছুদিনের জন্যে স্থগিত থাকলে ক্ষতি হবে না। অন্তত আমার ত তাই মত। আপনি অবশ্যি কোশলজীকে ব'লে দেখতে পারেন।"

"কোশলজীকে ব'লে কিছু লাভ নেই। আপনি যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তখন দেখছি আর কিছু করার নেই।"

"কসুর মাপ করবেন।"

"না, না। তারপর, ব্যাপার কেমন দেখছেন?"

"কোন্ ব্যাপার?"

"এই মন্ত্রীসভার?"

"আমি আর দেখছি কৈ? দেখছেন, দেখাচ্ছেন ত আপনারা!"

"আপনি কি সত্যি উদয়াচলের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে রাজী নন?"

"রাজী না-রাজীর কথা নয়, ত্রিপাঠীজী। যোগ্য নই।"

"তা হ'লে কোশলজীকে হারাবার উপায় রইল না।"

"আমার মতে, ত্রিপাঠীজী, কোশলজী হারবার পাত্র নন।"

"আপনাকে পেলে আমরা ওঁকে হারাতে পারতাম।"

"তাতে আপনাদের জয় হ'ত: আমার নয়।"

"আপনি শেষ পর্যন্ত কোশলজীকেই সমর্থন করবেন?"

"না। আমি কাউকে সমর্থন করব না।"

"আমার একটা অনুরোধ আছে, দুর্গাভাইজী।"

"বলুন।"

"একজনকে আপনার কাছে পাঠাতে চাই। আপনি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন?"

"কাকে?"

"একজন মহিলাকে।"

"মহিলা? কে তিনি?"

"তিনি একজন নামকরা শ্রমিক-নেত্রী। উদয়াচলের আই. এন. টি. ইউ. সির জেনারেল সেক্রেটারী।"

"ও। সরোজিনী সহায় ?"

"জী।"

"আমার কাছে তাঁর কি কাজ ?"

"তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।"

"আজকাল আমার সময় বড় কম। কি ব্যাপারে দেখা করতে চান জানলে ভাল হ'ত।"

"দুর্গাভাইজী, সরোজিনী সহায় উদয়াচলের রাজনীতিতে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় কাজ করবে। এ আমার ভবিষ্যদ্বাণী নয়। তার সঙ্গে আলাপ করলে আমার কথার সত্যতা আপনি যাচাই করতে পারবেন।"

দুর্গাভাই কিছুক্ষণ নীরবে ভাবলেন। এই মেয়েটিকে পর্শু রাত্রে একবার তিনি দেখেছেন। বাক্যালাপ করেন নি। এর সম্বন্ধে এদিক ওদিক অনেক কথা কানে এসেছে। একবার কথা বলে দেখলে মন্দ হয় না।

"বেশ। তাঁকে পাঠিয়ে দেবেন।"

"কখন ?"

"কাল কোনও সময়ে।"

"কাল সরোজিনী কানপুর যাবে। আজ হ'লে ভাল হ'ত।"

"বেশ। আজ বিকেলে চারটের সময়।"

আহারান্তে দুর্গাভাই মেহতা বাগানে পাইচারি করছিলেন। মন সর্বদা অশান্ত। কোথায় যেন, সবকিছুর মধ্যে, মস্ত বড় ফাঁক আর ফাঁকি। আসলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে। দুর্গাভাই ইতিহাসের ছাত্র নন, কিন্তু পাঠ করেছেন সযত্নে দীর্ঘকাল ধরে জেলে, জেলের বাইরে। ভারতবর্ষের ধারাবাহিক কোনও ঐতিহাসিক পরিচয় নেই। সম্রাটদের কাহিনীর ঔজ্জ্বল্যে প্রজাদের চেনা যায় না। বড় বড় আলোকিত দীপমালার মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস অনন্ত-

প্রবাহিত অসীম গভীর অন্ধকার কাল-সমুদ্র। আমাদের চিন্তাধারায়ও, তাই, কালাতীত বিরাটত্ব আছে; বস্তুনিষ্ঠ, বাস্তবানুগ মননের স্বাক্ষর নেই। আমরা বাস্তবের চেহারা দেখতে রাজী নই, বাস্তব থেকে পালাবার ইচ্ছা আমাদের মজ্জাগত। তাই আমাদের মুখে যত সহজে নীতির ললিতবাণী উচ্চারিত হয় তত সহজে নীতি বাস্তবে পরিণত হ'তে চায় না। আমরা বৃহত্তের স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি, বড়র মাহাত্ম্য আমাদের সম্মোহিত ক'রে রাখে; ছোট ছোট কাজের সুচারু সম্পাদনে আমাদের ধৈর্য নেই, আগ্রহ নেই। কোনও কিছুতে আমাদের গভীর, আন্তরিক বিশ্বাস নেই। কোনও কিছু ভাল ক'রে পূর্ণ ক'রে সম্পূর্ণ করার আগ্রহ আমাদের নেই। অর্ধেক সফলতাতেই আমরা পরিতৃপ্ত; সব কিছু বিফলতার নির্লজ্জ ব্যাখ্যা দিয়ে আত্মতৃপ্তি পেতে আমরা সহজ-পটু।

পাঁচ বছরের মন্ত্রীত্বে দুর্গাভাই প্রতি পদে এ-সব দেখে এসেছেন। কোনও কিছুই কেন যেন পরিপূর্ণভাবে ক'রে ওঠা গেল না এ পাঁচ বছরে। নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ হ'ল, হাসপাতাল হ'ল; অথচ রুগীরা এখনও অচিকিৎসায়, বিনা চিকিৎসায় শত শত মরছে, ডাক্তাররা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে, রুগীর প্রতি তাদের প্রাণের দরদ নেই। শিক্ষকদের মাইনে বাড়ান হ'ল, কিন্তু শিক্ষার উন্নতি দেখা গেল না। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অমন সাধের বিদ্যামন্দিরগুলি ব্যর্থ প্রচেষ্টার করুণ সাক্ষী। বাঁধ তৈরী হ'লে তাতে ফাটল দেখা দেয়; নতুন তৈরী রাস্তা এক বছরে গর্তে গর্তে কুৎসিত হয়ে ওঠে; গোয়ালা ক্রমাগত দুধে জল মেশায়; ব্যবসায়ীরা খাদ্যে ভেজাল মেলায়।

দুর্গাভাই-এর ধারণা ভারতবর্ষের আসল অভাব চরিত্রের। চার হাজার বছরের একটানা বেঁচে থাকায় জাতির চরিত্রে দারুণ ঘুণ ধ'রে গেছে। অথচ তিনি নিজে দেখছেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দেশের ঘরে ঘরে চরিত্রের আশ্চর্য বিকাশ হয়েছিল। অত বড় আলো এত শীঘ্র কেন নিভে গেল দুর্গাভাই আর একবার এই

হতাশ প্রশ্নের জবাব খুঁজে ব্যর্থ হলেন। কোথায় যেন মস্ত ফাঁকি আত্মগোপন ক'রে আছে। স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই এত সহজে এমন লোভী হয়ে উঠলাম কি করে? আজ যে মন্ত্রীত্ব নিয়ে এমন এক জঘন্য লড়াই চলেছে, আমাদের মধ্যে এমন একজনও কেন নেই যিনি ক্ষমতা ত্যাগ করবার জন্যে নিঃসংকোচে প্রস্তুত! কেন আমিও পারছি না সবকিছু ছেড়ে দিয়ে গ্রামে গিয়ে জনসেবায় বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে? কিসের এই নিদারুণ মোহ—কোন্ সুরার এই অনির্বাণ নেশা?

দুর্গাভাইএর মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। শরীব অসুস্থ বোধ হ'ল। বাগানে কয়েকখানা চেয়ার পাতা ছিল। তিনি বসলেন। চিন্তায়, ভাবনায়, কাজের চাপে দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন।

মনোরমার দোষ নেই। সে চিরদিন চেয়েছে সুখ, মান, প্রতিপত্তি, অর্থ, বিলাসিতা। বড় লোকের ঘরে সুপাত্রেয় সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। জীবনে সকল ভোগ-বিলাসের নিশ্চিত অধিকার নিয়ে সে দাম্পত্য জীবন শুরু করেছিল। কিন্তু ভাগ্য তার জীবনকে অন্য পথে নিয়ে গেল। আমি নেমে গেলাম স্বদেশী করতে; তার জীবনে আরম্ভ হ'ল অনিচ্ছুক আত্ম-নির্যাতনের পালা। দারিদ্র, সংযম, ক্লেশ কোনওদিন যে চায় নি আমি দীর্ঘকাল তাই তার জীবনে বোঝাই ক'রে চাপিয়ে দিলাম। অন্য দেশ হ'লে মনোরমা স্বামী ত্যাগ ক'রে স্বকীয় জীবন বেছে নিত। ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দু সমাজে তা সম্ভব ছিল না। তাকে কেবল আমার জীবনের তিক্ত সহগামিনী হ'তে হয় নি, আমার সন্তানের জন্ম দিতে হয়েছে, যে-সন্তানদের, একমাত্র বসন্ত বাদে, সে তার নিজের অতৃপ্ত ক্ষুধার তপ্ত জ্বালা দিয়ে মানুষ করেছে।

গত পাঁচ বছরে মনোরমা অনেকাংশে তার প্রাচীন ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করেছে। পারে নি। মন্ত্রীর সামান্য বেতনের বেশি অর্থ তার হাতে পৌছয় নি। অন্য মন্ত্রীদের বিত্ত হয়েছে, অর্থ জমেছে,

বাড়ী হয়েছে, ছেলেরা বড় চাকরি পেয়েছে, ব্যবসা ফেঁদে প্রচুর রোজগার করছে ; অথচ দুর্গাভাই দেশাই দরিদ্র, তাঁর নিজের ঘর-বাড়ী নেই, সন্তানদের জন্যে তিনি কিছু করতে পারেন নি। এই পাঁচ বছরে মনোরমার সঙ্গে বোধকরি এক সপ্তাহও তাঁর সদ্ভাবে কাটে নি। এখন তার জিদ চেপেছে সে উদয়াচলের মুকুটহীন রাণী হবে! আমাকে মুখ্যমন্ত্রীর সিংহাসনে বসিয়ে সে তার আজীবন গৌরব-লোভ চরিতার্থ করবে। অথচ সে জানেও না, তার বোঝবার ইচ্ছে নেই, ক্ষমতা নেই, কেন আমি মুকুট হাতে পেয়েও মাথায় পরতে রাজী নই। এ-জীবনের পরিণত শেষ বছরগুলিতে এতকালের সংরক্ষিত একমাত্র সম্বলটুকু লোভে পড়ে আমি হারাতে রাজী নই।

বাগান থেকে ঢালু রাস্তার নীচ পর্যন্ত অনেকখানি দেখা যায়। দুর্গাভাই হঠাৎ দেখতে পেলেন বেশ দূরে একটি লোক উঠে আসছে। আগন্তুকদের বেশির ভাগ আসে হয় মোটর গাড়িতে, নয় সাইকেল রিক্শায়। পায়ে হেঁটে আসে সাধারণত কুলি-মজুর, চাকর-বাকর। চাপরাশীরা আসে সাইকেলে, যতক্ষণ পারে সাইকেল চালিয়ে, তারপর সাইকেল টেনে তুলে। বাগানে ব'সে দুর্গাভাই অনেকবার দেখেছেন আরোহী-সহ সাইকেল-রিক্শা টেনে তুলছে ঘর্মাক্ত মানুষ, আরোহী নেমে গিয়ে তার ভার লাঘব করা বাহুল্য মনে করেছে। আজ যে লোকটি পায়ে হেঁটে পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে উঠে আসছে সে ভদ্রসন্তান। পরণে পায়জামা, সার্ট, জবাহর-কোট। উঠে আসছে মাথা নীচু করে, পিঠ বেঁকে, একটানা পায়ের পর পা এগিয়ে। অপরাহ্নের রোদ পড়েছে সারা রাস্তায় ; আকাশ নেমে এসেছে রাস্তার শেষে। নীল আকাশের পটভূমিতে বাঁকা উঁচু পথে লোকটির উঠে-আসা দেখতে দুর্গাভাইএর কেমন ভাল লাগল। মনে হ'ল, মানুষ বুঝি এমনি জীবন-পথে উঠে আসে, নিজের আনন্দিত পরিশ্রমে নীল আকাশের উদার অসীমকে পটভূমি ক'রে।

সমস্ত উঁচু পথে উঠে এসে লোকটি ক্লান্ত হয়ে খানিক দাঁড়াল; বাংলো থেকে তখনও সে প্রায় আধ ফার্লং দূরে। দু'-চার মিনিট দম নিয়ে আবার সে এগোতে লাগল। হঠাৎ থেমে তাকাল গাছের ডালে। বুঝি-বা দেখল কোনও গান-গাওয়া পাখী। রইল দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ। আবার এগোতে লাগল। আবার থামল। ছোট্ট এক প্রায়-উলঙ্গ ছেলে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে কি যেন বলল। পকেট থেকে কি যেন বার ক'রে দিল তার হাতে। নিশ্চয় পয়সা। এবার বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এল। থামল এসে একেবারে বাড়ীর দরজায়। ফাটক খুলে ঢুকতে যাবে এমন সময় নজর পড়ল বাগানে চেয়ারে গা এলিয়ে-বসা দুর্গাভাই-এর ওপর। বিব্রত হয়ে থমকে দাঁড়াল।

দুর্গাভাই বললেন, "চন্দ্রপ্রসাদ যে। এস, এস।"

ফাটক বন্ধ ক'রে চন্দ্রপ্রসাদ এগিয়ে এল। দুর্গাভাই-এর হাঁটু স্পর্শ ক'রে প্রণাম জানাল।

"তারপর? পায়ে হেঁটে যে?"

"আমি ত পায়েই হাঁটি, কাকাবাবু।"

"তাই নাকি? দুর্গাভাই হেসে ফেললেন। "মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রও পায়ে হাঁটে, এটা খবর বটে।"

"কাকাবাবু, আমি পায়ে হাঁটি, আবার পাখায় উড়িও।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। তুমি ত পাইলট।"

"আপনার শরীর সুস্থ আছে ত, কাকাবাবু? অনেকদিন পরে আপনাকে এমন একা দেখতে পেলাম।"

"শরীরের কথা এ-বয়সে না তোলাই ভাল। একটু আগে হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল। তাই এসে একটু বসেছি।"

"আপনাদের মাথা, কাকাবাবু, তাই সময়-অসময়ে এক-আধটু ঘোরে। আমি যদি মন্ত্রী হ'তাম আমার মাথা দিনরাত বনবন ক'রে ঘুরত।"

“তুমি যাঁর পুত্র, তাঁর মাথা কদাচ ঘোরে না।”

“পিতাজীর কথা বলছেন, কাকাবাবু?”

“উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলছি।”

“তাঁকে ত আমি চিনি না, কাকাবাবু। তাঁকে আপনি, আপনারাই চেনেন।”

“তুমি তাঁকে চেন না?’

“না। আমি আমার পিতাজীকে এক-আধটু চিনি। এবং তাঁর মাথা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মাথা ভগবান আমায় দেন নি।”

“তাই নাকি? বসো, বসো। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে। হাল্‌কা কথা, হাসির কথা আজকাল শুনতেই পাই না।”

“মন্ত্রীরা বুঝি হাসেন না, কাকাবাবু?”

“নিশ্চয় হাসেন। দেখ না, আমি তোমার কথা শুনে কেমন হাসছি।”

“আমিও বন্ধুদের তাই বলি। বলি, মন্ত্রীরা শুধু হাসেন না, হাসানও।”

“কাদের?”

“অপরাধ নেবেন না, কাকাবাবু।”

“আচ্ছা!” হেসে ফেললেন আবার দুর্গাভাই।

“তোমরা সবাই আমাদের নিয়ে হাস?”

“না, কাকাবাবু, কখনও না। আপনি আমাদের নমস্য।”

“সর্বনাশ! তোমাদেরও।”

“কাকাবাবু, দেবতাদের দুরবস্থা দেখুন। চোরও যদি পূজা দেয়, ঠেলতে পারেন না। আপনি আমাদের যতই অযোগ্য মনে করুন, নমস্য না হবার অধিকার আপনার নেই।”

“আচ্ছা, আচ্ছা। মানলাম। তা, বল দেখি ব্যাপার-স্যাপার চলছে কেমন?”

"আমার? যেমন চিরদিন চ'লে আসছে। পায়ে হেঁটে।"

"আর আমাদের?"

"ঝড়ের বেগে।"

"তাই নাকি? আমি ত ঝড় দেখতে পাচ্ছি .ন।"

"ঝড় ত আছেই, কাকাবাবু। তবে মহীরুহ উৎপাটিত হচ্ছেন না।"

"ঠিক বলছ?"

"কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে তাঁর প্রতিপক্ষ চেনে না। তিনি ভাঙ্গবেন, কিন্তু নত হবেন না।"

"এবার তিনি ভাঙ্গবেন বলেও তো মনে হচ্ছে না।"

"আপনার আন্দাজের সঙ্গে আমার আন্দাজ মিলে যাচ্ছে কাকাবাবু!"

"তবু আমি মনে করি কোশলজী ঠিকপথে যাচ্ছেন না।"

"কেন?"

"আমি যদি তাঁর অবস্থায় পড়তাম, মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পর হাই কমাণ্ডকে জানাতাম, হয় একেবারে নিজের পছন্দমত নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের অনুমতি চাই, নয়ত মুখ্যমন্ত্রীত্বে আমার প্রয়োজন নেই।"

"এ পরামর্শ পিতাজীকে আপনি দিয়েছিলেন, কাকাবাবু?"

"দিয়েছিলাম। কংগ্রেস-সভাপতি যখন বিলাসপুরে এসেছিলেন, তখন।"

কি বললেন তিনি।"

"যা চিরদিন আমায় বলে এসেছেন। আমার আদর্শবাদ তিনি শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু রাজনীতি আমি বুঝি না।"

"আপনার সঙ্গে আমার এ বিষয়ে মিল আছে। রাজনীতি আমিও বুঝি না, কাকাবাবু।"

"তোমার ভাই-রা ত বেশ বোঝে।"

"তারা বুদ্ধিমান। আমার ও পদার্থের কিঞ্চিৎ অভাব"

"তোমার মাতৃদেবী কেমন আছেন, চন্দ্রপ্রসাদ?"

"সুস্থ আছেন, কাকাবাবু। কাল সকালে কাশী যাচ্ছেন।"

"কাশী? হঠাৎ?"

"আজ দুপুরে পিতাজীকে পদত্যাগের অনুরোধ করেছিলেন।"

"কিসের?"

"মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করার। ভোটে জিতে, মুখ্যমন্ত্রীত্ব অন্য কাউকে দেবার।"

"তাই নাকি? তারপর?"

"পিতাজী রাজী হন নি।"

"তাই ভাবীজী কাশী যাচ্ছেন?"

"জী, কাকাবাবু।"

"তোমার মাতৃদেবী মহাপ্রাণা, চন্দ্রপ্রসাদ।"

"আমিও তাই মনে করি, কাকাবাবু।"

"সঙ্গে কে যাচ্ছে?

"বাড়ীতে বেকার একমাত্র আমি। আমিই যাচ্ছি।"

"বেশ করছ। তুমি পুত্রের কাজ করছ।"

"মা আপনাকে একখানা পত্র দিয়েছেন।"

"পত্র? আমাকে? দাও।"

"আমি ভেতরে যেতে পারি, কাকাবাবু?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। যাও, ভেতরে যাও। তোমার কাকীমা বোধকরি দিবানিদ্রা দিচ্ছেন। কিন্তু বসন্ত আছে। যাও।"

চন্দ্রপ্রসাদ বাড়ীর ভেতরের দিকে পা বাড়াল। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "কাকাবাবু, আপনি একমাত্র মন্ত্রী, যাঁর বাড়ীর দরজায় পুলিস পাহারা নেই। অর্থাৎ আপনি কারাবন্দী নন। মুক্ত মানুষ। আমাদের মত লোফাররাও বিনা বাধায় আপনার বাড়ী ঢুকতে পারে। আর যে-কেউ যখন খুশি বাড়ী থেকে বাইরে যেতে পারে।"

দুর্গাভাই দেশাই মৃদু হাস্যে একবার তাকালেন। পরক্ষণে, পদ্মাদেবীর পত্রে মনোনিবেশ করলেন।

দেখতে পেলেন না, মনোরমা বাড়ীর অন্যতম ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে বসলেন। চম্‌কে উঠলেন, গাড়ি যখন ষ্টার্ট নিল। গাড়ি দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হ'ল। দুর্গাভাই জানতে পেলেন না মনোরমা কোথায় গেলেন। জানবার ইচ্ছেও হ'ল না।

পদ্মাদেবীর পত্র সংক্ষিপ্ত। পড়তে দু'মিনিট লাগল। লিখেছেন, "মাননীয় দুর্গাভাইজী, চন্দ্রপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে আমি কাল প্রাতে ৺বারাণসী যাচ্ছি। কিছুদিন থাকবার ইচ্ছে। হয়ত আর নাও ফিরতে পারি। পবিত্র কাশীধামে মরতে পারলে বিশ্বনাথের চরণে স্থান পাব। যাবার আগে ওঁকে আমার শেষ অনুরোধ জানিয়েছিলাম। উনি রাখতে পারেন নি। ওঁর ভার আমি ভগবানের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। আর কিছুটা আপনার ওপর। দেখবেন, এত বড় মানুষটা যেন অনেক নীচে না নেমে যান।

আপনাকে আমার আর একটি অনুরোধ আছে। আমার পুত্রদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে দুর্গাপ্রসাদ আর চন্দ্রপ্রসাদের। দুর্গাপ্রসাদ অন্য পথ বেছে নিয়েছে। চন্দ্রপ্রসাদ বিমান বিভাগে কাজ পেয়েছে। পিতার কোনও সাহায্য না নিয়ে নিজের যোগ্যতায় সে মানুষ হ'তে চাইছে। সে যদি কোনও প্রার্থনা নিয়ে আপনার দরবারে হাজির হয়, তাকে নিতান্ত অযোগ্য মনে না করলে, অনুগ্রহপূর্বক ব্যর্থ করবেন না।"

পনের

বিলাসপুর শহরের কোন সহজ-পরিচয় কেন্দ্রস্থল নেই, যেমন আছে কলকাতার চৌরঙ্গী, বোম্বাই-এর চার্চ-গেট, নতুন দিল্লীর কনট প্লেস। যে-অংশে ঐতিহাসিককালে মারাঠা দুর্গ, তার মাইলখানেক দূরে পুরাতন বাজার। হাল আমলে আর এক বাজার-বিপনি কেন্দ্র গ'ড়ে উঠেছে সদর-অঞ্চলে, এখানটা শহরের ফ্যাশান-পাড়া। অর্থাৎ চমকপ্রদ দোকানপাট এ অঞ্চলে। এখানকার বড় রাস্তার নাম এক কালে ছিল সদর রোড; স্বাধীনতার পরে হয়েছে লিবার্টি রোড। এ রাস্তায়ই লিবার্টি সিনেমা। সিনেমার ডানদিক্ দিয়ে কিছু পথ এগোলে এক সারি কতকগুলি দোকান—রেডিও, বই, দর্জি, কাপড়-জামা ইত্যাদির। এই দোকানগুলির সামনে দিয়ে বেরিয়েছে আর একটা গলি ভেতরের দিকে। এ গলির প্রান্তদেশে "মর্ণিং টাইম্‌স্" পত্রিকার দপ্তর এবং ছাপাখানা।

বাড়ীটা খুব সাধারণ। একতলা একটানা বাড়ী। টালির ছাদ। মেঝে মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গিয়ে দাঁত-বার-করা মাটির কুৎসিৎ ভেংচানি। বাড়ীটা এককালে ছিল মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ঘরগুলি পর-পর পাশাপাশি। প্রথম ঘরে বিজ্ঞাপন-ম্যানেজার, অ্যাকাউন্টেন্ট এবং সার্কুলেশন ম্যানেজার একসঙ্গে। দ্বিতীয় ঘর সম্পাদক সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের। তৃতীয় ঘরে দু'জন সহকারী সম্পাদক এবং সম্পাদকের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী। চতুর্থ ঘর রিপোর্টারদের। পঞ্চম ঘরখানা সবচেয়ে বড়ঃ এখানে সাব-এডিটরদের দপ্তর। টেলিপ্রিণ্টর মেশিনের অবিরাম আওয়াজ। তারপরে ছোট্ট অন্ধকার একটুকরো ঘরের মধ্যে দিয়ে পেছনের দিকে ছাপাখানায় যেতে হয়। ছাপাখানায় একটা লাইনো মেশিন এবং অনেকগুলি হাতে-ছাপার কেস। 'মর্নিং টাইমস' লাইনো ও হাতে-ছাপার মিশ্রিত

উৎপাদন। রোটারী নেই, বড় দুটো ইলেক্‌ট্রিক ফ্ল্যাট মেশিনে কাগজ ছাপার ব্যবস্থা। মুখ্যমন্ত্রীর কাগজ হ'লেও 'মর্ণিং টাইমসের' প্রচার মাত্র সাত হাজার। রোটারীর প্রয়োজন হয় না।

কাগজের পরিচালনার জন্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে-ব্যবস্থা করেছিলেন তাকে ত্রুটিহীন বলা চলে না। আইনত 'মর্ণিং টাইমসের' মালিক অম্বিকাপ্রসাদ কোশল। ম্যানেজিং এডিটর হিসেবে রোজ কাগজে তাঁর নাম বেরোয়। ম্যানেজারদের ঘরে তার জন্যে নির্দ্দিষ্ট টেবিল চেয়ারও আছে। কিন্তু কার্যত অম্বিকাপ্রসাদ কাগজের জন্যে কিছুই করে না। সম্পাদকীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার যোগ্যতা তার নেই। লেখার ব্যবসা সে বোঝে না। মাসে দু-একদিন কিছুক্ষণের জন্যে সে আসে, চ্যাটার্জির ঘরে বসে গল্প করে, চা খায়; ম্যানেজার দের সঙ্গে দু'চারটা কথা ব'লে বিদায় নেয়। কখনও-সখনও টাকার বিশেষ প্রয়োজন হ'লে তার দেখা পাওয়া যায়। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আদেশ আছে তাকে কাগজের ম্যানেজিং এডিটর হিসেবে মাসে দু' শ টাকা পর্যন্ত দেবার। কিন্তু কোনও মাসেই সে পুরো টাকা নেয় না।

সম্পাদকীয় দায়িত্ব পুরো সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাকে কাগজ চালাবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। সপ্তাহে একদিন সুভাষ তাঁর সঙ্গে দেখা করে। কাগজ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রাদেশিক রাজনীতির ব্যাখ্যা করেন। কি কি বিষয়ে কিভাবে সম্পাদকীয় লিখতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে দেন। বড় কোনও সংবাদ থাকলে সুভাষকে ডেকে পাঠান। একজন রিপোর্টার সীতাচরণ পণ্ডিত, সর্বদা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নির্দিষ্ট নীতির চতুঃসীমানায় কাগজের দৈনন্দিন পরিচালনার দায়িত্ব পুরোপুরি সম্পাদকের। সম্পাদকীয় বিভাগে নিয়োগ, বেতন-বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়েও সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের কথাই মেনে চলা হয়।

সম্পাদনার বাইরে কাগজের সত্যিকারের পরিচালনার ভার জগন্মোহন তিওয়ারীর। নিউজ প্রিণ্ট কেনা, ব্যবসাদারদের সঙ্গে সংযোগ করা, বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা, ছাপাখানার নানা সমস্যা সমাধান: সবই তিওয়ারীকে করতে হয়। এই আশ্চর্য কর্মক্ষমতাবান্ মানুষটি রোজ একবার "মর্ণিং টাইমস" দপ্তরে আসে। তার জন্য কোনও নির্দিষ্ট বসবার স্থান নেই। সে ঘরে ঢুকলেই তু'জন ম্যানেজার চেয়াব ছেড়ে দেয়। কখনও সে বসে বিজ্ঞাপন ম্যানেজারের চেয়ারে, কখনও বা সার্কুলেশন ম্যানেজারের। সেখানকাব কাজ সেরে সোজা চলে যায় ছাপাখানায়। ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে বিদায় নেবার পথে সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, "এডিটব সাহেব, কোনও সেবা করতে পারি কি ?" সুভাষের কোনও কিছু বলবার থাকলে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে। "সমস্যা"ব সমাধানে তিওয়ারী যাতুকর। লাইনো মেশিনের মেরামত দরকার— কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মিস্ত্রী এসে হাজির হয়। নিউজপ্রিণ্ট মাত্র তিনদিনের আছে—তৃতীয় দিনেই নতুন সাপ্লাই এসে হাজির। কোনও সাব-এডিটর এ্যাডভান্স কিছু টাকা চায় অথচ ক্যাশিয়ারের কাছে টাকা নেই ; মণিব্যাগ থেকে তিওয়ারী টাকা বার করে দেয়। যদি-বা কখনও এমন কোনও সমস্যা দেখা দেয় যা তার সমাধানের বাইরে, সে বলে, "কোশলজীর সঙ্গে কথা বলে আপনাকে কাল জানাব" ; এবং কাল সাধারণত পর্শু হয় না।

তিওয়ারীর মত কর্মঠ, বিশ্বস্ত ও অনুগত সেবক সচরাচর দেখা যায় না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ছাড়া তার জীবনে আর কিছু নেই। কোনও দিন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সামান্য সমালোচনাও কেউ তার মুখে শোনে নি। তাঁর প্রশংসা করবারও প্রয়োজন হয় না জগন্মোহন তিওয়ারীর। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই যেন তার মনে জাগে না ; নিঃপ্রশ্ন নিরুত্তর আনুগত্যে তাঁর সেবাতেই সে পরিতৃপ্ত।

জগন্মোহন তিওয়ারীর যে স্ত্রীপুত্রপরিবার বাড়ীঘর কামনা-

বাসনা-ব্যথা-আনন্দ আছে একমাত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ছাড়া আর কারুর মনে বোধকরি তা উদয়ও হয় না। সুভাষ চট্টোপাধ্যায় মাঝে মধ্যে তাকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে গিয়ে বোবা জবাব পেয়ে নিরস্ত হয়েছে ; নিজের কোনও কথাই যেন তিওয়ারীর বলার নেই, অনুভব করার নেই। ভোর সকালে সে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের গৃহে হাজির হয় ; প্রভাতে গাত্রোত্থান ক'রে বাইরে এসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেখতে পান সে হাজির ; রজনীর অর্ধেকের বেশি প্রায় তার কাটে মুখ্যমন্ত্রীর কাজে, সেবায়, না-হয় আদেশের অপেক্ষায়। সকাল বেলা যেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জগন্মোহন তিওয়ারী নামক মনুষ্য-যন্ত্রের দেহে দম লাগিয়ে দেন ; দীর্ঘ-অগ্রসর রাত্রি পর্যন্ত তাঁর হাতে দম দেওয়া যন্ত্র একটানা চলে।

সেদিন অপরাহ্নে সুভাষ চট্টোপাধ্যায় নিজের ঘরে টেবিলে বসে টাইপ-রাইটারের ওপর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখছিল। এ কাজ তাকে রোজ করতে হয়, এবং রোজই করবার সময় সে অন্য-মানুষ হয়ে যায়। দেশের বা বহির্দেশের নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে তার নিজের ধ্যানকে বহুজনের মনে সঞ্চারিত করবার সময় আপনার বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেচনার দৈন্যের সঙ্গে কর্তব্যের অলঙ্ঘনীয় দাবি মিশে গিয়ে এক অনধিগম্য অনুভূতি সৃষ্টি করে। কেবল মনে হয়, আমার এমনকি যোগ্যতা আছে, যে নিজের বিচার বহুমানসে ব্যাপ্ত করতে যাচ্ছি ? আজ যা লিখছি, ছাপার অক্ষরে সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত অবয়বে সে ত আমার বক্তব্য নয়, একখানা পত্রিকার মন্তব্য। কয়েক হাজার মানুষ তা পড়বে, তাদের চিন্তাধারা তার দ্বারা প্রভাবিত হবে : এই প্রভাব বিস্তারের যোগ্যতা কি আমার আছে ?

আজও প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে একই সন্দেহ সুভাষের মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছিল। নিত্যকার এ ভাব তার সহনীয় হয়ে গেছে ; এ ভারটুকু আছে বলেই, সে জানে, তার সম্পাদকীয় পাঠকের মন স্পর্শ করে। আশ্চর্য, এ ভারটুকু সর্বাগ্রে যিনি টেব

পেয়েছিলেন, তাঁর নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। সুভাষ তখন সবেমাত্র "মর্ণিং টাইম্‌সে"র সম্পাদনা গ্রহণ করেছে। প্রথম সম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে অন্তরে সে এ গুরুভার সর্ব-প্রথম টের পেয়েছে। যে-সব পাঠকদের সে চেনে না, জানে না চেনবার জানবার কোনও উপায় পর্যন্ত নেই, অথচ যাদের সঙ্গে প্রতিদিন সকালে তার নৈর্ব্যক্তিক পরিচয় অনিবার্য, তাদের কাছে তার কুমারী নিবন্ধ দিয়ে সে জবানবন্দী রচনা করেছিল। সম্পাদকীয়ের নাম দিয়েছিল, "এ পেপার এ্যাণ্ড দি পিপল"—পত্রিকা ও জনসাধারণ। লিখেছিল "সংবাদপত্রের কর্তব্য পাঠকদের কাছে রোজকার দেশ-বিদেশের সংবাদ পৌঁছে দেওয়া। সম্পাদকের কর্তব্য নির্দিষ্ট ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা; দেশ-বিদেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা। এ আলোচনা সম্পাদক ও পাঠকের মধ্যে দৈনন্দিন ভাব আদান-প্রদানের সেতু। পত্রিকার মন্তব্য কোনও ব্যক্তি-বিশেষের মন্তব্য নয়; তার মূল্য প্রতিষ্ঠানিক। সম্পাদকের এমন কোনও অবধারিত ক্ষমতা নেই যা তাকে বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল পাঠকের ঊর্ধে আসন দিতে পারে। দুনিয়াদারীর সঙ্গে বুদ্ধিগত, পেশাগত পরিচয় তার বেশি ব'লে সে হয়ত কোনও কোনও বিষয়ের তাৎপর্য বেশি বোঝে; কিন্তু পাঠক-মন প্রভাবিত করবার সময় সর্বদা প্রতি ছত্রে সে নম্র বিনয়ে মার্জনা চেয়ে থাকে। ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে নিত্য নতুন সমস্যার সঙ্গে নবগঠিত দেশীয় সরকারের অবিরাম সংঘাত, যেখানে অনভ্যাসে অলস মানুষকে প্রতিদিন নতুন নতুন দেশী-বিদেশী ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হয়, সংবাদপত্র সম্পাদক কামনা করে পাঠকের সঙ্গে নিবিড় কথোপকথন, সম্পাদকীয় স্তম্ভকে জনসভার মঞ্চে পরিণত ক'রে বক্তৃতার সন্দেহজনক আত্মপ্রীতি নয়।"

পরের দিন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সঙ্গে দেখা করতে গেলে প্রথমে দু'-চারটে কুশল প্রশ্নের পর তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "সাহিত্য কর নাকি?"

"আজ্ঞে না।"

"বাঙ্গালী মাত্রেই ত কবি বা সাহিত্যিক। তুমিও নিশ্চয় ছোটবেলা কবিতা লিখতে। হয়ত এখনও লিখে থাক।"

"এখন আর লিখি না।"

"তোমার সম্পাদকীয় পড়লাম। বেশ লাগল। লিখতে বসে বুকে ব্যথা করছিল, না?"

"আপনি টের পেয়েছেন?"

"তা একটু পেয়ে গেলাম। ওটার সঙ্গে আমারও পরিচয় আছে।"

"জানি। আপনার কবি-খ্যাতি অজানা নয়।"

"খ্যাতিটা অনেকে জানে। ব্যথার খবর বড় কেউ রাখে না।"

"সৃষ্টির মধ্যে বেদনা ত থাকবেই।"

"তোমার বিনয় দেখে খুশি হ'লাম। সম্পাদকীয়ই লেখ, বা সাহিত্য-কাব্য রচনা কর, সৃষ্টির মধ্যে যেন সর্বদা বিনয় থাকে। আমাদের উপনিষদের ঋষিরা বলেছেন, যাঁরা মনে করে আমরাই ধীমান, আমরা সব জেনে বসে আছি, তোমরা আমাদের কথা সসম্মানে শোন আর মান্য কর, তারা আসলে অজ্ঞান ও অবিদ্যায় অন্ধের দ্বারা চালিত হয়ে অন্ধের ন্যায় পরিভ্রমণ করে।"

"রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও এর অভিব্যক্তি দেখতে পাই। একটু শুনবেন?"

"নিশ্চয়। বল। বুঝব না পুরো। তবু তাঁর কবিতা শুনতেও ভাল লাগে।"

সুভাষ বলেছিল:

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "না। ইংরেজীতে অর্থ বলে দিয়ো না। আর একবার ধীরে ধীরে বল। আমি বুঝতে পারব।"

দ্বিতীয়বার শুনে, "অতি বড় কথা। 'তোমার আসন গভীর অন্ধকারে'। বাঃ! এমন কথা আর কেউ বলেন নি। হাঁ, তুমি মাঝে মাঝে আমাকে রবীন্দ্রকাব্য পড়ে শুনিও।"

"আপনার সময় হবে?"

"সময় করে নেব। আমরা রাজনীতি করবার সময় দুর্বিনীত, আত্মতৃপ্ত, দাম্ভিক ও ক্ষমতামত্ত হয়ে উঠি। আমি যদি সম্পাদকীয় লিখতে বসি, তা হ'লে, তুমি যা বলেছ, তাই হবে—মস্ত এক বক্তৃতা দিয়ে বসব। কিন্তু, ভগবানের কৃপায়, রাজনীতি আমার সবটুকু সত্ত্বা গ্রাস ক'রে বসে নি।"

"সে আপনার সৌভাগ্য।"

"সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য জানি নে। মাঝে মাঝে মনে হয়, দারুণ দুর্ভাগ্য। বয়স বাড়লে বুঝবে খণ্ডিত সত্ত্বা নিয়ে জন্মানোর জ্বালা কি ভয়ানক। আমার মধ্যে যে-মানুষটা রাজনীতি করে, শিল্পী তাকে সর্বদা ব্যঙ্গ করে, ভর্ৎসনা ক'রে তার দৈন্য দেখিয়ে দেয়। আর শিল্পী যখন একটু অবসর পেয়ে সৃষ্টির মোহে মগ্ন হ'তে চায়, রাজনৈতিক এসে তার পিঠে দারুণ কশাঘাত হানে।"

"দেশের লোক আপনার দু' পরিচয়কেই মান্য করে।"

"এ মান্য-করার মধ্যে অনেক ফাঁকি আছে, সুভাষবাবু। বহু বছর রাজনীতি করছি—এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। একদিন যা স্বপ্নেও ভাবি নি, আজ তাই হয়েছি—একটা সমগ্র প্রদেশের ভাল-মন্দের দায়িত্ব নিয়ে বসে গেছি। যে-আত্মসন্দেহ সম্পাদকীয় রচনার সময় তোমাকে ভারাক্রান্ত করে, আমাকেও অনেক সময় সে পেয়ে বসে। দেশশাসনের জন্য আমরা ত কেউ নিজেদের তৈরী করি নি। স্বদেশী করেছি দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করতে; একদিন যে তার অগ্রগতির কর্ণধার হ'তে হবে এমন কথা

কখনও মনে হয় নি। আজ শাসন করতে গিয়ে প্রতি পদে নিজের দীনতা বুঝতে পারি। আপশোষ হয়। লেখাপড়ায় এমন ফাঁক রয়ে গেছে, অনেক সমস্যার প্রকৃত অর্থই যেন বুঝতে পারি নে। মনে হয়, যা করছি তা ঠিক করছি তো? প্রতিদিন প্রকাশ্যে সবাকার কাছে নিজের দুর্বলতা ঢাকতে ঢাকতে, প্রতিটি কাজকে সবচেয়ে ভাল ব'লে জাহির করতে করতে একদিকে যেমন আত্ম-সমালোচনার সময় পাই নে, অন্যদিকে সংক্ষিপ্ত নিরালা মুহূর্তে সংশয়, সন্দেহ যেন জমাট অন্ধকারের মত মনে চেপে বসে। জান সুভাষ বাবু, রাজনীতির খেলা চলে শকুন্তলার আংটির জোরে। এ বস্তুটি যে কি তা জানবার জো নেই। যতক্ষণ সঙ্গে আছে, সবাই তোমায় চিনবে, মানবে, ভয় করবে, শ্রদ্ধা করবে। একবার হারাল ত তুমি একেবারে তলিয়ে গেলে। তখন আংটি ফিরে পেলেও আর নিতে নেই। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম' পড়েছ? মনে আছে শেষ দৃশ্যে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুনঃ পরিচয়ের কাহিনী। দুষ্মন্ত বলছেন—এই আংটি পেয়ে তোমাকে মনে পড়ল, তোমাকে চিনলাম। এবার তোমার আঙ্গুলে এ শোভা পাক। 'তেন হি ঋতুসমবায়চিহ্নং প্রতিপদ্যতাং লতাকুসুমম।' লতার ফুল ঋতুরাজ বসন্তের সঙ্গে মিলনের চিহ্ন ধারণ করুক। কিন্তু শকুন্তলা আর আংটি স্পর্শ করতে রাজী নন। 'ণ সে বিস্সসেমি'—এ আংটিকে আমি আর বিশ্বাস করি না। যে-কথা কালিদাস পরিষ্কার বলতে পারেন নি তা হ'ল, 'আমি তোমাকেও আর বিশ্বাস করি না। তুমি আংটি হারিয়ে আমাকে চিনতে পার নি, আমি তোমার মনে নিজের গৌরবে অধিষ্ঠিত নই। তোমাকে আর আমার সেই কুমারী জীবনের নিটোল বিশ্বাস দিতে পারব না।' রাজনীতিতেও তাই। একবার আংটি হারাল ত বিশ্বাস গেল। পুনর্বার সে বিশ্বাস আর ফিরে আসে না।"

আজ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে বসে সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের শকুন্তলার আংটি মনে পড়ছিল। প্রবন্ধের বিষয় ছিল উদয়াচলের

রাজনীতি। সংগ্রামের সময় সুভাষ সাধ্যমত কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পতাকা তুলে ধরেছিল সংবাদপত্রের মাধ্যমে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সে শ্রদ্ধা করে; তার প্রতিপক্ষকে শ্রদ্ধা করবার কোনও কারণ সে খুঁজে পায় নি। সুতরাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পতাকা তুলে ধরায় তার অন্তরে ক্ষোভ ছিল না। চাকরির দাবি ছাড়া, আন্তরিক সমর্থনও তার ছিল। তথাপি বার বার মনে পড়ছিল কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরই মুখে শোনা শকুন্তলার আংটির ব্যাখ্যা। এবার কি তিনি আংটি হারিয়েছেন? লোকের আস্থা, শ্রদ্ধা, ভয় আর কি তাঁর আয়ত্তে নেই? প্রতিপক্ষ তাঁর নামে অনেক কুৎসা রটিয়েছে। তাঁর রাজত্বের অনেক দোষ, স্খলন, অন্যায় আজ জনসাধারণ জানতে পেরেছে। দুর্নীতি, দুরাচার, অত্যাচারের সুদীর্ঘ তালিকা পাঠান হয়েছে দিল্লীর দরবারে। এতেও কি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শকুন্তলার আংটি হারান নি? যদি তিনি সংগ্রামে জেতেন, যে আস্থা ও শ্রদ্ধা উদয়াচলে এতদিন তার প্রাপ্য ছিল, তা কি তিনি আর পাবেন? অথচ, কই, শকুন্তলার মত ত তিনি আংটি বর্জন করতে প্রস্তুত নন! খর্বিত জন-শ্রদ্ধা নিয়েও তিনি ক্ষমতায় আসীন থাকতে চান; ক্ষমতা ত্যাগের প্রশ্ন ত তাঁর মনে দানা বাঁধে নি।

সুভাষের মন একরকম ভাবছিল, মাথা আর হাত অন্যরকম লিখছিল, এমন সময় দ্বারপথে ধ্বনিত হ'ল, "এডিটর সা'ব, কোনও সেবা?"

সুভাষ তাকিয়ে দেখল, জগন্মোহন তিওয়ারী।

বলল, "আসুন, তিওয়ারীজী, বসুন। একটু কথা আছে।"

তিওয়ারী ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে বসল।

"আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে যে?"

তিওয়ারী কাজের কথার অপেক্ষায় নীরব রইল।

"খেয়েছেন?"

সেই একই নীরব অপেক্ষা।

"খবর চাই।"

"কোন খবর?"

"লড়াই-এর।"

"লড়াই কোথায়?"

"উদয়াচলে। বিলাসপুরে।"

"এ আবার লড়াই!"

"কোশলজার জয় নিশ্চিত?"

"নারায়ণ জানেন। আমি কি ক'রে বলব?"

"প্রতিপক্ষের খবর বলুন। কাগজে ছাপবার মত।"

"আমি ত রিপোর্টার নই।"

"কিন্তু আপনি যতটা জানেন, এ শহরে তত আর কেউ জানে না।"

তিওয়ারী সামান্য শুধু হাসল।

"কিছু নতুন হেড লাইনের হরফ চাই।"

"ছাপাখানায় শুনছিলাম। কি চাই বলুন।"

"সুভাষ ড্রয়ার থেকে একখানা কাগজ দিল।"

"কবে দরকার।"

"কালই।"

"বিজয়ের দিন। পেয়ে যাবেন।"

তিওয়ারী বিদায় নিলে সুভাষ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ শেষ করল। সেক্রেটারীকে ডেকে বলল, ছাপাখানায় পৌঁছে দিতে।

চেয়ার ছেড়ে সাব-এডিটরদের ঘরে যাবে এমন সময় দেখতে পেল তারই ঘরের বাইরে অম্বিকাপ্রসাদ।

"আসুন, অম্বিকাপ্রসাদজী। আসুন।"

"আপনার কাছে একটু দরকারে এসেছি, সুভাষবাবু।"

"আজ্ঞা করুন।"

অম্বিকাপ্রসাদ ম্লান হাসল। চেয়ারে বসতে বসতে বলল, "আজ্ঞা করার আমি কেউ নই, আপনি ভালই জানেন।"

এককাপ চা খাবেন ? আনতে বলি ?"

"বলুন। একটা সমস্যায় আপনার পরামর্শ চাই ?"

"আমার পরামর্শে যদি কাজ হয় নিশ্চয় দেব। ও বস্তুটি দিতে খরচ লাগে না।"

"আপনার কি মনে হচ্ছে ?"

"মুখ্যমন্ত্রীর বিষয়ে ?"

"হ্যাঁ।"

"আমার ত মনে হচ্ছে, চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

"অর্থাৎ, পিতাজী জিতবেন ?"

"আমার ত তাই বিশ্বাস।"

"বিশ্বাসের হেতু ?"

"অনেক। প্রথমত, সুদর্শন ত্রুবের নেতৃত্ব কেউ মানতে রাজী নন। তাঁর দল স্বার্থান্বেষীতে ভরা। এঁরা ইতিমধ্যেই নিজেদের মধ্যে কলহ শুরু করে দিয়েছেন। রাজনৈতিক পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে সুদর্শন ত্রুবে দল ধরে রাখতে পারবেন না। শুনছি, এ লোভ আপনার পিতাজীও দেখাচ্ছেন। খবর পেয়েছি, সুদর্শন ত্রুবের প্রধান সমর্থকদের কেউ কেউ এরই মধ্যে কোশলজীর দলে ফিরে এসেছেন। তাঁরা কেউ মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতে রাজী নন। তা ছাড়া, হাই কমাণ্ড বর্তমান সময়ে কোশলজীর মত নেতাকে ত্যাগ করবেন বলে মনে করতে পারছি না। উদয়াচলে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের নেতৃত্ব করবার মত যোগ্য লোক এখনও আর নেই।"

"কেন ? দুর্গাভাই মেহতা ?"

"তিনি ত নেতৃত্ব চান না।"

"সত্যি চান না, না তলে তলে নিজের আসন তৈরী করে নিয়েছেন ?"

"আমার মনে হয় সত্যি চান না বলা ঠিক হবে না। চান। তবে, দুর্গাভাই জানেন সুদর্শন ত্রুবের দল নিয়ে সুশাসন সম্ভব নয়।

দুর্গাভাই রাজনৈতিক সতীত্বে বড় বেশী বিশ্বাস করেন। নিজের সুনামটুকু তিনি কিছুতেই হারাতে চাইবেন না।"

"তা হ'লে আপনার বিশ্বাস দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

"কোশলজীর বিজয় সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। তবে দুশ্চিন্তার অন্য কারণ থাকতে পারে।"

"কি কারণ?"

"এই ধরুন, উদয়াচলে কংগ্রেসী মন্ত্রীত্বে এবার যে ভাঙ্গন ধরল তার পরিণাম কি হ'তে পারে। হেরে গিয়ে সুদর্শন দুবে যা করবে তাতে কংগ্রেসের আত্মশক্তি কতটা কমে যাবে। নতুন মন্ত্রীসভা গঠনে কোশলজীকে কি নীতি গ্রহণ করতে হতে পারে। তাঁর নেতৃত্বের এর পরে কি অবস্থা হবে। আরও অনেক প্রশ্ন দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করতে পারে।"

"এবার আপনাকে আসল ব্যাপারটা বলি। আপনি জানেন আমার চাকুরী পাবার ইতিহাস?"

"না।"

"এটুকু বুঝতে পারেন যে পিতাজীর জন্যেই আমার চাকুরি?"

"তাই যদি হয়ে থাকে আশ্চর্যের কিছু নেই।"

"নিজের যোগ্যতায় ল কলেজে পড়ানর কাজ আমি পেতে পারতাম না।"

"নিজের যোগ্যতায় এদেশে অনেকেই কাজ পায় না। অন্তত যাঁরা বড় মাইনের কাজ করেন।"

"তথাপি, আমার কর্মজীবন নিয়ে মনে বড় অশান্তি।"

"কর্মজীবনে শান্তি, আনন্দ, সার্থকতা এদেশে অধিকাংশের ভাগ্যেই জোটে না।"

"অনেকের কথা আমি জানি নে। নিজের কথা জানি। আমরা পাঁচ ভাই পাঁচ রকমের। আমার মাকে আপনি জানেন না। তাঁর মত ন্যায়নিষ্ঠ সত্যপরায়ণ স্ত্রীলোক বেশি নেই। পিতাজীকে

আপনি জানেন। উভয়ের চরিত্রের মিশ্রিত ছায়া আমাদের পাঁচ জনের মধ্যে। আমি মা'র কাছ থেকে পেয়েছি অশান্ত বিবেক, কিন্তু পিতাজীর পৌরুষ, আত্মবল আমার নেই। আমার পরের ভাই দুর্গাপ্রসাদই বাপ-মায়ের প্রকৃত পুত্র। সে নীচ জাতের বিধবা বিবাহ করে বামপন্থী রাজনীতির পথ চলতে চলতে পরিবার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। সূর্যপ্রসাদ পিতাজী আর মায়ের চরিত্রের দুর্বলতা নিয়ে তৈরী। শ্যামাপ্রসাদের ওপর মায়ের প্রভাব নেই— পিতাজীর কিছু আছে। আর সবচেয়ে ছোট চন্দ্রপ্রসাদ বাপ-মায়ের আদরের ছেলে, তার মধ্যেও বিদ্রোহ আছে, তবে সে কখনও রাজনীতি করবে না; তা ছাড়া পিতাজীকে সে অত্যন্ত ভালবাসে। এখন দেখুন, আমাদের ভাইদের মধ্যে মিল নেই একেবারে।"

"এমন অনেক পরিবারে দেখা যায় অম্বিকাপ্রসাদজী।"

"কলেজের কাজ পিতাজী আমায় করে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি আমাকে সর্বদা হেয় চোখে দেখেন। নিজের যোগ্যতায় দাঁড়াতে পারি নি ব'লে আমার ওপর তাঁর শ্রদ্ধা নেই। এই যে বিরাট্ সংকট যাচ্ছে, তাঁর কোনও কাজে আমার ডাক পড়ে নি। কোনও দয়িত্বই তিনি আমায় দেন নি।"

"রাজনীতি সবার আসে না। আসা ভালও নয়"

"চন্দ্রপ্রসাদকে তিনি অনেক কাজের ভার দেন। আমার সঙ্গে কোনও বিষয়ে আলোচনাও করেন না।"

"অম্বিকাপ্রসাদজী, আমাকে এসব কথা বলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে। কেন বলছেন, বুঝতে পারছি না।"

"এক্ষুণি বুঝবেন। আপনি পিতাজীর আস্থাভাজন। আপনাকে তিনি স্নেহ করেন। আমার একটা কাজ আপনাকে করতে হবে।"

"বলুন। নিশ্চয় করব।"

"পিতাজীকে আমার কথাগুলো বলতে হবে। যদি তিনি আমাকে জ্যেষ্ঠপুত্রের মর্যাদা না দেন তা হ'লে আমার পক্ষে ল

কলেজে কাজ করা আর তাঁর পরিবারে এক অন্নে বাস করা আর সম্ভব নয়। তা হ'লে আমি নিজেব ভাগ্য নিজেই দেখব।"

"একথা আমায় বলতে হবে?"

"বললে আমি কৃতজ্ঞ হব।"

"আপনি বলতে পারেন না?"

"না। কোনওদিন কোনও গুরুতর বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয় নি। আজ হঠাৎ একথা বলা সম্ভব নয়।"

"একথা বলবার একটা সুযোগ বার করতে হবে।"

"কিন্তু তাঁকে খুব শীঘ্র বলা দরকার।"

"কেন? এত তাড়া কিসের?"

"তাড়া আছে"

"চেষ্টা করব।"

"আপনি পরদেশী। আপনাকে অনেক কথা বলা চলে। আশা করি কিছু মনে করেন নি।"

"মনে করব কেন? বরং আপনি সমস্যায় পড়ে আমাকে বন্ধু বলে মনে করেছেন তাতে আনন্দ পেয়েছি। আমরা সাধারণ মানুষ। কিন্তু অম্বিকাপ্রসাদজী, সব মানুষের আসল সমস্যাই এক। আব, সব সমস্যার মধ্যে বিবেকের সমস্যা প্রধান।"

অম্বিকাপ্রসাদ একটু চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, সুভাষবাবু, তিওয়ারীকে আপনার কি মনে হয়?"

"কোশলজীর পরম অনুগত সেবক।"

"আর কিছু?"

"এছাড়া অন্য পরিচয় কিছু আছে নাকি?"

"একটা কথা আপনাকে বলি। তিওয়ারী আমার মা'র ছায়া পর্যন্ত মাড়াবার সাহস রাখে না।"

"কেন?"

"না, বলব না। বলা ঠিক হবে না।"

"তা হ'লে নিশ্চয় বলবেন না।"

"ওকে একটু সামলে চলবেন সুভাষবাবু।"

"তাই নাকি ?"

"পিতাজী মুখ্যমন্ত্রীত্বে পুনর্বার বহাল হবার পর, আপনাকে বলে দিলাম, আপনার কাগজের মালিক হবে জগন্মোহন তিওয়ারী। ম্যানেজিং এডিটর হিসাবে নাম বেরবে তারই।"

ষোল

সূর্যপ্রসাদ গাড়ি নিয়ে বেরোবার সময় ভেবেছিল যাবে বাল্যবন্ধু ললিতচরণ সিংহের বাড়ী। গাড়ীতে ব'সে মন বদলাল। গিয়ে উঠল আইন ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী সরিৎসাগর কোঠারীর বাড়ীতে।

সরিৎসাগর ছিলেন বিলাসপুর হাইকোর্টের নামকরা ব্যবহার-জীবী। ইচ্ছে করলে অনেকদিন আগে জজ হ'তে পারতেন। না হয়ে স্বদেশীতে নেমেছিলেন। নেমেছিলেন গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য হয়ে নয়, নিজের অন্তরের উত্তপ্ত দেশপ্রেমে।

সরিৎসাগর কোঠারীর মধ্যে যৌবন থেকে বিদ্রোহের বীজ নিহিত ছিল। বাপ লক্ষ্মণসাগর কোঠারী ধনী জমিদার হ'লেও উদারমনা ছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল সরিৎসাগর আই. সি. এস. হয়। তাই তাকে অক্সফোর্ডে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। ইতিহাসের ছাত্র সরিৎ-সাগর পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে স্ফূর্তিবাজিতেও সে-সময় অক্সফোর্ড ও লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল। তার স্ফূর্তিবাজিতে উত্তেজিত আনন্দের প্রতি আকর্ষণের চেয়ে হিন্দু সমাজের প্রাচীন বাধা-নিষেধ, সংস্কার-আদেশ ভাঙ্গার বিদ্রোহ প্রবল ছিল। মাংস, মাছ, ডিম প্রকাশ্যে খেত, পশ্চিমী নাচ নাচত উল্লাসে, শ্বেতাঙ্গিনী বান্ধবীর তার অভাব ছিল না। সে ফেবিয়ান সোসাইটির সভ্য হয়েছিল; ইণ্ডিয়া লীগে পাণ্ডাগিরি করত; অক্সফোর্ড য়ুনিয়নে গরম গরম বক্তৃতা। অথচ আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্যে তৈরীও হচ্ছিল। এমন সময় সুভাষচন্দ্র বসু আই. সি. এস. পাস করেও সিভিলিয়নত্ব বর্জন করায় ইংলণ্ডের ভারতীয় ছাত্রমহলে যে নিদারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল, দেখা গেল সরিৎসাগর কোঠারী তারও পুরোভাগে। আই. সি. এস. না দিয়ে সে ব্যারিষ্টার হল। বন্ধু-

মঙ্গলে ঘোষণা করল, "সুভাষ বসু ও তাঁর শিষ্যদের জন্যে আদালতে লড়তে হবে ত। তাই আমি ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে যাচ্ছি। যারা স্বদেশী ক'রে ইংরেজের আইনের জালে জড়িয়ে পড়বে, তাদের জালমুক্ত করবার দায়িত্ব আমার।"

দেশের জন্যে সরিৎসাগর কোঠারী আর একটি ত্যাগ করেছিল, যার খবর তার একান্ত অন্তরঙ্গ দু'চারজন ছাড়া অন্য কেউ জানত না। মার্গারেট ওয়াকার বান্ধবীর সীমা ছাড়িয়ে অন্তরঙ্গী হয়েছিল, সরিৎসাগর তাকে বিবাহ করবে মনস্থির করেছিল। জীবনবেদের হঠাৎ পরিবর্তনে তার সংকল্প এক্ষেত্রেও বদলে গেল। মার্গারেটকেও আই. সি. এস. ভবিষ্যতের সঙ্গে পশ্চাতে ফেলে সরিৎসাগর একদিন স্বদেশে ফিরে এসে বিলাসপুর হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ শুরু করল। কয়েক বছরে তার প্রতিষ্ঠা হ'ল, রোজগার বাড়ল, নাম-ডাক হ'ল। রাজনৈতিক কর্মীদের কেস প্রথম থেকেই সে বিনা-ফি'তে গ্রহণ করত, এবং এতে দেশের সর্বত্র তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। বড় বড় নেতাদের কেস করতে সে বিলাসপুরের বাইরে যেতে, ব্যবসার ক্ষতি সত্ত্বেও, কদাচ ইতস্তত করত না; তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য, সাধারণ স্বদেশী কর্মীদের কেস পেলেও সে সমান উৎসাহে ও ঔদার্যে গ্রহণ করত; উপরন্তু, নিজের জুনিয়ারদের দিয়ে ছোট আদালতে বিনা পয়সায় এ-সব কেসের দায়িত্ব নিত।

সরিৎসাগর কোঠারী অন্য কোনও রমণীর পাণিগ্রহণ করে নি।

রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ভূমিকাও সরিৎসাগর কোনও দিন গ্রহণ করেন নি। কংগ্রেসী দলে নাম লেখান নি, কংগ্রেসের কোনও পদে অধিষ্ঠিত হন নি। তা হ'লেও রাজনৈতিক কেসগুলির জন্যে এবং কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি কমিশন ও কমিটির চেয়ারম্যান বা সভ্যপদ গ্রহণ করায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সরিৎসাগরের আত্মিক সম্পর্ক দীর্ঘকাল গ'ড়ে উঠেছিল। যে-সব কমিশন বা কমিটির বিষয়বস্তু ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র বা ইংরাজের এক

বা একাধিক আইনের সংশোধন অথবা প্রত্যাহার দাবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, একমাত্র তাতেই সরিৎসাগর অংশ গ্রহণ করতেন। কালে তিনি শাসনতন্ত্র-আইনে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন। সুতরাং স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণয়নেও তাঁর অনেকখানি হাত ছিল। কনষ্টিটিয়ুয়েণ্ট এ্যাসেম্বলির সভ্য হিসাবে দু'বছর কাটাবার পর, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুরোধে, তিনি উদয়াচলের মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছিলেন।

মন্ত্রীত্বে তাঁর লোভ ছিল না। তথাপি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করেন নি। উদয়াচলে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা তৈরী করবার ইচ্ছে ছিল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের। সে-ব্যবস্থা গ্রাম থেকে জন্ম নিয়ে, বিভিন্ন স্তরে, শহরের উচ্চতম ধাপ পর্যন্ত উঠে আসবে; যাতে বর্তমান মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থার গলদগুলি বাদ পড়বে; এবং যার মাধ্যমে সুপরিকল্পিত পথে প্রদেশের জনসাধারণকে পল্লী থেকে শহর পর্যন্ত নাগরিক জীবনের ব্যাপক পরিধিতে নানাবিধ কল্যাণসাধনে সক্রিয়ভাবে টেনে আনা যাবে। বিলাসপুর রোটারী ক্লাবে একদিন প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বায়ত্তশাসন পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছিলেন এবং এ কার্যে সুদক্ষ লোকেদের সাহায্য চেয়েছিলেন। বক্তৃতার পর কয়েকজনের সঙ্গে কিছু কথাবার্তাও হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সরিৎসাগর কোঠারী।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেছিলেন, "কোঠারী সাহেবকে ত আমরা আজ-কাল একেবারেই পাই নে।"

সরিৎসাগর জবাব দিয়েছিলেন, "জেলে ত আর যান না, আদালতেও আর ব্যারিষ্টারের প্রয়োজন নেই।"

"আমাদের সঙ্গে কি আপনার অতটুকু সম্পর্ক ?"

"কোশলজী, রাজনীতিতে আমার উৎসাহ আছে, রুচি নেই। দল-গঠন ক'রে রাজনৈতিক কোন্দল পাকান আমি কোনও দিন

পছন্দ করি নি। তাই, পার্টি-মাফিক রাজনীতি আমার দ্বারা ভাল হয়ে উঠল না।"

"তবু ত সারাজীবন আপনি দেশের জন্যে কম করেন নি!"

"দেশের জন্যে করা কথাটার, মাপ করবেন কোশলজী, কোনও মানে হয় না। অথচ সবদা একথা এ-দেশের লোকমুখে শুনতে পাই। স্বদেশী করবার আগে বা করবার সময় আপনারা কেউ নিশ্চয় দেশের উপকার করবার পরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন নি। যদি কেউ তাই করে থাকেন তবে তিনি স্বার্থপব। আমরা বড় কিছু করি নিজের তাগিদে, না-করে পারি নে বলে। গান্ধীজী অনেক সময় এ কথাটা বলতেন। বলতেন, ভারতবর্ষের জন্যে কিছু করার স্পর্ধা আমার নেই, এক সেবা ছাড়া; দেশের মুক্তি যদি চাই তা নিজের বন্দীত্ব অসহ্য বলে।"

"অতি সত্য কথা।"

"আমি দেশভক্ত এমন দাবি কদাচ করব না! ভারতবর্ষকে ভক্তি করা সহজ নয়। তার চেয়ে ভালবাসা সহজ। যাকে ভালবাসি তার দোষ দেখতে পাই নে। পেলেও ক্ষমা করি, বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু দেশপ্রেম আমার কদাচ এমন উগ্র ছিল না যে আপনাদের মত সব ছেড়ে স্বদেশীতে নেমে পড়তে পারি। তা ছাড়া, বলতে দ্বিধা নেই, আপনাদের স্বদেশী অনেক সময় আমার কাছে হাস্যকর মনে হ'ত। আমি কেবল দু'জন মানুষের স্বদেশী তারিফ করতে পেরেছি—এক মহাত্মা গান্ধী, অন্য সুভাষ বোস।"

"কেন? জবাহরলাল নেহরু?"

"প্রধানমন্ত্রী আমাদের সবাকার মাননীয়। তাঁর রাজনীতির আমি প্রশংসা করি। কিন্তু তাঁর স্বদেশী সম্বন্ধে আমার মত খুব উঁচু নয়।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "ওসব আলোচনায় কাজ নেই। আমি চাই আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

"কি ভাবে?"

"আসুন না একদিন আমার বাড়ীতে? কথাবার্তা হবে।"

সরিৎসাগর কোঠারীকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মন্ত্রীত্ব গ্রহণে রাজী করিয়েছিলেন। কথা দিয়েছিলেন কংগ্রেসের চার আনা সদস্য ছাড়া আর কিছু তাঁকে হ'তে হবে না। তিনি কোনও দল বা উপদলে থাকবেন না। তাঁর প্রধান দায়িত্ব হবে উদয়াচলে নতুন ধরনের স্বায়ত্ব শাসন গঠন করা। সঙ্গে সঙ্গে, আইন বিভাগের ভার তিনি নিলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিশ্চিন্ত হবেন যে প্রাদেশিক আইনগুলি সুরচিত হবে, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট তাদের বাতিল করতে পারবেন না।

বলেছিলেন, "ভুলতে পারি নে, স্বায়ত্তশাসন নিয়েই কংগ্রেসী আন্দোলন শুরু। ইংরেজ আমলে আমরা স্বায়ত্ব-শাসন প্রসারিত ও শক্তিশালী করবার জন্যে বছরের পর বছর দাবি জানিয়েছি। আমাদের নেতাদের অনেকেরই জনকল্যাণের বাস্তবক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার হাতেখড়ি মিউনিসিপ্যালিটিতে। গান্ধীজী নিজে এ নিয়ে অনেক লিখেছেন, অনেক কাজ করে গেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হবার সময় কি অভূতপূর্ব জন-আলোড়ন হয়েছিল। সর্দার প্যাটেল আহমেদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি, রাজেনবাবু পাটনায়, নেহরুজী এলাহাবাদে, নেতাজী কলকাতায় স্বায়ত্তশাসনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অথচ স্বাধীন হবার পর আমাদের দেশে বোধ করি একটি কর্পোরেশন, একটি মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা বোর্ড বা য়ুনিয়ন বোর্ড নেই যা নিয়ে আমরা সামান্য গর্ব করতে পারি। দেশের শাসনভার যারা গ্রহণ করবে তাদের প্রথম শিক্ষানবীশির ক্ষেত্র হবে এ সব প্রতিষ্ঠান। অথচ, দুঃখের কথা, প্রদেশে প্রদেশে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি সরকার নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসছেন, স্বায়ত্তশাসন মরে যাচ্ছে। কর্পোরেশনগুলি দুর্নীতি, আত্মীয়পোষণ, চুরি, অপটুতা ও ব্যর্থতার উদাহরণ হয়ে উঠেছে। আমার মতে এই হ'ল কংগ্রেস শাসনের প্রধান ব্যর্থতা।

গ্রাম থেকে নগর পর্যন্ত জনসাধারণের হাতে ক্রমবর্ধমান স্থানীয় শাসনের ক্ষমতা আমরা তুলে দিতে পারি নি। শাসনকে ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত করে চলেছি। আমি এ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই। এবং এ দায়িত্ব আপনার। যথাসম্ভব এ দায়িত্ব পালনে আপনার পূর্ণ অধিকার থাকবে।"

সরিৎসাগর জানতে চেয়েছিলেন তাঁর তৈরী প্ল্যান ক্যাবিনেটের অনুমোদন-সাপেক্ষ হবে কি না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেছিলেন, "হবে। কিন্তু আমি আর আপনি একমত হ'লে ক্যাবিনেট নিয়ে ভাবতে হবে না।"

"যদি একমত না হই।"

"হবার সম্ভাবনাই বেশি। আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করে ক্যাবিনেটে আনছি।"

সরিৎসাগর ক্যাবিনেটে যোগ দিয়েছিলেন পূর্বোল্লিখিত বিভাগ পুনঃ-বণ্টনের সময়। মন্ত্রী হয়েই তিনি নতুন পরিকল্পনার খসরা করেন নি। প্রথমত, ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত-শাসনের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন। উল্লেখযোগ্য যতগুলি রিপোর্ট গত একশ বছরে লেখা হয়েছে তা পাঠ করেছেন। কয়েকটি রিপোর্ট পাবার জন্যে তাঁকে কম বেগ পেতে হয় নি। স্বায়ত্ত-শাসন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে গিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। উদয়াচলের স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস বিশেষ যত্ন নিয়ে অনুধাবন করেছেন। গ্রাম-কেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে গান্ধীজীর রচিত প্রবন্ধ 'হরিজন' পত্রিকার বহু বছরের ফাইল জোগাড় ক'রে প'ড়ে নিয়েছেন। তারপর নজর দিয়েছেন বিদেশের অভিজ্ঞতায় ও প্রতিষ্ঠানে। সোভিয়েট য়ুনিয়ন, যুগোস্লাভিয়া, ইংলণ্ড এবং স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলির স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা অধ্যয়ন করেছেন। তার পর উদয়াচলের বাইরে থেকে আমন্ত্রিত তিনজন এবং প্রদেশের দু'জন বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটি কমিটি গঠন ক'রে

সমস্ত বিষয়টির ওপর দীর্ঘকালীন রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন। অবশেষে সরিৎসাগর নিজের বিবেচনা ও কমিটির সুপারিশ সমন্বিত ক'রে নতুন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন।

এতে করে তু'বছর কেটে গেছে।

পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রাজনৈতিক জীবনেরও হাতেখড়ি হয়েছিল জিলা বোর্ডে: স্বায়ত্ত-শাসনের সমস্যাগুলির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। সরিৎসাগর কোঠারী বিষয়টিকে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় তিনি সুখী হয়েছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য মতবিরোধ ছাড়া সরিৎসাগরের পরিকল্পনায় তাঁর আপত্তি ছিল না। মতবিরোধের ক্ষেত্র এত ক্ষুদ্র ছিল যে মতৈক্য ঘটাতে তু'জনকে বেগ পেতে হয় নি।

কিন্তু আজ পর্যন্ত সরিৎসাগরের পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নি। নতুন স্বায়ত্ত-শাসন বিল আজ পর্যন্ত বিধান সভার অনুমোদন পায় নি।

পরিকল্পনার মূল দর্শন ছিল স্বায়ত্ত-শাসন থেকে রাজনীতি দূরে সরিয়ে রাখা। সরিৎসাগর এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, স্থানীয় শাসন দোষমুক্ত করতে হ'লে রাজনীতি থেকে তাকে বাঁচাতে হবে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এ সিদ্ধান্তে মত দিয়েছিলেন। গ্রাম পঞ্চায়েৎ থেকে নগর নিগম পর্যন্ত স্বায়ত্ত-শাসন পরিচালিত হবে উপযুক্ত জন-নির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা, কোনও রাজনৈতিক দল দ্বারা নয়। পঞ্চায়েৎ-প্রধান নিজের দায়িত্বে সহকারী বেছে নেবেন এবং তু'বছর তাঁর শাসন চলবে; তিনি সাহায্য পাবেন জিলা অফিসারের কাছ থেকে। একই ভাবে, মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি নির্বাচিত হবেন গণভোটে; তিনি তাঁর 'ক্যাবিনেট' বেছে নিয়ে তিন বছর নগর শাসনের দায়িত্ব নেবেন। নগর নিগমের মেয়রদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা। নির্বাচনের সময় কেউ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হবেন না। দাঁড়াবেন নিজের চরিত্র, কর্মশক্তি ও পুরাতন জনসেবার

রেকর্ড নিয়ে। নগর নিগম থেকে পঞ্চায়েৎ পর্যন্ত নির্বাচিত কাউন্সিলারদের মেয়র থেকে প্রধান পর্যন্ত প্রশাসন-নেতাদের পদচ্যুত করবার ক্ষমতা থাকবে। অর্থাৎ, সরিৎসাগর কোঠারীর পরিকল্পনা গ্রাম থেকে নগর পর্যন্ত আগামী কালের প্রশাসন নেতৃত্ব গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়েছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে তাঁর এই অভিনব প্রস্তাব সমর্থন করবেন, সরিৎসাগর আশা করেন নি। সমর্থনে আশ্চর্য হয়েছিলেন।

প্রথম বাধা এল ক্যাবিনেটে। দু'তরফ থেকে। দুর্গাভাই দেশাই আপত্তি জানালেন এক কারণে। বললেন, নতুন প্ল্যান প্রগতি-বিরোধী। কংগ্রেস এতকাল যে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সমর্থন করে এসেছে এ তার বিপরীত। অন্য আপত্তি এল সুদর্শন দুবের দল থেকে। এ দলের মুখপাত্ররা বললেন, রাজনীতি বাদ দিলে জনগণকে ও বাদ দেওয়া হবেই, বাদ দেওয়া হবে গণতন্ত্রকে। বললেন, রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র হতে পারে না। স্বায়ত্ত-শাসনের উদ্দেশ্য গণতন্ত্রকে শক্ত করা, সবল করা। রাজনৈতিক দলগুলি যদি স্বায়ত্ত-শাসনে যোগ না দিতে পারে, গণতন্ত্র গ্রামে পৌঁছবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে।

সরিৎসাগর প্রাণপণ লড়লেন। পুনর্বার আশ্চর্য হ'লেন কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকেও সবটুকু শক্তি নিয়ে তার পাশে দেখে। বিষয়টা গুরুতর হয়ে উঠল। দুর্গাভাই শেষ পর্যন্ত প্ল্যান সমর্থন করতে রাজী হ'লেন। কিন্তু প্রাদেশিক কংগ্রেস মানল না। সুদর্শন দুবে প্রকাশ্যে প্ল্যানের বিরোধিতা করলেন। বলতে লাগলেন, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন কংগ্রেসকে দুর্বল ও পঙ্গু করতে চান। উদয়াচলের অধিকাংশ কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি বিরুদ্ধে দাঁড়াল। তাদের সবই কংগ্রেস-শাসিত। ব্যাপারটা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল। গণমত, দেখা গেল, নতুন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে। সুদর্শন দুবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির শরণাপন্ন হ'লেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও সরিৎসাগরকে

দিল্লী যেতে হ'ল। বামপন্থী দলগুলিও বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিল।

মন্ত্রীসভায় ভাঙ্গনের প্রথম প্রকাশ্য কারণ হ'ল স্বায়ত্ত শাসন।

সরিৎসাগর কোঠারী একদিন কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কাছে পদত্যাগ পত্র নিয়ে হাজির হলেন। বললেন, "কোশলজী, আপনি অনেক লড়েছেন। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার সীমা নেই। কিন্তু আমরা হেরে গেছি। এবার আমাকে রেহাই দিন।"

"রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করছেন।"

"না। স'রে দাঁড়াচ্ছি। দলীয় রাজনীতিতে কোনও দিন আসতে চাই নি এই ভয়ে।"

"আপনি ত নিজের ইচ্ছায় আসেন নি। আমি ডেকে এনেছি। যদি আপনার পরিকল্পনা গৃহীত না হয়, পরাজয় আমারও। আমি এত সহজে হার মানি না।"

"আপনি কি মনে করেন পরিকল্পনা আপনি চালু করতে পারবেন?"

"নিশ্চয় মনে করি। এ ঝড় বয়ে যেতে দিন। পদত্যাগ করবেন কেন? এ সময় অমাকে একা ফেলে আপনার স'রে দাঁড়ান কি ঠিক হবে?"

"কিন্তু—"

"এ ঝড় বয়ে যাক। ব্যাপারটা বহুদূর গড়াবে। মনে হচ্ছে মন্ত্রীসভার একদিন পতন হবে। হয়ত দেখবেন, দলের আস্থাও আমি হারিয়ে বসেছি।"

"আমার জন্যে আপনি অতটা করবেন কেন?"

"আপনার জন্যে নয়। আমি রাজনীতি করি। আপনার জন্যে আমার রাজনৈতিক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিসর্জন দেব অত বোকা আমি নই। এ প্ল্যান আমার চাই। উদয়াচলের জন্যে, ভারতবর্ষের জন্যে। একদিন-না-একদিন সুদর্শন দুবেদের হাত থেকে মুক্তি না

গেলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাকে একটা প্রদেশের প্রশাসন চালাতে হয়। আমি জানি দলীয় রাজনীতি কি ভাবে সারা দেশের রক্ত দূষিত করে দিচ্ছে। আমি জানি কেন একজন ডেপুটি কমিশনারও জিলায় কাজ করতে পাবে না, কাজ করতে চায় না। জিলা কংগ্রেসের নেতারা তাদের কাজ করতে দেয় না। মন্ত্রীদের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে তারা হয়রান হয়ে যায়। পঞ্চায়েৎ থেকে নগর নিগম পর্যন্ত রাজনীতির অত্যাচার দেশকে দীন দুবল করে তুলেছে। আমাদের কাল ত শেষ হয়ে এল, কোঠারী সাহেব। আমরা আজ আছি, কাল নেই। কিন্তু দেশটা ত থাকবে—তার ভবিষ্যৎ আছে, তাকে বাড়তে হবে, এগোতে হবে। আপনি এত পরিশ্রমে যা করেছেন তা দেশের ভবিষ্যতের জন্যে। এত সহজে আমি তা ব্যর্থ হ'তে দেব না।"

"যদি আপনাকে পর্যন্ত পদত্যাগ করতে হয়?"

"পদত্যাগ বোধহয় করতে হবে না। হঠাৎ একদিন দলে হেরে যেতে পারি। তাতে ভালও হ'তে পারে। নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করব।"

"আশ্চর্য আপনার আত্মবিশ্বাস!"

"তার ভিত্তি কি জানেন? উদয়াচলের নাড়ী-নক্ষত্র আমি জানি। আমি জানি সুদর্শন দুবেকে, তার দলের প্রত্যেক মানুষকে। জানি, বিধান সভার প্রত্যেক সদস্যকে। প্রাদেশিক হ'তে মণ্ডল কংগ্রেস পর্যন্ত প্রত্যেক নেতাকে। জানি বলেই এ আত্মবিশ্বাস। জানি, কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বাদ দিয়ে উদয়াচলের কংগ্রেস শাসন চলবে না। জানি, এরা যদি আজ আমার বিরুদ্ধে ভোট দেয়, কাল আবার আমারই পক্ষে ভোট দেবে।"

সরিৎসাগর সরকারী বাংলোয় থাকতেন না। বিলাসপুরে পিতার অট্টালিকা আছে, তাতেও তিনি বাস করেন নি, প্র্যাকটিসের

প্রথমে কয়েক বছর ছাড়া। শহরের পুব দিকে প্রাচীন ঝিল, তার কাছাকাছি সরিৎসাগরের নিজের বাড়ী। তু একর জমিতে মস্ত লন, বিরাট বাগান, টেনিস কোর্ট, সাঁতারের পুকুর—এবং ছায়াছোট্ট বাসা। একতলা ধবধবে সাদা বাংলো প্যাটার্নের ছোট্ট বাড়ী—তু'খানা শোবার ঘর, লাইব্রেরী, বসবার ঘর, খাবার ঘর, বাথরুম ইত্যাদি। সবচেয়ে বড় হ'ল লাইব্রেরী ঘর। বাংলোর ডান ও বাঁ দিকে আরও তু'খানা ছোট বাড়ী, একখানায় সরিৎসাগরের দপ্তর, অন্যখানা অতিথিশালা। দপ্তরে মক্কেলদের বসবার জন্যে একখানা ঘর, মুহুরীদের জন্যে একখানা, জুনিয়রদের জন্যে তুখানা এবং সরিৎসাগরের নিজের জন্যে একখানা। অতিথিশালায় তিনখানা শোবার ঘর, একখানা বসবার ঘর এবং আনুসঙ্গিক বাথরুম ইত্যাদি। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে সরিৎসাগর অকৃতদার জীবনের জন্যে নিজেকে তৈরী করেছিলেন। বাড়ী নির্মাণের সময়ও একক জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্ল্যান তৈরী করিয়েছিলেন।

আইন-ব্যবসা ছাড়া তাঁর বহু বিষয়ে উৎসাহ ছিল। নিজের হাতে বাগান তৈরী—ফুল, ফল, সব্জিতে সমান উৎসাহ। পশুপক্ষী তিনি ভালবাসতেন; ভারতবর্ষে মুষ্টিমেয় পক্ষী-প্রেমীদের মধ্যে তার নাম সবাই জানত। বাগানে নানারকম বিদেশী গাছ লালন করা সরিৎসাগরের আর এক নেশা। বাগানটিকে তিনি অনেক বছরের চেষ্টায় একটি ছোটখাট বোটানিক্যাল গার্ডেন-এ পরিণত করেছিলেন বাগানের কেন্দ্রস্থলে ছিল কাঁচের বেড়া দেওয়া ঠাণ্ডা-ঘর: শীতপ্রধান দেশের গাছ-গাছড়ায় ভরতি। এক প্রান্তে ছিল সরিৎসাগরের নিজস্ব জলজপ্রাণী গৃহ: ননা রং-এর মাছ দেশ-বিদেশ থেকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। পাহাড়ে বেড়ান ছিল সরিৎসাগরের আর এক নেশা। ভারতবর্ষের এমন কোনও পাহাড়-পর্বত নেই যার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ নিবিড় পরিচয় ছিল না।

একক জীবন বেছে নিয়েও সরিৎসাগর নিরালা মানুষ ছিলেন

না। বহু বন্ধু-বান্ধব তাঁর কাছে আসত, থাকত, আনন্দ-আহ্লাদ করত। তাঁদের সৎকারের ব্যবস্থায় সরিৎসাগর কার্পণ্য করতেন না।

সরিৎসাগরের বাড়ীতে কেবলমাত্র একখানা ছবি ছিল। লাইব্রেরী ঘরে টেবিলের ওপর রূপার ফ্রেমে বাঁধান। একটি ইংরেজ তরুণীর। হাস্যময়ী সুন্দরী মার্গারেট ওয়াকার।

মার্গারেট ওয়াকারকে বিবাহ না করতে পারার পরিণাম সরিৎসাগরের আজীবন কৌমার্য। কিন্তু তার জীবনে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। ভাসাভাসা, ওপর-ওপর, আনন্দ-স্ফূর্তি-সম্ভোগ প্রবেশ। পছন্দমত স্ত্রীলোকেরা সরিৎসাগরের শয্যায় স্থান পেত; অন্তরে কারুর স্থান ছিল না।

সূর্যপ্রসাদ যখন মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি নিয়ে সরিৎসাগরের বাড়ীর ভেতরে ঢুকল, তখন সরিৎসাগর লাউঞ্জে বসে চারজন অতিথির সঙ্গে গালগল্প করছিলেন। অতিথিদের দু'জন দেশী, দু'জন বিদেশী। দেশীদের একজন বিলাসপুরের উদীয়মান ব্যারিষ্টর মদনমোহন সহায়, অন্যজন দিল্লীর ব্যবসায়ী, কুন্দনলাল সূদ। বিদেশীদের একজন ইংরেজ। সদ্য বিলাত থেকে এসেছেন ভারতভ্রমণে, উদ্দেশ্য ব্যবসার সুযোগ সন্ধান। নাম আর্থার হিউম। অন্যজন জার্মান রমণী, সরিৎসাগরের অন্যতমা বান্ধবী। মহিলার দিল্লীতে প্রবাস; পশ্চিম জার্মানীর রাজদূতের উদ্যোগে জার্মান ভাষা শেখাবার জন্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। নাম হিল্‌ডা ষ্ট্রাউস। কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন বিলাসপুরে সরিৎসাগরের অতিথি হয়ে।

গাড়ি ফাটকে ঢুকতে দেখে সরিৎসাগর একটু চমকে উঠেছিলেন। পরক্ষণে আরোহীর ওপর নজর পড়তে হেসে ফেললেন।

বললেন, "চীফ মিনিষ্টরের গাড়ি। কিন্তু অগন্তুক মুখ্যমন্ত্রী নন। তাঁর পুত্র সূর্যপ্রসাদ কোশল। এম. এল. এ.।"

মদনমোহন সহায় বললেন, "কে. ডি. কোশলের ভবিষ্যৎ কি?"

উত্তরে সরিৎসাগর বললেন, "কে. ডি. কোশলের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। ভদ্রলোকের গুণ অনেক, শক্তি অসাধারণ; নিজের নৌকা নিজে সামলাবার ক্ষমতা রাখেন। তা ছাড়া, জীবন শুরু করেছিলেন কুশানপুরের জিলা আদালতে উকিল হয়ে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাজনীতিতে। কালে উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী। চাকরি যদি যায় হয় ভারত সরকারের মন্ত্রীত্বে প্রমোশন পাবেন, নয়ত রাজ্যপাল হয়ে নিশ্চিন্ত আরামপূর্ণ অবসর। আমার বরং মাথাব্যথা হয়, মাঝে-মধ্যে, একটা দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে। তার নাম ভারতবর্ষ।"

আর্থার হিউম বললেন, "আমার ত মনে হয় আপনারা খুব ভাল ম্যানেজ করছেন!"

"তুলনাক্রমে করছি", সরিৎসাগর বললেন। "কিন্তু আমাদের সমস্যা বড় কঠিন। পৃথিবীর এমন আর একটা দেশ নেই যার সমস্যার সঙ্গে আমাদের অবস্থা তুলনীয়।"

হিল্ডা ষ্ট্রাউস বললেন, "ইণ্ডিয়া সত্যি অতুলনীয়।"

সরিৎসাগর বললেন, "উদার বহুরং আকাশ, উত্তরে গগনচুম্বী হিমালয়, দক্ষিণে পশ্চিমে সীমাহীন সমুদ্র। চার হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত। বুদ্ধ, গান্ধী, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ। চল্লিশ কোটি লোক, বছরে বিশ লক্ষ তার বৃদ্ধি। ষোলটি ভাষা, কেউ অন্যের কাছে মাথা নত করবে না। শতকরা আশি জন নিরক্ষর। একশ' জনের মধ্যে সত্তর জনের পুরো দু'বেলা আহার জোটে না। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। চল্লিশ কোটি মানুষের সমান অধিকার। ভারতবর্ষের সত্যি তুলনা নেই।"

গাড়ি এসে লাউঞ্জের সামনে দাঁড়াল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল সূর্যপ্রসাদ। একবার থমকে দাঁড়াল। তার পর হাতজোড় নমস্তে করল।

সরিৎসাগর এগিয়ে এলেন ঃ "এস, সূর্যপ্রসাদ এস। গাড়ি দেখে একটু ভড়কেছিলাম। বোঝা উচিত ছিল, এ সময়ে কোশলজীর পক্ষে আমার বাড়ী কেন, স্বর্গধামে যাওয়ারও উপায় নেই।"

সূর্যপ্রসাদ বলল, "পিতাজী বড় ব্যস্ত আছেন।"

"বুড়ো হয়ে গেছি, সূর্যপ্রসাদ। নইলে এ কথাটা তুমি বলার আগেই বুঝতে পারতাম।"

পরিচয় করিয়ে দিলেন অতিথিদের সঙ্গে, "ইনি মিষ্টার হিউম। বিলেত থেকে এসেছেন। বলছেন, এতদিনের সাম্রাজ্য এখন স্বাধীন হয়ে বেশ ভালই সব কিছু চালাচ্ছে। ইনি ফ্রাউলিন ষ্ট্রাউস। জার্মান। বলছিলেন, ভারতবর্ষের তুলনা নেই। ইনি কুন্দনলাল সুদ। সারা ভারতবর্ষ নিংড়ে যে দৌলত দিল্লীতে জমা হয় তার বড় অংশীদার। আর মদনমোহন সহায়কে ত চেন। তোমার বাবা আমার যে ব্যবসাটি মেরেছেন মদনমোহন তা নির্বিবেকে দখল করে বসেছে। আর ইনি? ইনি সূর্যপ্রসাদ কোশল। মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র। আমাদের বিধান সভার অন্যতম কংগ্রেসী সদস্য!"

সূর্যপ্রসাদ নমস্তে, করমর্দন সমাপ্ত ক'রে চেয়ারে বসলে সরিৎসাগর প্রশ্ন করলেন, "কি পান করবে? বীয়র না মার্টিনী? খুব চোস্ত ইটালীয়ন মার্টিনী আছে।"

সূর্যপ্রসাদ লাজুক গলায় বলল, "বীয়র।"

বেয়ারাকে অর্ডার দিয়ে সরিৎসাগর বললেন, "তারপর, সূর্যপ্রসাদ? কি মনে করে?"

"ভাল লাগছিল না। বাড়ীতে কেমন একটা গুমোট, অসহ্য পরিবেশ। পিতাজীর ধারে কাছে যাওয়া যায় না। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতেও পারছি না। তাই চলে এলাম আপনার কাছে।"

"ভাল লাগছিল না, এখানে চলে এসেছ, শুনতে আমার মন্দ লাগছে না। খাও-দাও, আনন্দ কর, বাগানে ঘুরে বেড়াও, বেড়াতে চলে যাও— দেখবে বেশ ভাল লাগবে। হিলডা—মানে মিস ষ্ট্রাউস

—বিলাসপুরে বেড়াতে এসেছেন, আমার মতন বুড়ো নিশ্চয় ভাল লাগছে না; তোমাকে সঙ্গী পেলে খুশি হয়ে বেড়াতে বেরোবেন। কিন্তু সূর্যপ্রসাদ, রাজনীতি যুদ্ধের অবস্থা যদি জানতে চাও, তুমি ভুল জায়গায় এসেছ। আমি এমন কোনও সঞ্জয়কে নিযুক্ত করি নি যে আমাকে অবিরাম রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে।"

"সে জন্যেই আপনার কাছে এসেছি। আপনি এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত। আপনার মতামতের দাম অনেক। তা ছাড়া আপনার মত বুদ্ধিমান লোক উদয়াচলে আর কে আছে?"

"তাই নাকি? সূর্যপ্রসাদ, আপনারা সকলে শুনে নিন, আমাকে উদয়াচলের সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক বলছে। ধন্যবাদ। বৃদ্ধ বয়সে এ প্রশংসার দরকার ছিল। হ্যাঁ, সূর্যপ্রসাদ, আমি অনেকখানি নির্লিপ্ত। কিন্তু একেবারে নই। আমি জানি, বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের জন্যে অনেকখানি দায়িত্ব আমার। কোশলজী আমার পেছনে শক্তভাবে দাঁড়িয়েছেন, এজন্যে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। এবং একই কারণে আমি তাঁর বিজয় চাই। এর চেয়ে বেশি এ ব্যাপারে আমার লিপ্ততা নেই। কারণ, এ কথা সবাই জানে, নতুন মন্ত্রীসভায় স্থান পেলেও আমি নেব না। পাবার সম্ভাবনাও নেই।"

মদনমোহন সহায় বললেন, "আপনি মন্ত্রী হোন বা না-হোন, উদয়াচলের রাজনীতি থেকে একেবারে স'রে থাকা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

"হবে," সরিৎসাগর জোর দিয়ে বললেন। "দীর্ঘকাল আমি রাজনীতি করি নি। তাতে উদয়াচলের ক্ষতি হয়েছে বলে ত জানা নেই। যেই মন্ত্রী হ'লাম, অমনি গোলমাল বাধল। কোশলজী সুখে রাজত্ব করছিলেন, সুদর্শন দুবে পরমানন্দে কংগ্রেস নামক গাভীর দুগ্ধ দোহন করছিলেন। কোথা থেকে আমি উড়ে এসে জুড়ে বসে সবকিছু গোলমাল করে দিলাম। রাজনীতি আর নয়।"

হিউম বললেন, "রাজনীতি আপনার পেশা নয়?"

"পেশাও নয়, নেশাও নয়," সরিৎসাগর মন্তব্য করলেন। "পেশা আমার আইন। নেশা অনেক—কিন্তু রাজনীতি নয়। আমাদের দেশে রাজনীতি এত বেশি লোকের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বেকারের সংখ্যা অনেক, এবং রোজ বাড়ছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের এ এক দারুণ দুবলতা। রাজনীতি যাঁদের পেশা, তারা যে-কোনও রকমে হোক রাজনীতি করবেই। আপনাদের দেশে ধরুন, চার্চিল। রাজনীতি করেন, এটা তার পেশা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী না হ'লে তার বেকার থাকার কারণ ঘটে না। তিনি বই লেখেন, ছবি আঁকেন, সারগর্ভ বক্তৃতা করেন: সময় বেশ ভালই কাটে। ব্রিটেনের শাসনভার তার হাতে না থাকতে পারে, কিন্তু যুগের পর যুগ তিনি যে নিবাচন এলাকার প্রতিনিধি হয়ে পার্লামেন্টে স্থান পাচ্ছেন, তাদের প্রতি কর্তব্যটুকু সম্বন্ধে তিনি নিত্য সজাগ। আজ আপনাদের হ্যারল্ড ম্যাকমিলান বিরাট ম্যাকমিলান কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরদের সভাপতি। একদিন হয়ত তিনি হবেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রীত্ব যাবার পর প্রত্যাবর্তন করবেন নিজের ব্যবসায়ে। অর্থাৎ মন্ত্রীত্ব ছাড়াও তাঁদের করবার কিছু আছে। তাঁরা বেকার নন। আমেরিকায় আজ যিনি পররাষ্ট্রসচিব, কাল মন্ত্রীত্ব যাবার পর হয় তিনি কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি, নয় কোনও রিসর্চ ইনস্টিটিউশনের ডিরেক্টর। আমাদের দেশেই দেখতে পাই এক বিরাট সংখ্যক নতুন শ্রেণী : রাজনীতি ছাড়া যাদের আর কিছু করবার নেই। সূর্যপ্রসাদ কিছু মনে ক'রো না, কোশলজীর কথাই বলছি। আসলে তিনি উকিল, কুশানপুর জিলা আদালতে তাঁর একদা প্র্যাকটিশ ছিল। কিন্তু আজ মুখ্যমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে কুশানপুর জিলা আদালতে ফিরে গিয়ে ওকালতী করা তার পক্ষে অসম্ভব। মানে বাধবে, রোজগার হবে না; ভগ্নহৃদয়ে হয়ত মারাই যাবেন। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তাঁকে থাকতেই হবে। যদি একান্ত না হ'তে পারেন

তা হ'লে, দিল্লীর দাক্ষিণ্যে হয় কেন্দ্রে মন্ত্রীত্ব, নয় কোনও প্রদেশের অলস উদার রাজ্যপাল। নতুবা বেকার; করণীয় কিছু নেই। কোশলজী অবশ্য একেবারে বেকার নাও হ'তে পারেন, তিনি কবি, তাঁর কবিযশ আছে, যদিও এত বছর মুখ্যমন্ত্রীত্ব করবার পরও কবি-লক্ষ্মী তার আয়ত্তে আছেন কি না জানি নে। কিন্তু আমাদের দশজন রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রীর মধ্যে ন' জনেরই নিজস্ব কোনও কর্মস্থান নেই। তাই দেখা যায় মন্ত্রীত্ব কেউ ছাড়তে চায় না। সবাই চায় আমরণ মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী থাকতে। টিল্ ডেথ ডু আস্ পার্ট।"

"আপনার বেলা এ কথা নিশ্চয় খাটে না।" বলল মদনমোহন সহায়।

"নিশ্চয় না।" জোর দিয়ে বললেন সরিৎসাগর। "আমি মন্ত্রীত্ব চাই নি, চাই নে, চাইব না। আমার হাইকোর্ট আছে, বাগান আছে, গাছ-মাছ আছে, পাহাড়-পর্বত আছে, বন্ধু-বান্ধবী আছে, মন্ত্রীত্বে আমার লোভ নেই। এবং বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করছি, আমার মত লোক ভারতবর্ষে, অনেক অনেক না হ'লে আমাদের গণতন্ত্র রাজনীতির ভেজাল খেয়ে খেয়ে অদূর ভবিষ্যতে মারা যাবে।"

সূর্যপ্রসাদ প্রশ্ন করল, "রাজনীতি পেশা হতে পারে না কেন?"

"পারে, কিন্তু পারা উচিত নয়," বললেন সরিৎসাগর। "আমাদের রাজনীতির বারো আনা দলবাজি। দলের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল পলিটিক্স। মধ্যে উপদল, উপদলের মধ্যে অপদল। রাজনীতির পলিটিক্স মানে আর্ট অব গভর্ণমেন্ট। আমরা যাকে পলিটিক্যাল সায়ান্স বলি, মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নাম 'গভর্ণমেন্ট'। পরাধীন দেশের রাজনীতি দেশকে স্বাধীন করা। স্বাধীন দেশের রাজনীতি দেশকে শাসন করা, উন্নতির পথে এগিয়ে নেওয়া। এর জন্যে চাই অধ্যয়ন, বিচার, বিশ্লেষণ, এবং সবার আগে একনিষ্ঠ কাজ।

আমাদের রাজনীতিতে কাজ খুব কম, অকাজ বড় বেশি। তাই দেখতে পাও আজ তুমি মন্ত্রী, তোমার আদর-আপ্যায়নের শেষ নেই—বাঘ আর গরু অনবরত তোমার ভয়ে একঘাটে জল খাচ্ছে। কাল তুমি মন্ত্রী নও—কেউ তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না—তুমি নিজেও না। যেহেতু তোমার আর কিছু করবার নেই তাই তুমি আবার চাইবে মন্ত্রী হ'তে। এবং হবার জন্যে তুমি কি করবে? রাজনীতি করবে। অর্থাৎ দল পাকাবে। দল পাকাবার জন্যে বর্তমান মন্ত্রীদের পেছনে লাগবে। জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার সব কিছুর ব্যবহার করবে তোমার দলশক্তি পোক্ত করার জন্যে। এই হ'ল ভারতবর্ষে পেশাদার রাজনৈতিক জীবন। এতে দলপতি উপদলপতিদের আখের বেশ গোছান যেতে পারে, দেশটার সর্বনাশ হতে বাধ্য।"

সূর্যপ্রসাদ বলল, "এজন্যেই আপনার কাছে এসেছিলাম।"

"এসব সারগর্ভ কথা শুনতে? তা হ'লে প্রায়ই এস।"

"তা নয়। আমার মনে একটা সংশয় দেখা দিয়েছে।"

"বটে?"

"ভাবছি, পিতাজীর সঙ্গে রাজনীতি করে যাব, না অন্য কিছু করব।"

"এ ত দেখছি বিরাট সমস্যা! হ্যামলেটকেও এমন সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় নি।"

হিল্ডা ষ্ট্রাউস বলে উঠল, "সরিৎ, তুমি বড্ড ওঁর 'লেগ পুল' করছ।"

"মোটেই না। শোন, সূর্যপ্রসাদ। ওকালতী করে করে আমার জিভের ধার বড্ড বেড়ে গেছে। যা বলব পরিষ্কার সোজা কথা। এটুকু তুমি নিশ্চয় বোঝ যে, তোমার বাবার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছাড়া তুমি এম. এল. এ. হতে পারবে না।"

"বুঝি।"

"এখন প্রশ্ন হ'ল ছুটো। প্রথম, বাপের যদি প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকে, তা হ'লে তা ছেলেরা কেন ভোগ করবে না? দ্বিতীয়ত, যে যোগ্যতা আমি অর্জন করি নি, তা বাপ বা অন্য কারুর দাক্ষিণ্যে আমি নেব কি না। ছুটোই গুরুতর প্রশ্ন। হিন্দু তার্কিকরা এ নিয়ে পাঁচ বছর অবিরাম তর্ক করতে পারেন। কিন্তু তর্কে মীমাংসা নেই। মীমাংসা ব্যক্তির সিদ্ধান্তে।"

"আপনি কি বলেন?"

"আমি? আমি বলার আগে তুমি বল। বল, তুমি রাজনীতি করতে চাও?"

"চাই।"

"তা হলে নিজের ক্ষেত্র নিজে গড়ে নাও। যেমন একদিন তোমার পিতাজী গড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর বাপ ত তাঁকে নেতা বানান নি? তিনি স্বদেশী করেছেন, জেল খেটেছেন, কংগ্রেসের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন, উদয়াচলের কংগ্রেসকে নিজের আয়ত্তে রেখেছেন। তোমার ভাই ছুর্গাপ্রসাদও স্বক্ষেত্র তৈরী করছে। হোক না সে বামপন্থী—তবু তার নিজস্ব রাজনৈতিক দাবি আছে। তোমার তা আছে কি?

"আমি ছাত্রনেতা ছিলাম অনেকদিন।"

"ছাত্রনেতা আবার কি?"

"ছাত্র কংগ্রেসের নেতা?"

"ছাত্রনেতা হয় মেধাবী ছাত্র, যে পরীক্ষায় প্রথম হয়, নয় গুণ্ডা-ছাত্র, যার দাপটে অন্য ছেলেরা সব কিছু করে, মাষ্টাররা ভয়ে পড়া বন্ধ করে দেয়। ছাত্র-কংগ্রেস নামক কোনও প্রতিষ্ঠান থাকার মানে নেই। ওটা হ'ল বামপন্থী দলগুলির নির্বুদ্ধি অনুকরণ। তা ছাড়া ছাত্ররা ত আলাদা ভোট দিয়ে তোমাকে বিধান সভায় নির্বাচন করতে পারে না।"

"না।"

"তা হ'লে! যদি রাজনীতি করতে চাও, নির্বাচন এলাকা বেছে নাও। গ্রামে বা শহরে। সে এলাকায় কাজ করো। কংগ্রেসের হয়ে করো বা অন্য দলের। জনসাধারণের কাছে তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করো। নেতৃত্ব করার আগে জনসেবা করো। মানুষের শ্রদ্ধা, আস্থা অর্জন করো। জনস্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থ মিলিয়ে নাও। মাটি থেকে উঠে এস, সূর্যপ্রসাদ, মাটি থেকে। যারা মাটি থেকে উঠে আসবে না, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে তাদের নেতৃত্ব করা সম্ভব হবে না। দেখছ না, উঁচু স্তর কত তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হ'তে চলেছে? দেশ স্বাধীন হ'ল। শাসনের ডাক পড়ল। বড়, মাঝারি সব নেতারাই রাতারাতি মন্ত্রী উপমন্ত্রী রাজ্যপাল হয়ে গেলেন। একেবারে আর কিছু না হোক ত এম পি. বা এম. এল. এ.। কংগ্রেসের কাজ, জনগণের কাজ করবার জন্যে বাকী রইল না আর কেউ। বর্তমান মন্ত্রীকুল ত অমর নয়। তারা মরলে দেশের নেতৃত্ব করবে কে?"

সূর্যপ্রসাদ সভয়ে বলল, "কেন? আমরা।"

"তোমরা?" সবিৎসাগর নীরব পান করতে করতে ব্যঙ্গ হাসলেন, "উত্তম। কিন্তু জনগণ তোমাদের মানবে কেন? আজ তুমি এম এল. এ. হয়েছ তোমার পিতার গৌরবে। তোমার নিজের অর্জিত নেতৃত্ব কোথায়? দলের দাপটে জনগণ যদি তোমাদের মেনেও নেয়, দেশ শাসন করতে তোমরা পারবে না। তোমাদের বধিবে যারা তারা গোকুলে বাড়ছে। বাড়ছে চাষের মাঠে, কারখানায়, বন্দরে: যেখানে অগণিত ভারতবাসী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটছে, অথচ দুবেলা পেট ভরে খেতে পারছে না। গণতন্ত্রের বাণী তাদের কাছে পৌঁছে গেছে, তারা জানে যে আসলে রাজশক্তি তাদের হাতে। আমরা তাদের নাম নিয়ে যা কিছু করছি তার একাংশও তাদের কাছে পৌঁছয় না; আসলে, আমরা তাদের চিনি না, জানি না। আমরা তাদের মুখের ভাষা যদি বা বুঝি,

শুনবার সময় পাই নে; বুকের ভাষা বুঝি নে। তোমাদের সঙ্গে তাদের কোনও কথোপকথন নেই। যদি তাদের মধ্য থেকে নিজের কর্মশক্তিতে ও সেবায় নেতৃত্বের সোপান বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠতে পার, রাজনীতিতে তা হ'লেই সার্থকতা পাবে। তা নইলে, আমরা চলতি পথের যাত্রীরা বিদায় নিলে আধা অবাজক ভাবতবর্ষে মাত্র কিছুদিন চলবে তোমাদের দৌরাত্ম্য। তারপর কি হবে সে ভবিষ্যং আমি কল্পনাও কবতে পারি নে।"

আপিস ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। বেয়ারা এসে বলল, "অর্থমন্ত্রী ফোন করছেন।"

সবিৎসাগব সবার কাছে মাপ চেয়ে উঠতে উঠতে বললেন, "আমাকে ফোন করবার কোনও অর্থ নেই। তবু ওঁরা কবেন। আমি এক্ষুণি আসছি।"

টেলিফোন তুলে সবিৎসাগর বললেন, "নমস্তে দুর্গাভাইজী।"

অন্যপ্রান্ত থেকে ভেসে এল: "দুর্গাভাইজী নয়। আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। নমস্তে।"

অপ্রস্তুত সরিৎসাগর বললেন, "মার্জনা কববেন, কোশলজী। বেয়ারা ভুল খবর দিয়েছিল।"

"খুব ব্যস্ত আছেন কি?"

"খুবই ব্যস্ত আছি। মন্ত্রীত্ব তো শুধু নামেই টিকে আছে। প্র্যাকটিশও করতে পারছি না। অকাজে তাই একেবারে ডুবে আছি।"

"ক্যাবিনেট মিটিংএ আসেন নি কেন?"

"প্রয়োজন নেই বলে। মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেবার জন্যে বিধান সভায় কোনও বিল আনবার দরকার হয় না। আইন মন্ত্রী বর্তমান সময়ে একেবারে অপ্রয়োজনীয়।"

"স্বায়ত্ত-শাসন?"

"এখন তো প্রত্যেক মন্ত্রীই স্বায়ত্ত-শাসনের স্বপ্ন দেখছেন। এখানেও আমি গর-হাজির।"

"শুনুন, কোঠারীজী। জরুরী কথা আছে।"

"বলুন।"

"নতুন মন্ত্রীসভায় আপনাকে থাকতে হবে।"

"তার মানে?"

"আমি অন্য কাকে নি বা না নি, আপনাকে আমার চাই-ই।"

"অর্থাৎ, নতুন মন্ত্রীসভা আপনিই গঠন করবেন?"

"অবশ্য করবো। নয়তো কববে কে? আপনি?"

"ওরে বাবা! আমি সাতজন্মেও নই। কিন্তু সুদর্শন দুবে?"

"আজ সকালে প্রথমে সুদর্শন দুবের মুখ দেখেছি। রাত্রে আর একবার দেখবো, মনে হচ্ছে। সকালে এসেছিল দরাদরি করতে। রাত্রে আসবে কাকুতিমিনতি নিয়ে।"

"আপনি একেবারে নিশ্চিত?"

"পনের আনা। কাজ অবশ্য এখনও অনেক বাকী। তবে, হ'য়ে যাবে। আজ সারাদিন আছে। রাত্রি আছে। কাল সকালে ভাবছি শহরের বাইরে যাবো।"

"কোথায়?"

"এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে জনকপুব গ্রামে মেলা আছে। পঞ্চায়েত মেলা। আমার উদ্বোধন করবার কথা।"

"অর্থাৎ আজ রাত্রির মধ্যেই জয় নিশ্চিত ক'রে যাবেন?"

"তাই তো আশা রাখছি।"

"আশ্চর্য মানুষ আপনি। আমি আগে থেকেই অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি।"

"অভিনন্দনে কাজ নেই। মন্ত্রীসভায় আপনাকে চাই।"

"আমাকে এবার রেহাই দিতে হবে, কোশলজী। মন্ত্রীত্ব আমার একেবারে সহ্য হচ্ছে না। হাইকোর্টে দাঁড়িয়ে আবার 'মি লর্ড' বলতে না পারলে দম আটকে মারা যাব।"

"মন্ত্রী হয়ে মরলে স্বর্গলাভ হবে।"

"ওতো দুর্যোধনদেরও হ'য়েছিল। ওতে আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই।"

"তামাসা নয়। মন্ত্রী আপনাকে হ'তেই হবে। মন্ত্রীসভা গঠনের দায়িত্ব পাবার ছাব্বিশ ঘণ্টা আগে আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনাকে আমার চাই।"

"আমাকে নিয়ে আবার আপনি বিপদে পড়বেন।"

"সে মাথাব্যথা আমার। আপনি তৈরী থাকবেন। নমস্তে।"

সরিৎসাগর বৈঠকে ফিরে এসে দেখলেন সূর্যপ্রসাদ চলে গেছে।

মদনমোহন সহায় বলল, "আপনার বক্তৃতার তেজ সইতে পারল না, বেচারা।"

বিষণ্ণ কণ্ঠে সরিৎসাগর বললেন, "বড়াই ক'রে খুব বড় বড় কথা বলছিলাম। চলে গিয়ে ভালোই করেছে সূর্যপ্রসাদ। ওর সামনে দাঁড়াতে আমার লজ্জা করতো।"

হিল্ডা বলে উঠল, "ব্যাপার কি? তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন?"

সরিৎসাগর বললেন, "আই হ্যাভ বিন সেনটেন্‌স্‌ড টু' এ্যাট্ লিষ্ট্ টু ইয়ার্স ইম্‌প্রিজনমেণ্ট। আমার কম ক'রে দু বছর কারাবাসের আয়োজন হল।"

হিল্ডা বলল, "তার মানে—"

সরিৎসাগর বীয়রের গ্লাস একটানে শূন্য ক'রে দিয়ে বললেন, "তার মানে বন্দরের কাল হল শেষ। আমি কাল পালাচ্ছি।"

"কোথায়?"

"বোম্বে, এবং সেখান থেকে য়ুরোপে। তুমি যাবে আমার সঙ্গে, হিল্ডা? বেশ একটা স্ক্যাণ্ডাল হবে।"

দপ্তর-বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সোজা নিজের খাস কামরায় গিয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসলেন। পদ্মাদেবীর সঙ্গে কথোপকথনে তাঁর মনে উষ্মা ও বেদনা একসঙ্গে ঘনিয়ে উঠেছিল। রেগেছিলেন এজন্যে যে আজ এই গুরুতর সঙ্কটকালে, মুহূর্তের বিরাম-বিহীন সংগ্রামের মধ্যে পদ্মাদেবী তাঁকে সবকিছু ছেড়ে বনবাসী হ'তে উপদেশ দিলেন। আরও এজন্যে যে, যে-তামস শক্তি তাঁর মধ্যে আজ প্রচণ্ড বেগে ধাবমান, যা তাঁর বিজয়-পণ সংগ্রামের প্রধান উৎস, যে ভয়ঙ্কর বিষ তিনি সঙ্গোপনে বহন করছিলেন, পদ্মাদেবী শুধু তার খবর রাখেন নি, তাকে চোখের সামনে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে বেদনাও মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলছিল। পদ্মাদেবীকে কোনও দিন তিনি জীবনে বড় একটা স্থান দেন নি; কিন্তু আজ এই সঙ্কটের দিনে, তাঁর বিজয় অনিবার্য দেখে, তিনি যে প্রতিবাদ জানাতে কাশীবাসিনী হবেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যেন সহ্য করতে পারছিলেন না। এমন সত্যাগ্রহ তিনি পত্নীর কাছ থেকে আশা করেন নি। পদ্মাদেবীকে ধ'রে রাখতে হ'লে যে মূল্য দিতে হয় তার জন্যে তিনি প্রস্তুত নন। কিন্তু এ সময়ে পদ্মাদেবী যে সবকিছু ছেড়ে কাশী চলে যাবেন, এর জন্যেও তিনি নিজেকে তৈরী করতে পারছিলেন না। স্ত্রীর কাছে হার মানার পাত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নন। তাই, তখন, খেতে বসে, উত্তেজিত মনে পত্নীর কাশী-গমন ইচ্ছায় তিনি অনুমতি দিয়ে ফেলেছিলেন; কিন্তু দেবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের কোন্ অজ্ঞাত কোণে ব্যথা লেগেছিল। পদ্মাদেবী যখন দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রী কমলাকে গহনা ও টাকা দেবার জন্যে অনুমতি চাইলেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হঠাৎ নিজেকে কেমন যেন দুর্বল মনে

হ'ল। এ দুর্বলতার জন্যে পত্নীর দানের সঙ্গে নিজেও কিছু যোগ ক'রে দিলেন: নাতনির জন্যে একছড়া হার।

মনের মধ্যে ব্যথা কিন্তু জমে বসল। রাগের সঙ্গে মিলে-মিশে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মনে মনে পদ্মাদেবীর অভিযোগ স্বীকার করলেন। মানলেন, পদ্মাদেবীর ভয় অমূলক নয়। মুখ্যমন্ত্রীত্ব ধরে রাখবার দুর্দম্য জিদ তাঁকে চেপে ধরেছে; সত্যি এ জন্যে যে-দাম তাঁকে দিতে হচ্চে ছ' বছর আগে তিনি তা ভাবতে পারতেন না। আজ যাদের সাহায্যে তিনি জয়ের রাস্তা তৈরী করছেন, সত্যিই, তাদের দাবি মেটাতে গিয়ে কাল তিনি প্রায় নিঃস্ব হবেন। আজ এখন, পার্টি-সভার চব্বিশ ঘণ্টা আগে, তিনি জানেন জয় তাঁর একপ্রকার নিশ্চিত। কিন্তু এও জানেন যে, নতুন মন্ত্রীত্ব গঠনে তাঁর স্বাধীনতা খুব একটা থাকবে না; এমন কি, দুর্গাভাই কৃপাভাই দেশাইর কাছেও তাঁর মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

টেলিফোন বাজল। অপর প্রান্তে দুর্গাভাই।

"নমস্তে, দুর্গাভাইজী। আপনার দেহ সুস্থ আছে ত? অনেক কাজ আপনার ওপর চাপিয়ে দিয়েছি। মনে মনে বড় অস্বস্তি লাগছে।"

"দেহ, কোশলজী, তার কাজ যতখানি পারে তার চেয়ে বেশি ক'রে যাচ্ছে। তার কোনও কসুর নেই। কসুর আমাদের।"

"অর্থাৎ, এ বয়সে দেহের পক্ষে যা সম্ভব তার চেয়ে অনেক বেশি বোঝা আমরা তাকে দিয়ে বহাচ্ছি।"

"দেখুন, কোশলজী, প্রাচীনেরা যখন চার ধর্মে জীবনটাকে ভাগ করেছিলেন তখন তাঁরা কদাচ ভাবেন নি যে, মানুষকে একদিন মন্ত্রী হতে হবে। রাজাদের সচিব ছিল—কিন্তু সে অন্য জিনিষ। যে-বয়সে আমাদের বানপ্রস্থ গ্রহণ ক'রে সব গোলমাল থেকে দূরে স'রে যাওয়া উচিত, সে বয়সে আমরা পুরোপুরি ভোগী হয়ে সব গোলমালের কেন্দ্রস্থল হয়ে বসেছি।"

"ঠিক বলেছেন, দুর্গাভাইজী।"

"আশ্চয, কোশলজী, আমরা বলি অনেক সময়ই ঠিক। কাজ অনেক সময়ই বেঠিক।"

"মানলাম, দুর্গাভাইজী। আজ আপনার মনটা ভালো নেই বুঝতে পারছি।"

"একটা কথা বলি, কোশলজী। কিছু মনে করবেন না।"

"বলুন।"

"আমার ও আপনার, দু'জনের গৃহেই অশান্তি। আমার গৃহে উচ্চাশার আগুন, আপনার গৃহে বৈরাগ্যের ভস্ম।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হঠাৎ নীরব হ'লেন। একটু পরে বললেন, "জীবনে সবার সবকিছু হয় না, দুর্গাভাইজী। জীবন-নদী বইতে বইতে এক ঘাটে পূর্ণ হয়, অন্য ঘাটে একেবারে শূন্য। বিধাতা বড় রসিক। এক হাতে দিয়ে অন্য হাতে নিয়ে নেন; শেষ পর্যন্ত জমা-খরচের হিসেব মিলিয়ে তৃপ্ত হবার অবকাশ থাকে না।"

দুর্গাভাই বললেন, "আপনি কবি, জীবনের সবকিছুকে রসরহস্য ক'রে নেবার ক্ষমতা আছে আপনার। এবার কাজের কথা বলি। হরিশংকরজী আমায় টেলিফোন করেছিলেন।"

"বহাল তবিয়তে আছেন তিনি আশা করি।"

"হিন্দুস্থান অটমোবাইলের নতুন কারখানা তৈরীর জন্যে ঋণটা আমি আপাতত স্থগিত রাখছি। নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হ'লে টাকা দেওয়া বেশি সমীচীন হবে মনে করি।"

"বেশ ত।"

"ত্রিপাঠীজীর ইচ্ছে ছিল টাকাটা এখনি দিয়ে দেওয়া হোক।"

"খুব স্বাভাবিক ইচ্ছে। কিন্তু আপনি উচিত কাজ করেছেন।"

"আচ্ছা, কোশলজী, সরোজিনী সহায়কে আপনি কতখানি চেনেন?"

"কিছুটা চিনি, কাজে ও খ্যাতিতে। চোখে দেখি নি।"

"উদয়াচলেব বাজনীতিতে তাঁব প্রভাব কতখানি? কতদিনের?"

"কয়েক বছরেব। ন্যাশনাল ট্রেড যুনিয়নেব কর্মী। বর্তমানে নেতাদেব একজন। আপনি দেখছি কয়েক বছবেব কথা ভুলে গেছেন। এই মেয়েটিকে নিয়েই কিছুটা গোলমাল বেঁধেছিল এবং আপনি নিজে কংগ্রেস সভাপতিব কাছে যে প্রসঙ্গেব অবতাবণা করেছিলেন। তাব ফলে এঁকে বিলাসপুব ছাড়তে হয়েছিল। কিছুদিন সরোজিনী সহায় উত্তব প্রদেশে কাজকর্ম কবেছেন। বর্তমানে আবাব বিলাসপুরে উদিত হযেছেন। কিন্তু আমাকে কেন প্রশ্ন কবছেন? আপনি ত ওঁকে খুব ভালভ দেখেছেন।"

"আমি চোখে একবার দেখেছি মাত্র। ব্যাপারটা ... । এখন সব মনে পড়ছে।"

"আপনি যে সরোজিনী সহায়কে খুব ভালে দেখেছেন তা আমি কি ক'বে জানলাম জিজ্ঞেস কবলেন না ত!"

"কোশলজী, আমাকে ততটা বোকা আপনি মাঝে মাঝে ভাবেন ততটা আমি নই। বর্তমান অবস্থায় কোনও রাজনৈতিক ঘটনাই যে আপনাব দৃষ্টি ও জ্ঞানেব অগোচব নয তা আমি বিলক্ষণ জানি।"

"আপনাকে বলতে আপত্তি নেই যে, পবশু বাত্রিব সভায় আপনার উপস্থিতির খবব আমি অনেক দেবিতে পাই। আাম ভাবতে পারি নি যে, আপনি ঐ আলোচনায় যোগ দেবেন।"

"যোগ দেই নি, কোশলজী। কেবল শুনেছি।"

"আপনার ওপব আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস। আজও আবাব বলছি, আপনি যদি মুখ্যমন্ত্রী হ'তে রাজী হন তা হ'লে আমি আপনাব অধীনে কাজ কবতে তৈবী। অন্য দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাকে সরাবার প্রয়োজন আপনাব নেই। আপনি খোলাখুলি একবাব বললেই পথ তৈবী।"

"আমার মনোভাবও আপনি পরিষ্কার জানেন। মুখ্যমন্ত্রী হবাব লোভ আমার নেই। যোগ্যতাও নেই। আমার উচিত মন্ত্রীত্ব ত্যাগ

ক'রে জনসেবায় বাকী জীবন কাটিয়ে দেওয়া। কিন্তু সে সৎসাহসও আমার নেই। আগামী কালের নির্বাচনে আপনাকে সরাসরি সমর্থন করাও আমার সাধ্যের বাইরে। সুতরাং নির্বাচনে আমাকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। অবশ্য সবাই জানে যে, হরিশংকর ত্রিপাঠীর সঙ্গে আপনার তুলনা আমি কদাচ করি নে। যারা আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে ভোট দিতে ইচ্ছুক, তাদের আমি একথা স্পষ্ট বলে দিয়েছি। আরও বলেছি যে, আপনি মুখ্যমন্ত্রী হ'লে আমার পক্ষে মন্ত্রীত্ব করা সম্ভব হবে। আমার অবস্থা বুঝে আশা করি আপনি মানবেন, কোশলজী, যে, এর চেয়ে বেশি কিছু আমার দ্বারা সম্ভব নয়।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, দুর্গাভাইজী। আপনি যা করেছেন তাতে আমি নিশ্চিন্ত।"

"অবস্থা কেমন বুঝছেন?"

"খুব একটা খারাপ মনে হচ্ছে না, দুর্গাভাইজী।"

"আমার ধারণা, আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তবে—"

"তবে কি—"

"তবে, আসল কথা হ'ল, এবার মুখ্যমন্ত্রীত্বের জন্যে যতটুকু রাজনৈতিক মূল্য আপনাকে দিতে হয়েছে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হঠাৎ কিছু বলতে পারলেন না।

দুর্গাভাই বললেন, "কিছু আপনাকে দিতে হবে জানি। বুঝতেও পারি। দলগত রাজনীতির নোংরা আমি ঘাঁটি নে, কিন্তু নোংরা যে কি ভীষণ তা আন্দাজ করতে পারি। তবে আশা করি খুব বড় কোনও রাজনৈতিক মূল্য আপনি দিতে রাজী হন নি, বা হবেন না।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "কিছু দাম দিতেই হবে—আমি তা মানছি। আপনি যদি আমার সঙ্গে সক্রিয় ভাবে থাকতেন, কোনও দামই দিতাম না। তবে, আমিও আপনার মত আশা করছি, চেষ্টা করছি, যাতে বেশি কিছু না ছাড়তে হয়।"

"ভগবান আপনার সহায় হোন, কোশলজী। এর বেশি আমার আর কিছু বলার নেই।"

টেলিফোন নামিয়ে রেখে দেখতে পেলেন তিওয়ারী এসে এক কোণে বসেছে। তার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যাপাব ?"

তিওয়ারী একখানা সীল-করা লেফাফা তাঁর হাতে দিল।

লেফাফা খুলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একটা রিপোর্ট পেলেন। পড়তে পড়তে তাঁব ললাট কুঞ্চিত হ'ল, নাসিকা উগ্র হয়ে উঠল, ক্রূর হাসিতে গালে ভাঁজ পড়ল।

দু'বার তিনি রিপোর্ট পড়লেন। কিছুক্ষণ চিন্তা কবলেন।

তিওয়ারীর পানে তাকিযে বললেন, "গুড ওয়ার্ক।"

তিওয়ারী নতমস্তকে বলল, "আমাব কিছু কথা ছিল।"

"জানি। তোমার অনেক কথা আছে। তুমি না বললেও জানি।"

"আজ রাত্রে বলব ?"

"বলার দরকার নেই। পাবে, যা চাইছ, তার অনেক কিছু পাবে। আজ আমার সময় নেই।"

"এখানেই শোবেন ত ?"

"হুঁ।"

"আজ একটু আরাম চাই আপনার। বড় ধকল যাচ্ছে ক'দিন থেকে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একবার তিওয়ারীর চোখে তাকালেন। বললেন, "দুর্গাপ্রসাদ এসেছে ?"

"নীচে বসে আছে।"

"তাকে নিয়ে এস।"

তিন বছর পর প্রিয়তম পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য তৈরী হ'লেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। তিওয়ারী গাত্রোত্থান করবার সঙ্গে সঙ্গে এক

অত্যন্ত জরুরী ফাইল খুলে বসলেন। প্রথম পাতায় চোখ বুলিয়ে দুর্গাভাইকে ফোন করলেন।

"আপনাকে তক্‌লিফ দিচ্ছি, দুর্গাভাইজী। সময় একেবারে নেই, নইলে আপনার কাছে গিয়ে হাজির হতাম।"

"এমন কি জরুরী ব্যাপার, বলুন ত?"

"আমার ছেলে দুর্গাপ্রসাদের বিরুদ্ধে দুটো কেস আছে, না?"

"আছে।"

"বিলাসপুরের কেসটা বোধকরি কাল শুরু।"

"তা হবে।"

"হঠাৎ জানতে পারলাম, পুলিশ এ কেসটায় বেশ ঢিলে দিয়েছে। ইনভেষ্টিগেশন খুব ভাল হয় নি, এবং পাবলিক প্রসিকিউটর নিজে কেস না নিয়ে এমন একজন সহকারীকে দিচ্ছেন যাঁর জেতবার ক্ষমতা খুব কম।"

"আমি এসব কিছু জানি না ত।"

"না জানাই সম্ভব। যা হোক, আপনি যদি এ বিষয়ে একটু নজর দেন ত বাধিত হই। দুর্গাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল রাজনৈতিক অপরাধে। বর্তমানে সে জামিনে মুক্ত। তাকে গ্রেপ্তারের আদেশ আমিই দিয়েছিলাম। প্রসিকিউশন যথাসম্ভব জবরদস্ত হওয়া চাই। মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে বলে তাকে রেহাই দিলে চলবে না।"

"বেশ ত। আমি হোম সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু এ ব্যাপারে ত আপনার আমার কাছে চলে আসবার কারণ দেখছি না, কোশলজী।"

"ঠিক ধরেছেন", মৃদু-উচ্চারিত হাস্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "অন্য কারণ আছে। বলছি। হোম সেক্রেটারীকে ফোন করলে দুর্গাপ্রসাদ সম্বন্ধে আর একটা খবর পাবেন। ওটা আমার আদেশ। না দিয়ে উপায় ছিল না, দুর্গাভাইজী। এবার অন্য কথাটা বলি। এক্ষুনি একটা চমকপ্রদ রিপোর্ট পেলাম।"

"রিপোর্ট ?"

"খুব নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে।"

"হুঁ হুঁ।"

"সুদর্শন তুবে আমার সঙ্গে মিটমাট করতে প্রস্তুত।"

"তাই নাকি ?"

"একটিমাত্র সর্ত।"

"যথা ?"

"সে, আপনি এবং আমি একমত হয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করব।"

"জোরটা নিশ্চয় একমতের ওপর !"

"তাই মনে হচ্ছে।"

"আপনি রাজী হ'লে ?"

"কালকার সভায় সুদর্শন তুবে নিজেই দলপতির জন্য আমার নাম প্রস্তাব করবেন। তাঁর ইচ্ছে সমর্থন করেন আপনি।"

"রাজী না হ'লে ?"

"কনটেষ্ট হবে। সুদর্শন তুবে প্রস্তাব করবেন হরিশংকর ত্রিপাঠির নাম। মহেন্দ্র বাজপাঈ সম্ভবত সমর্থন করবেন।"

"এখন আপনার কি অভিপ্রায় ?"

"এই ত রিপোর্টটা পেলাম ; এখনও ভেবে দেখি নি। আপনাকে জানালাম। পরামর্শ দিন।"

"মিলে-মিশে কাজ করতে পারা ত সবচেয়ে ভাল, কোশলজী।"

"নিশ্চয়। তবে রাজনীতিতে অনেক কিছু আছে যা মিশতে যদি-বা পারে, মেলে না কখনও।"

"তা ছাড়া, সুদর্শন তুবের আসল অভিসন্ধিটাও ভেবে দেখা দরকার।"

"এর পেছনে একটা চাল আছে, তুর্গাভাইজী। সুদর্শন তুবের চাল শুধু নয়, হরিশংকর ত্রিপাঠীরও।"

"কি চাল ?"

"সেটা ভাল করে জানতে হবে। আপনি ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন। যদি কিছু পরামর্শ দেবার থাকে, কৃপয়া টেলিফোন করবেন।"

"নিশ্চয়।"

টেলিফোন নামিয়ে রাখবার আগেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন টের পেলেন দুর্গাপ্রসাদ ঘরে ঢুকেছে। তিওয়ারী তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। ঘরে ঢুকে দুর্গাপ্রসাদ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাকিয়ে দেখল পিতৃদেবকে। চেহারায় চোখে পড়ার মত বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। মুখের হাড়গুলি প্রকটতর হয়েছে, চোখের নীচে ক্লান্তি। লক্ষ্য ক'রে দেখল, পিতাজীর গায়ের রং একটু ময়লা হয়েছে। চামড়া কিছুটা শিথিল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নও ছেলেকে দেখলেন। দীর্ঘ স্বাস্থ্যবান সুদর্শন দুর্গাপ্রসাদ। আধময়লা পায়জামা ও আজানুলম্বিত খদ্দরের কুর্তা পরেছে গেরুয়া রংএর। বুকে বোতাম নেই। কাচাপাকা চুল দেখা যাচ্ছে কয়েকটি। দুর্গাপ্রসাদের গৌরবর্ণ রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে; কানের দু'পাশে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল বাদামী রং ধরেছে। এক সময় সূক্ষ্ম সৌখিন গোঁফ রাখত। এখন পরিষ্কার কামান।

দুর্গাপ্রসাদ এগিয়ে গিয়ে হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলতে গেলেন, "প্রণামে প্রয়োজন নেই।"

বললেন, "বস। ভাল আছ ত?"

"আপনার কৃপায় কেটে যাচ্ছে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিওয়ারীকে বললেন, "তুমি এবার যাও। গোপালকৃষ্ণণ ত চারটেয় আসবে। একটু বাসও; সীতাচরণকেও খবর দিও।"

তিওয়ারী বিদায় নিলে, পুত্রকে, "তোমার স্ত্রীকন্যা সব ভাল?"

"জী হাঁ। আপনার শরীর একটু কাহিল মনে হচ্ছে।"

"তোমার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ", হেসে বললেন কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন। "চুলে পাক ধরেছে। আমি তোমার বাপ—কত বুড়ো হয়েছি জান?"

"বুড়ো আপনি হন নি?"

"হই নি? এখনও বেঁচে আছি তা হ'লে? কি বল?"

দুর্গাপ্রসাদ হেসে ফেলল।

"খুবই বেঁচে আছেন, পিতাজী।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "শুধু বেঁচে থাকা নয়। এখনও আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। কি বল, দুর্গাপ্রসাদ।"

"একশ' বার, পিতাজী।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আবৃত্তি করলেন, "দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ শব্দঃ পুণ্যস্থ কর্মণঃ। যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে॥"

পিতার কণ্ঠে বহুবার দুর্গাপ্রসাদ মহাভারতের এই শ্লোক শুনেছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বর্গ হ'তে দৈববাণী শুনছেন: পুণ্যকর্মের প্রশংসা স্বর্গ ও পৃথিবী স্পর্শ করে। যতকাল এই প্রশংসা থাকে, ততকালই মানুষ পুরুষরূপে গণ্য হয়।

মনটা ব্যথা করে উঠল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি; না ডাকলে তুমি ত আসবে না।"

"মাঝে-মধ্যে আমি আসি, পিতাজী। মা'র কাছে আসি।"

"তা জানি। আমার সামনে এসে দাঁড়াবার সাহস হয় না।"

"সাহসের অভাব নেই, পিতাজী।"

"তবে আসো নি কেন?"

"মৌকা হয় নি। আপনি আপনার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আমি আমার কাজে লেগে আছি। আমাদের পথ আলাদা হ'য়ে গেছে, পিতাজী। লক্ষ্যও আলাদা। তা ছাড়া, আপনি আপনার মুখদর্শন করতে বারণ করেছিলেন।"

"তা করেছিলাম।"

"কিছু প্রয়োজন আছে আমাকে, পিতাজী?"

"আছে। একটু স্থির হয়ে বস। তোমার সঙ্গে কথা আছে। কাজ আছে।"

দুর্গাপ্রসাদ তাকিয়া নিয়ে বসল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন রইলেন।

পরে বললেন, "উদয়াচলের রাজনৈতিক খবর নিশ্চয় রাখ।"

"মোটা মোটা খবরগুলি রাখি বৈ কি।"

"কাল আমাদের পার্টির নতুন দলপতি নির্বাচন, জান নিশ্চয়।"

"জানি।"

"তোমার কি মনে হয়? আমি জিতব?"

"আমি ত এ নিয়ে ভাবি নি, পিতাজী! আপনি জিতবেন, ধরে নিয়েছি।"

"কারণ?"

"আপনি সাধারণত হারেন না।"

"এটা সাধারণ ব্যাপার নয়।"

"সুদর্শন দুবে আর হরিশংকর ত্রিপাঠী আপনার উপযুক্ত প্রতিপক্ষ নয়।"

"ঠিক বলছ?"

"আমার তাই ধারণা। কংগ্রেস রাজনীতি এমন নীচে নেমে গেছে, পিতাজী, যে আজ বোধ করি সবকিছু সম্ভব। কিন্তু আপনি দুবেজী ও ত্রিপাঠীজীর কাছে হেরে গেলে অবাক হব।"

"তোমাকেই প্রথম বলছি, শোন। আমি হারব না। জিতব।"

দুর্গাপ্রসাদ চুপ করে রইল।

"শুনে খুশি হ'লে না?"

"আলবৎ, পিতাজী।"

"আমি জিতব।" আর, তাই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।"

"আপনার এ জয়ের সঙ্গে ত আমার কোনও সম্পর্ক নেই, পিতাজী।"

"এত একরোখা কথা বোলো না। এ-সব আলোচনার আগে তোমাকে দুটো অন্য কথা বলতে চাই।"

"বলুন।"

"আমি উইল করেছি।"

"শুনেছি!"

"তোমার গর্ভধারিণীর কাছে?"

"হ্যা।"

"আমার সম্পত্তির অংশ থেকে তুমি বঞ্চিত হয়েছ।"

"সম্পত্তিতে আমার লোভ নেই, পিতাজী।"

"অবশ্য একটা সর্ত আছে। তুমি তোমার অংশ পাবে যদি আমি বেঁচে থাকতে কংগ্রেসে ফিরে আস।"

"তখন নিশ্চয় সম্পত্তির প্রয়োজন হবে।"

"দ্বিতীয় কথা হ'ল, চন্দ্রপ্রসাদকে নিয়ে।"

"বলুন।"

"তার কিছু খবর রাখ?"

"সে ত প্রায়ই আসে আমাদের বাসায়। কমলা—মানে, আপনার পুত্রবধূর সঙ্গে তার খুব ভাব।"

"তাই বুঝি! চন্দ্রপ্রসাদ এয়ারফোর্সে কমিশন পেয়েছে।'

"জানি।"

"শুনে সুখী হয়েছি। নিজের যোগ্যতায়, আমার সাহায্য ছাড়াই, সে কিছু করতে পেরেছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব সুখের বিষয়।"

"এবার তার বিবাহ দিতে হবে।"

"সে ত বসন্তকে বিবাহ করবে ভাবছে।"

"ও, তুমি তাও জান।"

"বসন্তকে নিয়ে সে দিনচারেক আগে আমাদের বাসায় এসেছিল।"

"তাই বুঝি? তা হ'লে তুমি ত সবই জান।"

"অন্তত এ ব্যাপারটা এক-আধটু জানি।"

"বিয়ে হ'লে ভালই হয়, কি বল? বসন্ত মেয়েটি ভালই।"

"জী, হ্যাঁ।"

"কিন্তু দুর্গাভাই আমার কাছে বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে আসবেন না। তিনি অত্যন্ত অহংকারী। প্রস্তাব নিয়ে আমাকেই তাঁর কাছে যেতে হবে।"

"তার বোধ হয় প্রয়োজন হবে না।"

"কেন? দুর্গাভাই রাজী হবেন না?"

"মাতাজী সব ব্যবস্থা করেছেন, মনে হচ্ছে। দুর্গাভাইজীকে পত্র লিখে অনুরোধ করেছেন, চন্দ্রপ্রসাদ যদি কিছু প্রার্থনা করে তিনি যেন মঞ্জুর করেন। চন্দ্রপ্রসাদকে মাতাজী বলেছেন সে নিজেই যেন দুর্গাভাইজীর সম্মতি চায়, আপনাকে পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে কন্যার পিতার কাছে যেন যেতে না হয়। চন্দ্রপ্রসাদ বোধ করি কালকের পার্টি মিটিংএর অপেক্ষায় আছে। আপনার জয়লাভের পর নিজেই সে বসন্তকে নিয়ে দুর্গাভাইএর অনুমতি চাইবে।"

"হুঁম্। প্ল্যানটা মন্দ নয়। যদি আমার জয় না হয়?"

"তা হ'লে সপ্তাহ খানেক পরে সম্মতি চাইবে।"

"শুনছি মনোরমা দেবী এ বিবাহে সম্মতি দেবেন না।"

"না দেওয়াই সম্ভব।"

"তাতে আটকে যাবে না ত?"

"চন্দ্রপ্রসাদ বলে, আটকাবে না।"

"তুমি জান নিশ্চয়, মনোরমা দেবী চান দুর্গাভাই মুখ্যমন্ত্রী হোন।"

"যেমন আমাদের মা চান, আপনি রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে বানপ্রস্থ নিন।"

"তোমার জননী অবশ্য মনোরমা দেবীর চেয়ে অনেক রগচটা। দুর্গাভাই অর্থমন্ত্রী থাকলেও মনোরমা দেবী দিব্যি তার গৃহ অলঙ্কৃত করবেন। আর, আমি বনবাস না নেবার অপরাধে তোমার মা কাশীবাসী হচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। মা আজ রাত্রেই কাশী যাচ্ছেন।"

"আজ রাত্রেই!"

"জী হ্যাঁ।"

"কে নিয়ে যাচ্ছে?"

"চন্দ্রপ্রসাদ।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নীরব হ'লেন।

দুর্গাপ্রসাদ বলল, "আপনাকে দেখে অবাক্ লাগছে, পিতাজী। কাল আপনার এত বড় একটা কন্‌টেষ্ট, আর আজ আমার সঙ্গে বসে পারিবারিক ব্যাপার আলোচনা করছেন!"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মৃদু হেসে বললেন, "রিল্যাক্স করছি। তোমাকে বহুদিন পরে দেখে বেশ ভাল লাগছে। সাংসারিক কথা বলবার মত একটা লোকও আর বাড়ীতে নেই। তোমার মা ত আমাকে দেখলেই নীতিকথা শোনান—তাঁর মতে আমার মত গর্হিত মানুষ দ্বিতীয় নেই। তোমার ভাইগুলো সব মূর্খ, দাম্ভিক, পিতৃ-নির্ভর। এক চন্দ্রপ্রসাদ। মাঝে-মধ্যে তারই সঙ্গে দু'-একটা কথা বলি।"

দুর্গাপ্রসাদ কিছু বলল না।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হেসে বললেন, "বনবাসের কথা হচ্ছিল না একটু আগে? আমি যে কথাটা ভাবি নি তা নয়। কেন এদেশে আমরা বৃদ্ধেরা ক্ষমতা আঁকড়ে আছি, কেন নতুনদের জন্যে রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছি না? তার অনেক কারণ আছে। ঐতিহাসিক কারণটাই ধর। গান্ধীজীর আন্দোলন শুরু হ'ল উনিশশ' একুশে, ভারত স্বাধীনতা পেল

সাতচল্লিশে। এই ছাব্বিশ বছরে সবাই বুড়ো হয়ে গেলাম। তরুণ নেহেরুও পঞ্চাশোর্ধ! আমাদের বৃদ্ধদের ডাক পড়ল কেন্দ্রে ও প্রদেশে রাজত্বভার গ্রহণ করতে। ঊনিশশ' ত্রিশ থেকে নতুন যুবকেরা কংগ্রেসে আসা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল, তারা গঠন করেছিল যত সব সন্ত্রাসবাদী দল। এমনকি বিয়াল্লিশে যে শেষ আন্দোলন হ'ল তার আগুনে যারা পুড়ল তারা বেশির ভাগই সমাজতন্ত্রী দলের লোক। আমরা ত সব জেলে। অতএব, দেখতে পাচ্ছ, আজ দায়িত্ব ছেড়ে দেব এমন উপযুক্ত লোকও আসেপাশে দেখতে পাই নে।"

"তা ঠিক, পিতাজী।"

"তা ছাড়া, ছেড়ে দিয়ে কি করব, কোথা যাব? ভারতবর্ষে রাজনীতি নতুন পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একান্ত মধ্যবিত্ত ও ধনীর রাজনীতি। আমরা যারা এর মধ্যে এসে গেছি, আমাদের আর কোনও অর্থনৈতিক বা সামাজিক ভিত্তি নেই। আরও বহু বছর দেখবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতারা অবসর নেবেন না। প্রত্যেকে চাইবেন রাজপদে অধিষ্ঠিত থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে। অবসর নিয়ে যাবেন কোথায়? ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় অন্য অবস্থা। আজ যিনি সেক্রেটারী অব ষ্টেট কাল তিনি ফোর্ড কোম্পানীর ডিরেক্টর। আজ যিনি মন্ত্রী, কাল তিনি ফিরে যেতে পারেন তাঁর ট্রেড-য়ুনিয়নে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কারখানায় বা কোম্পানীতে। আমরা সে সব খুইয়ে রাজনীতিতে এসেছি। আমাদের অন্য কোন 'বেস' নেই।"

"তা ছাড়া, ক্ষমতার মাদকতাও আছে, পিতাজী।

"নিশ্চয় আছে। পাওয়ার কেউ ত্যাগ করতে চায় না। যে চায় বা পারে সে ত ঋষি। আরও অনেক কারণ রয়েছে। এ সামান্য ক' বছরেই আমাদের মূল্যবোধ একেবারে বদলে গেছে। দুর্গাভাই দেশাই-র মত অমন নীতিবাগীশ লোকও মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করার কথা ভাবতে পারেন না। তার কারণ, যে ধরনের দেশসেবা সারা-

জীবন তিনি করে এসেছেন, আজ আর তাতে সম্মান নেই, আকর্ষণ নেই। আজ গ্রামে সংগঠন করে, চরকা কেটে, গান্ধীবাদ ছড়িয়ে, গ্রামবাসীকে আত্মনির্ভর করার চেষ্টায় কোনও তৃপ্তি বা সার্থকতা নেই।"

"শুনেছি, দুর্গাভাইজী নিজেও তাই বলেন।"

"আমার কথা আলাদা। এ বয়সে আমি নিশ্চয় কুষাণপুরে গিয়ে ওকালতি করব না। আমার কাব্যচর্চা আছে। মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে অবসর নিলে আমার নিশ্চয় একটি রাজ্যপালত্ব মিলবে। শুনেছি মস্কোয় আমাদের এক রাষ্ট্রদূত দু' বছর ধরে কেবল ভগবদ্গীতা ও উপনিষদ ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। আমিও কোনও প্রাদেশিক রাজধানীর রাজভবনে কয়েকবছর—হয়ত মৃত্যু পর্যন্ত—বিরাট আরামে কাব্যচর্চা করে যেতে পারি। কিন্তু আমার রক্তে এখনও সংগ্রামের নেশা। উদয়াচলের নানা সমস্যার মোকাবিলা করতে এখনও রক্ত আমার যৌবনের উদ্দামতায় নেচে ওঠে। একটা নতুন কারখানা দেখলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হই ; নতুন কোনও কৃষি-উন্নয়ন দেখলে চোখে জল আসে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়তে এখনও আমার উৎসাহের শেষ নেই। এই যে সুদর্শন দুবের সঙ্গে কিছুদিন পাঞ্জা লড়তে হ'ল, আমাকে যেন কিসের নেশায় পেয়ে বসল ; সুদর্শনকে পরাস্ত করা যে কত সহজ তা সে জানে না। আমার একমাত্র আফসোস লড়াইটা বড় সহজে শেষ হয়ে এল।"

দুর্গাপ্রসাদ বলল, "মা বলছেন, জিতবার জন্যে আপনি এবার অনেক মূল্য দিয়েছেন।"

"দিয়েছি হয়ত", কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "দিয়েছি কিনা পরিণামে বোঝা যাবে। রাজনীতির খেলায় রমণীর ন্যায়বুদ্ধি দিয়ে জয়লাভ অসম্ভব। সুদর্শন দুবেকে তারই অস্ত্রে পরাজিত করতে হয়েছে। তাতে কোনও অন্যায় নেই। শত্রুকে তার নিজের অস্ত্রে পরাজিত করা প্রাচীন নীতি। চেয়েছিলাম বর্তমান মন্ত্রীসভার কয়েকজনকে

বাদ দেব নতুন মন্ত্রীত্ব গঠনের সময়। হয়ত তা সম্ভব হবে না। হয়ত এমন দু'একজনকে মন্ত্রীসভায় স্থান দিতে হবে যা, অন্য অবস্থায়, আমি করতাম না! কিন্তু রাজনীতির খেলাই এই। এ খেলা খেলতে যার অরুচি, এ পথে তার পা দিতে নেই।"

দুর্গাপ্রসাদ বলল, "আপনি এসব কথা আমাকে কেন বলছেন বুঝতে পারছি না। আমি আপনাকে মা'র মত ন্যায়-নীতির মাপ-কাঠিতে বিচার করি না।"

"তুমি ত দিনরাত আমার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বেড়াও।"

"আপনার রাজনীতির বিরুদ্ধে, আপনার দল, গভর্ণমেন্ট, মত, পথ ও পাথেয়ের বিরুদ্ধে।"

"এতে তোমার কি লাভ হচ্ছে, ভেবে দেখেছ? দু'বার জেল খেটেছ। আর একবার খাটবে শীগগিরই। চেহারা কি হয়েছে বোধ করি তাকিয়েও দেখ না।"

"পিতাজী, আমি আপনার পুত্র। সহজে ভাঙ্গি না। নরমও হই না।"

"তুমি এই ভুল পথে কেন চলছ?"

"ভুল পথ নয়, পিতাজী। আপনি ও আমি দুই বিপরীত প্রবাহ। আপনি রাজনীতিতে নেমেছিলেন ব্যক্তিগত স্বার্থের তাগিদে। আমি এসেছি আদর্শের তাড়নায়। আপনি চিরজীবন শুধু একটি মাত্র প্রেমে মজে রয়েছেন। তার নাম আত্মপ্রেম। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ছাড়া আর কাউকে আপনি সত্যিকারের ভালবাসেন নি, শ্রদ্ধা করেন নি, স্বীকারও করেন নি। আমার মধ্যে আরও দু'-একটা প্রেম আছে, পিতাজী। আমি এ দেশটাকে সত্যিকার ভালবাসি। এ দেশের মজদুরদের—যাদের নিয়ে আমার কাজ—আমি ভালবাসি।"

"তোমরা সব ধার-করা বিদেশী বুলির উদ্গারে নিজেকে ও দশজনকে বিভ্রান্ত করছ। ভারতবর্ষকে তোমরা না জান, না চেন।

এই প্রাগৈতিহাসিক মাটিতে আমদানী রাজনীতির বা সমাজনীতির বীজ কোনও দিন ভাল ফসল দেবে না।"

"আপনারাও ত বিদেশী রাজনীতির বীজ বপন করে তাব অঙ্কুরকে নারায়ণের আসনে বসিয়ে দেশশাসনের পূজা চালিয়ে যাচ্ছেন। দক্ষিণা যৎসামান্য হ'লেও, যা কিছু দেওয়া হচ্ছে তার প্রায় সবটাই 'ব্রাহ্মণায় অহং দদামি'।"

"কথাটা মন্দ বল নি", কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাঁকা হাসলেন। "সত্যি আমরাও বিদেশী বীজ বপন করেছি। এই গণতন্ত্র, পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেসী। টিঁকবে কি না একমাত্র ভগবান জানেন। আমাব মনে গভীর সন্দেহ। যে শাসনপ্রণালীর শিকড় জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতিব মধ্যে দীর্ঘ-প্রসারিত নয়, তা সাধারণত টিকতে চায় না। আসল কথা কি জান? এ দেশে দীর্ঘকাল কোন রাজনৈতিক চিন্তাধারা গঠিত হয় নি। ১৮৮৫ সালে যাঁরা কংগ্রেস স্থাপন করেছিলেন তাদের কাম্য ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যে আব একটু সম্মানের সঙ্গে বাস করার সুযোগ। তারপর একদিকে জেগে উঠল আমাদের জাতীয়তাবোধ, অন্যদিকে আমরা ইংরাজের রাজত্ব-তন্ত্রের মোহে জড়িয়ে পড়লাম। ভারতীয় জাতীয়তা ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্য ভারতের উপযোগী কোনও শাসনপ্রণালী সৃষ্টি করল না। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নেতারা যতই না স্বদেশী হন, আসলে শিক্ষায়, দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে তাঁরা ইংরেজদেব দোসর। এর ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়। প্রথম ব্যতিক্রম ছিলেন তিলক; কিন্তু গান্ধীজীর তাঁকে পছন্দ ছিল না; গান্ধীযুগেই তিলকেব প্রভাব শেষ হয়ে এসেছিল। সবচেয়ে বড় ব্যতিক্রম ছিলেন গান্ধীজী। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ তার নিজের ঐতিহ্য থেকে স্বকীয় শাসনব্যবস্থা তৈরী করে নিক। কিন্তু গান্ধীজী ত রাজত্বের ভার নেন নি, তা ছাড়া তিনি বেঁচেও রইলেন না। সুতরাং আমরা বিপুল উৎসাহে এক বিদেশী ব্যবস্থাকে কার্যকরী করবার দুঃসাহসে

লিপ্ত হ'লাম। এ ব্যবস্থা টিঁকবে কি না তা নিয়ে আমাদের মনে সন্দেহের শেষ নেই। কিন্তু প্রকাশ্যে আমরা তা স্বীকার করতেও অনিচ্ছুক।"

দুর্গাপ্রসাদ বলল, "শাসন-প্রণালী টিকুক আর নাই টিকুক, আসল ব্যবস্থা আপনারা পাকা করে দিয়ে যাচ্ছেন। সমাজ-তন্ত্রের নামে এক বলশালী ধনিক-জমিদার-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন।"

"এটাও বিদেশী বুলি। আমরা পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসীর ডাক তুলে যেমন লোকেদের ধোকা দি, তোমরাও সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের পতাকা তুলে তাই কর। আমরা যদি শিব গড়তে বাঁদর গড়ে থাকি, তোমরা হয়ত গড়ে তুলবে এক ভয়ানক অজগর! ইতিহাস বিচিত্র পন্থায় মানুষের ওপর প্রতিশোধ নেয়। এটা মনে রেখ।"

"তা নেয়। তবু সংগ্রাম চলে। মানুষ চিরদিন আদর্শের জন্য লড়ে এসেছে। চিরদিন লড়বে।"

"তাতে আমার আপত্তি নেই। আপত্তি হ'ল, মিথ্যা আদর্শের জন্য লড়াইএ। আদর্শ ভুল হ'লে অত ক্ষতি নেই, ভুল করা মানুষের স্বাধিকার! ভুল শোধরাবার সুযোগ আসে। কিন্তু এমন আদর্শ আছে যা শেষ পর্যন্ত মিথ্যা: মরীচিকার মত সে কেবল টানে, কখনও ধরা দেয় না।"

"মাপ করবেন, পিতাজী। অমন কোনও আদর্শের প্রতি আমার আনুগত্য নেই।"

"ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চিন্তাধারা গঠিত হবার সুযোগ ছিল, কিন্তু তার ব্যবহার করা হয় নি। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রম' হ'ল একমাত্র রাজনৈতিক গ্রন্থ। কিন্তু মহাভারতের শেষের দিকে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজকার্য পরিচালনায় যে-সব উপদেশ দিয়েছিলেন, আমার মনে হয় তাই হ'ল ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক

ঐতিহ্য। মহাভারতের সে অংশটা ইচ্ছে হ'লে একবার পড়ে দেখ।

সেই যেখানে ভীষ্ম বলছেন, রাজকার্যে কাউকে কদাচ পূর্ণ বিশ্বাস করবে না, এমনকি নিজের পুত্রকেও না?

খুব সত্যি কথা। খুব সত্যি কথা। আরও বলেছেন, সব কাজ সরলভাবে করবে, কিন্তু নিজের ছিদ্রগোপন, পরের ছিদ্রান্বেষণ এবং মন্ত্রণাগোপন বিষয়ে সরল হবে না।"

"মেকিয়াভ্যালিও একই কথা বলেছেন।"

"তামাসা করো না। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে প্রশ্ন করলেন, কোথায় কোথায় দুর্গ স্থাপন করতে হবে বলে দিন। ভীষ্ম ছয় প্রকার দুর্গের উল্লেখ করে বললেন, সবচেয়ে দুর্জেয় হ'ল মনুষ্যদুর্গ। অর্থাৎ মানুষের হৃদয় জয় করা সবচেয়ে কঠিন কাজ। এবং রাজাকে তাই করতে হবে। যুধিষ্ঠির জানতে চাইলেন, রাজা কোন্ কোন্ প্রকারের লোককে বিশ্বাস করবে। ভীষ্ম বললেন, রাজার মিত্র চার প্রকার। সমার্থ, যাঁর স্বার্থ রাজার স্বার্থের সমান; ভজমান যাঁরা তাঁর অনুগত; সহজ, অর্থাৎ আত্মীয়, এবং কৃত্রিম, যাঁরা অর্থদ্বারা বশীভূত। এ ছাড়া এক পঞ্চম মিত্র আছেন—'তিনি ধর্মাত্মা। তিনি যে পক্ষে ধর্ম দেখেন সে পক্ষের সহায় হন; সংশয়-স্থলে নিরপেক্ষ থাকেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখে কৌতুক-হাসি দেখে দুর্গাপ্রসাদ প্রশ্ন করল, "বর্তমান পরিস্থিতিতে ভীষ্মের এই বিবৃতি কতখানি প্রয়োগ করা যায়, পিতাজী?"

"অনেকখানি। আমার 'সহজ' মিত্র ছাড়া আর তিন রকম মিত্রই আছে। 'কৃত্রিম'দের সংখ্যা বর্তমানে কিছু বেড়েছে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এঁরা অনেকেই 'ভজমান' অথবা 'সমার্থ' হবেন।"

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "তোমাকে ডেকে পাঠাবার জরুরী কোনও কারণ ছিল না। কিছুদিন হল তোমার

কথা মনে হচ্ছিল। নতুন ক'রে আর একবার উদয়াচলের যাবতীয় কংগ্রেস নেতাদের ঘেঁটে দেখতে হ'ল। জিলা কংগ্রেস থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেস পর্যন্ত যাদের কিছুটা নেতৃত্ব আছে বর্তমান সঙ্কটের সুযোগ নিতে তারা সবাই তৎপর। এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে তোমার কথা মনে হ'ত। তুমি আমার পুত্র বলে নয়। উদয়াচলের কংগ্রেসে তুমি একদিন সবার ওপরে স্থান পেতে পারতে। তোমার যোগ্যতা ছিল। তোমার নেতৃত্বে এ প্রদেশের উন্নতি হ'ত, বহু মানুষের কল্যাণ হ'তে পারত। তাই ভেবেছিলাম তোমাকে ডেকে আর একবার বলব। পিতা হিসাবে নয়, উদয়াচলের নেতা হিসাবে।"

"পিতাজী, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমার পথ আমি বেছে নিয়েছি।"

"তুমি আমার বিরুদ্ধে লোক ক্ষেপাচ্ছ। কাল তোমাদের শোভাযাত্রা বেরুচ্ছে। জনসভায় কাল তুমি তআমার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছ।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কণ্ঠে এবার কাঠিন্য।

"উদয়াচলের সরকারের বিরুদ্ধে, সরকারী নীতি ও কার্যাবলীর বিরুদ্ধে।"

"এতে তোমার লাভ?"

"কিছু আছে, পিতাজী।"

"আমি খবর পেয়েছি, সুদর্শন দুবে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল।"

"জী হাঁ।"

"আমার বিরুদ্ধে তোমার সাহায্য চেয়েছিল।"

"তাই ত স্বাভাবিক।"

"তোমার ভাইদের জন্য আমি কি কি করেছি জানতে চেয়েছিল?"

"জী। ক'খানা বাড়ী আপনি তৈরী করেছেন, কতখানি জমি কিনেছেন, এমনি আরও অনেক কিছু।"

"তুমি দিয়েছ ?"

"এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না পিতাজী।"

"যদি না দিয়ে থাক, তা হলে জেনে রাখ, তুমি দিলেও আমার হার হবে না।"

"আপনার হার আমি চাই নে, পিতাজী।"

ঘড়ির দিকে চেয়ে ব্যস্ত হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

"লোক বসে আছে আমার জন্য। তুমি আজ এস।"

দুর্গাপ্রসাদ হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তার মুখের দিকে আর একবার তাকালেন।

"কাছে এস।"

মাথায় হাত রেখে বললেন, "নিজের পথে চলতে ভয় পেও না। আমার কোনও কাজের অর্থ যদি না বুঝতে পার, আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে চেষ্টা ক'রো।"

দুর্গাপ্রসাদ নীচে নেমে সোজা ফাটকের দিকে অগ্রসর হ'ল ফাটকের সামনে একখানি পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করছিল।

সে ফাটক অতিক্রম করতেই একজন পুলিশ অফিসর এগিয়ে এল।

বিস্মিত দুর্গাপ্রসাদের অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাবে বলল "আপনাকে একবার আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

"গ্রেপ্তার ?"

"অপরাধ নেবেন না। আমি আদেশ পালন করছি মাত্র।"

"অপরাধ ?"

"আপনি যে 'বেইলে' আছেন তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। পুরাতন অপরাধের অভিযোগেই আপনাকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম হয়েছে।'

"কাব হুকুম ?"

"ডেপুটি কমিশনারের।"

দুর্গাপ্রসাদের মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে এসেছিল, পিতাজী জানেন ? নিজেকে সামলে সে প্রশ্ন করল : "একবার কিছুক্ষণের জন্য বাড়ী যেতে দেবেন তো ? পরিবারকে খবরটা দিয়ে দি, আর জামাকাপড় কিছু নিয়ে নি। কি বলেন ?"

"নিশ্চয়।"

"চলুন।"

আঠার

পদ্মাদেবীর পত্র-পাঠ করে দুর্গাভাইয়ের চিত্ত যুগপৎ ব্যথিত, চমৎকৃত ও বিস্মিত হল। স্বামীকে ত্যাগের উদাস পথে আনতে না পেরে পত্নী নিজেই সংসার ত্যাগ ক'রে কাশী চলে যাচ্ছেন; একমাত্র পুণ্যপ্রাচীন ভারতবর্ষ ছাড়া এই জীবন্ত দৃষ্টান্ত আজ আর কোথায় মিলবে?

পদ্মাদেবীর পত্রের সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায় কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা পরিস্ফুট। "দেখবেন, অতবড় মানুষটা যেন অনেক নীচে নেমে না যান।" কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ভাবতে গিয়ে দুর্গাভাই বুকে কোথায় কেমন একটা বেদনা অনুভব করলেন, সত্যিই "এতবড় মানুষ।" অসীম দুঃসাহস; বিরাট বুকের পাটা; এই বয়সেও কী অক্লান্ত শ্রমশক্তি। দশজনকে যে মাপ-কাঠিতে বিচার করা যায়— তিনি যেন তার বাইরে। অথচ তার সহধর্মিনী যে সাধারণ ন্যায় নীতির মাপকাঠিতেই তাকে বিচার করেছেন। রাজনীতিতে "নেমে যাওয়া" কাকে বলে? কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুনর্বার মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্য কি কি অস্ত্র ব্যবহার করেছেন দুর্গাভাই-এর তা জানা নেই। তিনি শুধু এটুকু বুঝতে পারছেন যে মন্ত্রীদের মধ্যে যাঁরা তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই এখন গোপনে তাঁর সঙ্গে মিতালী করছেন বা করতে চাইছেন। এমন কি সুদর্শন দুবেও তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী। কিন্তু কি দাম দিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এ অসামান্য সাফল্য কিনতে হয়েছে তিনি জানেন না। অথচ এই নিয়েই পদ্মাদেবীর প্রধান দুঃশ্চিন্তা! তার দৃঢ় বিশ্বাস, পতিত মন্ত্রীসভাকে পুনরায় দাঁড় করিয়ে তার উপর নেতৃত্ব করবেন যে-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল তাঁর সঙ্গে এত দিনের গৌরব-দৃপ্ত মানুষটির বিশেষ সামঞ্জস্য থাকবে না। যে-সব

এম. এল. এ-দের সুদর্শন দুবে হাত করেছিল তাদের নিজের তাবুতে ফিরিয়ে এনেছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিসের জোরে? কেন এরা তাকে ত্যাগ করে সুদর্শন দুবের দলে ভিড়েছিল, আবার কেনই বা সুদর্শনকে ত্যাগ ক'রে তাঁর কাছে ফিরে এল? দলীয় রাজনীতির এই রহস্যময় অন্ধকার দিক্ দুর্গাভাই কৃপাভাই দেশাইর অজানা: আজকার আগে এনিয়ে এতখানি কৌতূহল কখনও তার হয় নি। অথচ এ কৌতূহল মেটাবার সাহস তাঁর নেই। না-জানার শুচিশুদ্ধতাটুকু তাঁর কৃপণের ধন। জানলে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মন্ত্রীসভায় তাঁর পক্ষে থাকা সম্ভব নাও হ'তে পারে।

চন্দ্রপ্রসাদ সম্বন্ধে পদ্মাদেবীর অনুরোধ রহস্যে ভরা। সে যে নিজের চেষ্টায় এয়ারফোর্সে কমিশন পেয়েছে তাতে দুর্গাভাই খুশি; ছেলেটাকে তার বেশ পছন্দ। কিন্তু তার কাছে চন্দ্রপ্রসাদের কি চাইবার আছে? এমন কোন 'ফেবার' যা পিতার কাছে চাওয়া সম্ভব নয়? দুর্গাভাইয়ের মন অনুদার হল। না, তা নিশ্চয়ই নয়; তাহ'লে পদ্মাদেবী অমন ক'রে অনুরোধ জানাতেন না।

দুর্গাভাই দান মেকে দপ্তর-ঘরে গিয়ে বসলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে ফোন করা দরকার।

গৌরশংকর ত্রিপাঠীর অনুরোধ না-মঞ্জুর করার কথাটা জানাতে হবে। মারোজিনী সহায় যে দেখা করতে আসছে সেটাও বলে রাখা ভাল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানতে পারবেন নিশ্চয়। পরশু রাত্রির ঘটনাও তাঁর জানা।

কিছুক্ষণ পরে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকেই টেলিফোন এল। দুর্গাপ্রসাদ কোশলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মামলার সুপরিচালনার জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা ব'লে দুর্গাভাই কাজে মনোনিবেশ করলেন।

দুর্গাভাই জানেন দুর্গাপ্রসাদ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রিয়তম, যোগ্যতম

পুত্র। তার রাজনীতি বিপ্লবাত্মক। গান্ধীপন্থী দুর্গাভাই শ্রেণী সংগ্রামে অবিশ্বাসী। সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ তাঁর প্রিয়, কিন্তু সংঘাতের, রক্তিম বিপ্লবের পথ তাঁর গ্রাহ্য নয়। তাছাড়া, তাঁর ধারণা, ভারতবর্ষের একটা বিশেষ মিলনাত্মক ঐতিহ্য আছে; তার গুরুত্ব বহুকে এক করায়, এককে বহু করায় নয়। সমন্বয়ে। বিভক্ত করায় নয়। সুতরাং বিপ্লব বলতে তিনি গান্ধীবাদের চেয়ে বড় কিছু আছে ব'লে মনে করেন না। সবচেয়ে বড় এবং স্থায়ী বিপ্লব হল মানুষকে নিয়ে। যে-বিবর্তন মানব মনের পরিবর্তন সাধন করে না, তার প্রতি দুর্গাভাইএর আকর্ষণ নেই। তথাপি মুখ্যমন্ত্রী-পুত্র দুর্গাপ্রসাদকে তিনি খানিকটা শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, যেহেতু তার নিজের পথে চলবার সাহস আছে, নিজের আদর্শের জন্য কষ্ট ভোগ করতে সে রাজী। দুবার তার জেল হ'য়ে গেছে। দুর্গাভাই জানেন আজকার জেল-জীবনে তাঁদের সময়কার কারাবাসের গৌরব নেই। স্বাধীন ভারতের জেল বন্দী-জীবনের পক্ষে ইংরাজ আমলের চেয়ে দুঃসহ। দুর্গাপ্রসাদ দুবারই দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী হ'য়ে সত্যিকারের কষ্টের মধ্যে দেড় বছর কাটিয়েছে। তার বর্তমান অপরাধ এমন কিছু গুরুতর নয়। কাপড়ের কলে ধর্মঘটের সময় আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অপরাধে কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রমিকদের দুজন বাদে সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপ্রসাদের বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষী নেই; সে বলেছে যে ঘটনা স্থলে তার উপস্থিতি পুলিশের মস্তিষ্ক প্রসূত 'সত্য'। বোধ করি তাই; নতুবা পুলিশ এ কেস সম্বন্ধে এতটা ক্ষীণোৎসাহ হত না। পাবলিক প্রসিকিউটর বলেছিলেন কেসটা তুলে নেওয়া হোক, কিন্তু পাছে মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন যে বিনা কারণে তাঁর পুত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে সে ভয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষ রাজী হন নি। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিশ্চয়ই ব্যাপারটা সব জানেন। অথচ কেস যাতে ভালভাবে চলে, দুর্গাপ্রসাদ যেন সহজে রেহাই না পায় এ ইচ্ছে তিনি কেন প্রকাশ

করলেন দুর্গাভাই সহজে বুঝে উঠতে পারলেন না। নতুন কোন কারণে কি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুর্গাপ্রসাদের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়েছেন? বর্তমান মন্ত্রীত্ব সংকটে কি দুর্গাপ্রসাদ সুদর্শন দুবেকে কোনও রকমে সাহায্য করেছে?

হোম সেক্রেটারীকে ফোন করলেন দুর্গাভাই। মুখ্যমন্ত্রীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। এবং তারপরে যা শুনলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না।

হোম সেক্রেটারী বললেন, "আপনি জানেন নিশ্চয়, স্যর, কোশলজী আরও একটা অর্ডার পাঠিয়েছেন।"

"কি অর্ডার?"

"দুর্গাপ্রসাদজীকে আর একটু পরে গ্রেপ্তার করতে হবে।"

"তাই নাকি? কেন?"

"হ্যাঁ স্যর। দুর্গাপ্রসাদজী এখন কোশলজীর সঙ্গে খাস-কামরায় বাংচিৎ করছেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী ভবনের বাইরে এলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করতে হবে।"

"মুখ্যমন্ত্রী ভবনের বাইরে এলেই?"

"জী। দুর্গাপ্রসাদজী এখন 'বেইলে' আছেন। 'বেইল' প্রত্যাহার করা হয়েছে। পুরাতন অভিযোগেই তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।"

দুর্গাভাইর বিস্ময়ের সীমা রইল না। মনে পড়ল, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আগে থাকতেই তাঁকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন। অথচ কি কারণে এমন নাটকীয় ঘটনার ব্যবস্থা মুখ্যমন্ত্রী করতে বাধ্য হলেন তা দুর্গা ভাই-এর হৃদয়ঙ্গম হল না। খুব বড় কারণ না থাকলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে দুর্গাপ্রসাদকে মুখ্যমন্ত্রী ভবনের সামনেই পুলিশের হাতে তুলে দেবেন না, এ বিশ্বাস দুর্গাভাইএর ছিল। একমাত্র একটাই সম্ভবপর কারণ তিনি খুঁজে পেলেন। দুর্গাপ্রসাদ নিশ্চয়ই পিতার বিপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উদয়াচলে কংগ্রেসী শাসনকে দুর্বল করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের গুপ্তচরেরা তার কার্যকলাপের

পূর্ণ বিবরণ নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছে। নতুবা এই নিদারুণ ঘটনার প্রয়োজন কিছুতেই হত না।

অনেকটা শান্ত হলেন দুর্গাভাই। অন্তরে একদিকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল। মনে পড়ল মুখ্যমন্ত্রী একদিন বলেছিলেন, যারা রক্তাক্ত বিপ্লব চায় এবং নিজেদের বামপন্থী বলে, তাদের কাছে পথের অর্থ কেবল লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য। "ধরুন, বর্তমান মন্ত্রী-সংকট। এরা জানে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল, সুদর্শন দুবে অথবা হরিশংকর ত্রিপাঠীর চেয়ে ভাল মুখ্যমন্ত্রী! জানে বলেই তাঁর পতন ঘটাতে এদের এত উৎসাহ। সুদর্শন দুবে বা হরিশংকর ত্রিপাঠীকে মুখ্যমন্ত্রী করতে পারলে উদয়াচলের শাসন দুর্বল ও জন-কল্যাণ পঙ্গু হবে; জন সাধারণের অসন্তোষ যাবে বেড়ে, এবং এদের আন্দোলন করবার মত ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।" কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সত্যিই রাজনীতি বোঝেন। এই যে প্রিয়তম পুত্রের হাতে নিজেই নিজ ভবনের দ্বারদেশে পুনরায় শৃঙ্খল পড়ালেন এর পেছনে তাঁর কংগ্রেস-প্রেম ও উদয়াচলের মঙ্গলের জন্য আন্তরিক আবেগ রয়েছে।

অন্য দিকে, দলীয় রাজনীতি দুর্গাভাইএর কাছে আরও কদর্য ও বিভীষিকাময় রূপে দেখা দিল। যে-রাজনীতিতে বিপক্ষ পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের সাহায্য নেয়, তার বাইরে থাকতে পারার জন্য তিনি পুনর্বার নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলেন

চিন্তাকুল চোখে দেখতে পেলেন চন্দ্রপ্রসাদ দপ্তরঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। সাক্ষাৎ প্রার্থী।

তাকে ভেতরে না ডেকে নিজেই বাইরে এলেন।

বললেন, "বসন্তকে পেলে ?"

চন্দ্রপ্রসাদ চমকে উঠে, গম্ভীর হয়ে বলল, "অন্দরেই ছিল।"

"তোমার কাকীমা কোথায় গেলেন বলতে পার ?"

"আপনার সেবায়।"

"হুঁম। এস লনে বসি। দেহটা তেমন ভাল লাগছে না।"

"কিছু বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে? ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন না, কাকাবাবু।"

"না, তেমন কিছু নয়।'

"এক কাজ করুন, কাকাবাবু। আপনি অন্দরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি বসছি আপনার দপ্তরে। জানেন না বোধ হয় আমি অন্যের গলা বেশ ভালো নকল করতে পারি। দেখুন আপনার স্বরে কথা বলছি।"

নিজ কণ্ঠের নিখুঁত অনুকরণ শুনে দুর্গাভাই বালকসুলভ কৌতুকে জোরে হেসে উঠলেন। তাঁর অনুরোধে চন্দ্রপ্রসাদ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল এবং অন্য মন্ত্রীদের স্বরও অনুকরণ ক'রে শোনাল।

"পরীক্ষায় পাশ, কাকাবাবু?"

"ফার্ষ্ট ক্লাস।"

"তব একটা পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস পেলাম।"

দুর্গাভাই পুনরায় হেসে উঠলেন।

"তাহলে কাকাবাবু, আপনি ভেতরে যান। আমি আপনার কাজকর্ম কয়েক ঘণ্টা ঠিক চালিয়ে নেব। টেলিফোন এলে বলব, একটু অপেক্ষা করুন। আপনার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে আসব। তারপর···ব্যাপারটা খুব সোজা।"

"যদি গিয়ে দেখ আমি ঘুমিয়ে পড়েছি?"

"ফিরে এসে টেলিফোনের মধ্যে ঠিক আপনার মত নাক ডাকতে শুরু করব। অপর পক্ষ বুঝবেন, আপনি ঘুমুচ্ছেন।"

হাসতে হাসতে দুর্গাভাই বললেন, "তুমি চেয়ার টেনে বোসো শোবার দরকার নেই। তোমার সঙ্গে একটু কথা বললেই শরীর ঠিক হ'য়ে যাবে।"

"বসন্তকে ডাকি, কাকাবাবু?"

"ডাকবে? আচ্ছা, একটু পরে ডেকো। তোমাকে দুটো একটা প্রশ্ন করবো।"

"বলুন।"

"তোমার ভাই দুর্গাপ্রসাদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কিছু আছে কি?"

"পিতাজীর সঙ্গে নেই। মাতাজী এতদিন ও-বাড়ীতে যান নি। পিতাজীর সম্মতি ছিল না। দুর্গাপ্রসাদ ভাইয়া মাঝে মধ্যে মার সঙ্গে এসে দেখা করেন। আজ সন্ধ্যায় মা যাবেন ওঁর বাড়ী। পিতাজীর অনুমতি পেয়েছেন।"

"তোমরা ভাইরা?"

"বড়ে ভাইয়া—এক দুবার গেছেন। সূর্যপ্রসাদ ও শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্ক রাখে না। আমি হরদম যাই।"

"তুমি হরদম যাও? কেন?"

"কারণ অনেক, কাকাবাবু। প্রথমত, আমার কিছু করার নেই, আমি বেকার। দ্বিতীয়ত, কমলা ভাবীকে আমার বড় ভাল লাগে। তৃতীয়ত, ওদের একটা মেয়ে আছে তার সঙ্গে খেলতে আমার ভয়ানক মজা লাগে। চতুর্থত, গেলেই ভাবীজী ভাল ভাল খাবার দেন। পঞ্চমত, মেজ ভাইকে আমি শ্রদ্ধা করি।"

"তুমি জানো আজ দুর্গাপ্রসাদ তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে? এখন বোধ হয় তারা এক সঙ্গে?"

"জানি না তো। পিতাজী নিশ্চয়ই মেজ ভাইয়াকে ডেকে পাঠিয়েছেন। নিজে তিনি কখনও আসবেন না।"

"তুমি এতে বিস্মিত হচ্ছ না?"

"পিতাজীর কোন কাজেই আমি অবাক হই না। কারণ ও প্রয়োজন না থাকলে তিনি কিছু করেন না।"

"এবার তোমায় যা বলবো তাতে তুমি নিশ্চয় অবাক হবে।"

দুর্গাভাই একটু সময়ের জন্য নীরব রইলেন। ভেবে নিলেন, বলা ঠিক হবে কি না।

"দুর্গাপ্রসাদ তোমাদের বাড়ীর বাইরে হওয়া মাত্র পুলিশ তাকে

গ্রেপ্তার করবে। তোমার পিতাজী অর্ডার দিয়েছেন। আমাকে জানান নি পর্যন্ত।"

চন্দ্রপ্রসাদ ক্ষণিক স্তব্ধতার পরে বলল, "ভালই হল।"

"ভাল হল? কেন?"

"মেজ ভাইয়ার একটু বিশ্রাম দরকার। বড় বেশি পরিশ্রম করতে হয়। সেদিন বলছিলেন, পড়াশোনার সময় পাইনে, আর একবার জেলে না গেলে চলছে না। বলে দে না পিতাজীকে!"

"তুমি বলেছিলে?"

"না। ভুলে গিয়েছিলাম। তবে, পিতাজী অনেক সময় আমার মনের কথা বুঝতে পারেন।"

"তাহলে এতেও তুমি অবাক হচ্ছ না।"

"কাকাবাবু, আমি রাজনীতি একেবারে বুঝি না। ও নিয়ে মাথাও ঘামাই না।"

"কবে যাচ্ছ কাশীতে?"

"মাকে নিয়ে যাচ্ছি। মা যখন যাবেন তখন।"

"কবে যাবেন, জানো?"

"না। তবে—আন্দাজ করছি, আজ রাতে, নয় কাল সকালে।"

"এত্ত জলদি?"

"ভুলে যাবেন না, কাল পিতাজীর পুনঃনির্বাচনের কন্‌টেস্ট্।"

"ও।"

বসন্ত এসে কখন পাশে দাঁড়িয়েছে দুর্গাভাই দেখতে পান নি।

চন্দ্রপ্রসাদ বললো, "কাকাবাবুর শরীর ভালো নেই।"

বসন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে প্রশ্ন করলো, "কি হয়েছে পিতাজী? ডাক্তার সাবকে খবর দেবো?"

চন্দপ্রসাদ গম্ভীর হ'য়ে বলল, "চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমি ইলাজ করছি।"

"তুমি?"

"জিজ্ঞেস করে দেখ! কাকাবাবু, আপনি একটু ভালো বোধ করছেন না?"

"অনেকটা।"

"দেখলে?"

"পিতাজী, আপনি ভেতরে গিয়ে একটু শোবেন?"

"না, মা। আমি বেশ আছি।"

"চন্দ্রপ্রসাদ "

"বলুন।"

"তোমাকে আর একটা কি প্রশ্ন করাব ছিল। মনে পড়ছে না।"

"মনে করিয়ে দেব?"

"তাও দিতে পারো নাকি?"

"নিশ্চয় বসন্তকে নিয়ে কিছু।"

"আমাকে নিয়ে কেন? আমাকে নিয়ে পিতাজী তোমাকে প্রশ্ন করবেন কেন?"

"কাকাবাবু, মনে পড়েছে?"

"পড়েছে। বসন্তকে নিয়ে নয়। তোমাকে নিয়ে।"

"আমাকে?"

"তোমার মাতৃদেবী লিখেছেন, তুমি যদি কিছু প্রার্থনা কর—"

"পিতাজী, আমি আসছি।"

"বসন্ত অমন ক'রে পালাল কেন?"

"পেটে কামড় দিয়েছে বোধহয়।"

"কি প্রার্থনা হে তোমার?"

"কাকাবাবু—"

হঠাৎ দুর্গাভাই বুঝতে পারলেন। এতক্ষণের রহস্য কিসের যাদুতে এক মুহূর্তে পরিষ্কার হ'য়ে গেল। মুখ গম্ভীর হল। চিন্তার কুঞ্চন ফুটে উঠল কপালে।

"তুমি বসন্তকে বিবাহ করতে চাও?"

"আপনার অনুমতি পেলে।"

"তোমার কাকীমা সহজে রাজী হবেন না।"

"আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে তাঁকে আমরা রাজী করাব।"

একটু পরে: "মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ? লোকে বলবে কি?"

"সাধু বলবে, কাকাবাবু।"

"কেন?"

"বলবে দুর্গাভাই কৃপা ক'রে কন্যাকে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে দিয়েছেন।"

"আচ্ছা, ভেবে দেখি। তোমাদের ধৈর্য আছে তো?"

"আছে।"

"তোমার পিতাজীর সম্মতি আছে?"

"আছে। তিনি নিজেই আপনার কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসবেন, বলছিলেন।"

"না, না। তিনি কেন আসবেন? তিনি পাত্রের পিতা।"

"পিতাজী বলছিলেন, দুর্গাভাইজী কখনও কন্যা বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হাজির হবেন না।"

"বললেন? বললেন বুঝি?"

"জী হাঁ।"

"ঠিক বলেছেন। আমাকে চেনেন কোশলজী।"

দুর্গাভাইয়ের আত্মতৃপ্ত হাসির সঙ্গে যোগ দিয়ে চন্দ্রপ্রসাদ বলল: "আপনাকে আমরাও চিনি, কাকাবাবু।"

উনিশ

মুখ্যমন্ত্রীভবনের সিংহদ্বারপ্রান্তে দুর্গাপ্রসাদের অপ্রত্যাশিত গ্রেপ্তারের খবর অল্প সময়ে বিলাসপুরে ছড়িয়ে পড়ল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ব্যক্তিগত অনুরোধে বিলাসপুরের বেতার-কেন্দ্র হ'তে খবরটা জনসাধারণকে জানান হল বৈকালিক প্রোগ্রামের প্রারম্ভে।

সীতাচরণ পণ্ডিতকে কাছে ডেকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিভাবে সংবাদটি পরিবেশন করতে হবে বুঝিয়ে দিলেন। ঘণ্টাদুয়েব মধ্যে "মণি-টাইম্‌স্"-এর জরুরী এডিশন বেরিয়ে গেল।

সীতাচরণ পণ্ডিতের রচিত রিপোর্ট প'ড়ে সম্পাদক সুভাষ চট্টোপাধ্যায় চমৎকৃত হল। "পণ্ডিতজী", সীতাচরণকে বলল সে, "এত বহুত খুব!"

সীতাচরণের মুখে যে-হাসি ফুটল তার অর্থ, রেখে দিন, সম্পাদক মশাই, আর জ্বালাবেন না।

"এ নাটকীয় দুর্ঘনার মানে পণ্ডিতজী?"

সীতাচরণ অঙ্গভঙ্গীদ্বারা বিধাতা পুরুষের ইংগিত করল।

সুভাষ চট্টোপাধ্যায় আপন মনে বলে চলল, "কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ধুরন্ধর ব্যক্তি হ'তে পারেন, রাজনীতিতে বিবেক বস্তুটি অচল হ'তে পারে, কিন্তু এ ব্যাপারটা কেবল একটা ষ্টাণ্ট্ একথা মন মানতে চাইছে না। দুর্গাপ্রসাদ তাঁর প্রিয়তম পুত্র। তাকে নিজের বাড়ীর সামনে পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করা হল, এতে জন-সাধারণের কাছে কোশলজীর 'কঠিন মানুষ' পরিচয় আর একবার বিঘোষিত হবে। সবাই ভাববে, দুর্গাপ্রসাদ তাঁর প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, যদিও সংবাদপত্রে তার গ্রেপ্তারের কারণ একেবারে

অন্য ব'লে প্রচার করা হচ্ছে। এতে একদল লোক যেমন কোশলজীর লৌহকঠিন দৃঢ় মনের প্রশংসা করবে, অন্য একদল বলবে, তিনি বাপ হ'য়ে ছেলের হাতে শৃঙ্খল পরালেন নিজের গদি রক্ষা করবার জন্যে। কি এমন বড় লাভের জন্য কোশলজী এ কাজটা করলেন, মাথায় ঢুকছে না।"

সীতাচরণের দিকে তাকিয়ে,—"পণ্ডিতজী, কিছু আলোকপাত করুন না?"

কান্ত সীতাচরণ হাই তুলল তুড়ি কেটে।

বলল, "আলো বলুন, অন্ধকার বলুন, সব ওই কোশলজীর কাছে ওরে—"

হঠাৎ চুপ হ'য়ে গেল সীতাচরণ।

"ওরে কি?"

"তবে জগন্মোহন তেওয়ারী এক্ষুণি এখানে আসছে।"

"সাপ্লিমেন্ট ছাপা আরম্ভ হ'য়ে গেছে?"

"জী, হাঁ।"

"সে জন্যেই আসছে বোধ হয়।"

এমন সময় তেওয়ারী দ্বারপথে এসে দাড়াল।

"কোন ও খবর, এডিটর সাব?"

সুভাষের হঠাৎ মনে হল তেওয়ারীকে বীভৎস দেখাচ্ছে। চোখে মুখে সজীবতার চিহ্নমাত্র নেই। ছোটবেলায় কবর থেকে উঠে আসা মরা মানুষের অভিযান দেখেছিল সিনেমায়। তেওয়ারী যেন কবর থেকে উঠে আসা মৃত মানুষ। কোটরগত চোখ প্রায় নিষ্পলক, জীবন্ত সঞ্চালন নেই, আছে মরা ধারাবাহিক, শীতল চেয়ে থাকা। হাড় বারকরা গালের সঙ্গে চামড়া লেপ্টে রয়েছে, মোটা ওষ্ঠাধর পান দোক্তার কষে কুৎসিৎ।

মনে পড়ল অম্বিকাপ্রসাদের কথা, "পিতাজী মুখ্যমন্ত্রীত্বে পুনরায় বহাল হবার পর, আপনাকে বলে দিলাম, আপনার কাগজের

মালিক হবে জগন্মোহন তিওয়ারী। ম্যানেজিং এডিটর হিসাবে নাম বেরবে তারই।"

মনে মনে সুভাষ চট্টোপাধ্যায় পদত্যাগপত্র রচনা করতে প্রবৃত্ত হল।

মুখে বলল, "আসুন, তিওয়ারীজী আসুন। একটু বসুন এসে। এককাপ চা হোক।"

তিওয়ারী ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসল।

সীতাচরণ পণ্ডিত বলল, "আমি প্রেসে যাচ্ছি।"

"ছাপা হবার সঙ্গে সঙ্গে তিন চারখানা কপি নিয়ে আসুন।"

প্রস্থানরত সীতাচরণের দিকে তাকিয়ে তিওয়ারী প্রশ্ন করল, "বয়স কত হল?"

"কার? আমার?" সুভাষের কণ্ঠে বিস্ময়।

"না। সীতাচরণের।"

"জানিনে। পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে।"

"ওকে দিয়ে কাজ হয়?"

"কোশলজার নিজের লোক। বেশ সাচ্চা মানুষ। পরিশ্রমও করেন খুব।"

"মাইনে কত?"

"তিন'শ।"

সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের কেমন অস্বাস্থ লাগল। তিওয়ারী কি এখন থেকেই কাগজের মালিক হ'য়ে বসল না কি?

"কেন?" সে অনুসন্ধানী প্রশ্ন করল। "এসব কথা কেন, তিওয়ারীজী? পণ্ডিতজীকে অবসর দেবেন নাকি?"

"অবসর দেওয়া না দেওয়া কোশলজার ইচ্ছে।"

"তাহলে কি মাইনে বাড়াবেন? কিছু বাড়ালে বেশ হয়।"

তিওয়ারীর দৃষ্টি কঠিন।

চা এসে গেল। দু'জনে দু'কাপ হাতে তুলে নিয়ে চুমুক দিল।

"এ-ঘটনার তাৎপর্য কি, তিওয়ারীজী?"—সুভাষ প্রশ্ন করল, কথোপকথনের তাগিদে।

"কোন ঘটনার?"

"এই গ্রেপ্তারের?"

তিওয়ারী যেন কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ নীরব হল চা খুব গরম ছিল না। দু'মিনিটে পান করে ফেলল।

উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কোশলজী আপনাকে একবার ডেকেছেন। সন্ধ্যা ৭টা পঁচিশে।"

"হাজির হবো।"

জগন্মোহন তিওয়ারী চেয়ার ছেড়ে উঠল। ডান হাত কপালের দিকে তুলে নমস্তের ভঙ্গি করল। সোজা চলে গেল ছাপাখানায়।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল 'ভারত টাইমসের' সংবাদদাতা গোপাল কৃষ্ণণকে প্রায় আধ ঘণ্টা বসিয়ে রাখবার জন্য মাজনা চাইলেন।

'ভারত টাইমস' বাইরের কাগজ হলেও উদয়াচলে সর্বাধিক প্রচারিত। ভারতবর্ষে অন্যতম প্রধান সংবাদপত্র। গোপালকৃষ্ণণ মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয়পাত্র।

"আজকের দিনটা এতো ব্যস্ত যে সময় আপনিকতেই ঠিক রাখতে পারছি নে। মাপ কোরো।"

গোপালকৃষ্ণণকে বসিয়ে নিবেদন করলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

"মুখ্যমন্ত্রীর গৃহে কোনও সাংবাদিককে বেকার ব'সে থাকতে হয় না, কোশলজী।"

"অর্থাৎ তুমি এই আধ ঘণ্টা একেবারেই বেকার ছিলে না?"

"ঠিক তাই।"

"বেশ। তাহলে আমার আফসোসের কারণ কমল। সময় খুব কম। তুমি একটা গোপনে ইনটারভিউ চেয়েছিলে। আধ ঘণ্টা সময় তোমাকে দিতে পারি।"

"অনেক ধন্যবাদ। কি কি বিষয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর পাব?"

"যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে পার। শুধু, আধ ঘণ্টার বেশি সময় দিতে পারবো না।"

নোটবই পেন্সিল নিয়ে তৈরী গোপালকৃষ্ণণ প্রশ্ন করল:

"আগামীকাল বিধান সভায় কংগ্রেস পার্টি নতুন দলপতি নির্বাচন করবে। আপনি তো অন্যতম প্রার্থী। নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে আপনার আন্দাজ জানতে পারি কি?"

"বিধান সভায় কংগ্রেসদল আগামীকাল বিকেলে একত্রিত হচ্চেন। প্রধান কর্তব্য, দলপতি নির্বাচন। আমি দলপতি পদে পুনঃ নির্বাচনের প্রার্থী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কংগ্রেসীদলের অধিকাংশ সদস্য আমাকে নির্বাচন করবেন। সর্বসম্মতি ক্রমে নির্বাচনের সম্ভাবনাও কম নয়।"

"অন্য প্রার্থী কে বা কারা?"

"আমার জানা নেই। সম্ভবত, কনটেষ্ট হবেই না।"

"এ আশার কথা একেবারে নতুন। জনসাধারণের ধারণা কনটেষ্ট হবে। হবে না, এমন ধারণা করবার কারণ বলবেন কি?"

"কংগ্রেস এখনও একটি সুসংবদ্ধ একমত এক-পথ রাজনৈতিক দল নয়। কংগ্রেস বহু মানুষের বহু মত ও পথের মিলিত সংগঠন। ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতীক। কংগ্রেসের ঐতিহ্য একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা। কংগ্রেসের ইতিহাস পড়লে দেখবে, বারবার মত ও পথের সংঘাত হয়েছে, কিন্তু কখনও ঐক্য নষ্ট হ'য়ে যায় নি। উদয়াচলের কংগ্রেসেও বর্তমানে মত ও পথের কিছুটা সংঘাত দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক কংগ্রেসকর্মীর সবচেয়ে বড় কর্তব্য, দেশের সেবা ও উন্নয়ন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কাল পার্টি মিটিংএ কংগ্রেসের ঐক্য বিভেদের চেয়ে বলবান প্রমাণিত হবে।"

"এ আশা পোষণ করবার কি কোন বাস্তব কারণ আছে।"

"আশাটাই তো পুরো বাস্তব। কারণও আছে।"

"জানতে পারি কি?"

"আমি দেখতে পাচ্ছি, দেখে আনন্দিত হয়েছি, যে উদয়াচলের কংগ্রেস নেতারা আজ থেকেই ঐক্য ও সংহতির কথা গভীর ভাবে ভাবছেন।"

"আপনার প্রতিপক্ষ, সুদর্শন দুবেজীর সঙ্গে কোনও কথা হয়েছে?"

"সুদর্শন দুবে উদয়াচল কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি বহুদিনের দেশসেবক, জনপ্রিয় দেশনেতা। তার সঙ্গে কোনও কোনও বিষয়ে আমার মতদ্বৈধ থাকলেও তাঁকে আমি চিরদিন সহকর্মী হিসেবে শ্রদ্ধা করে এসেছি, এখনও করি। শাসনকার্যে সব সময়েই প্রয়োজন মত তার পরামর্শ আমি নিয়েছি, এবং অনেক সময় তার পরামর্শে অত্যন্ত লাভবান হয়েছি। এখনও তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা হচ্চে। আজ সকালে এ গৃহে প্রথম আগন্তুক ছিলেন তিনি, এবং আজ রাত্রিতেও হয় তো তার সঙ্গে আমার পুনরায় আলাপ আলোচনা হবে।"

"একথা কি সত্যি যে সুদর্শন দুবে আপনাকে কতগুলি আপোষ প্রস্তাব দিয়েছেন? আপনি যদি তাঁকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী করেন, তিনি আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন?"

"না। সুদর্শন দুবে এমন কোনও প্রস্তাব আমাকে দেন নি। দেবার মত লোকও তিনি নন। মন্ত্রীত্বে তাঁর লোভ নেই বলেই আমি জানি।"

"আপনার ও তাঁর দল একত্র হ'য়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের সম্ভাবনা আছে কি?"

"মন্ত্রীসভা কোনও দলাদলির ভিত্তিতে গঠিত হয় না। কোনও কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীই এভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করেন না। অপরপক্ষে, প্রত্যেক মন্ত্রীসভাতেই বিভিন্ন স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দুর্গাভাইজী, সুদর্শন দুবে ও আমি একত্র ব'সে সর্বজনগ্রাহ্য মন্ত্রীসভা অনায়াসে গঠন করতে পারবো।"

"এ বিষয়ে হাইকমাণ্ডের নির্দেশ কি?"

"হাইকমাণ্ড চান উদয়াচলে কংগ্রেস এতদিন যে-ভাবে সংহতি ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে শাসন কাজ চালিয়ে এসেছে ভবিষ্যতেও তেমনি চালিয়ে যাক। হাইকমাণ্ড কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি আদৌ পছন্দ করেন না।"

"আপনি যদি পুনরায় দলপতি নির্বাচিত হন, মন্ত্রীসভা কাদের নিয়ে করবেন ভেবেছেন কি?"

"এ প্রশ্ন বর্তমানে ওঠে না। এ-ভাবনার সময় এখনও আসেনি।"

'আপনার সহকর্মীদের সবাই কি স্থান পাবেন?"

"আমার সহকর্মীদের প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তাঁরা উদয়াচলের মঙ্গলের জন্য সাধ্যমত পরিশ্রম করেছেন। দোষ-ত্রুটি স্খলন যদি কিছু হয়ে থাকে তার দায়িত্ব আমার এবং সমগ্র মন্ত্রী-সভার। যদি আমি পুনর্বার মন্ত্রীত্ব গঠনের সুযোগ পাই, আমার বর্তমান সহকর্মীদের পূর্ণ সহযোগিতা আমার অন্যতম প্রধান কাম্য হবে। তাঁরা কেউ মন্ত্রীত্ব লোভী নন। মন্ত্রীসভার বাইরে থেকেও দেশের সেবা করতে তাঁরা সর্বদা প্রস্তুত।"

"বর্তমান মন্ত্রীসভার জনপ্রিয়তা অথবা তার অভাব সম্বন্ধে আপনি কিছু বলবেন কি?"

"গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে সরকারের সমালোচনা করবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের। হয়তো আলোচনার চেয়ে সমালোচনা আমরা বেশি করে থাকি; এটা আমাদের জাতীয় স্বভাব। তাছাড়া, আমাদের দেশের নীতি হল 'যত-সম্ভব-বেশি গভর্ণমেণ্ট', যত-সম্ভব কম গভর্ণমেণ্ট নয়। অর্থাৎ সরকার জনকল্যাণকে আদর্শ করে অনেক কিছু একসঙ্গে করতে চাইছেন, অন্তত করবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছেন। তাতেও জনসাধারণ বেশি সমালোচনা বা নিন্দার হেতু খুঁজে পাচ্ছেন। যেখানে যা-কিছুর অভাব, জনসাধারণ দাবী করছেন, সরকার তা পূর্ণ করবেন এবং আমরাও এ দাবী মেনে নিয়ে কেবল মাত্র সময়, ধৈর্য এবং সহযোগিতা চাইছি। অথচ আমরা

জানি, জনকল্যাণ গঠন করতে বহুবছর লাগবে, জনগণের দাবী মেটাতে আমাদের জীবন শেষ হ'য়ে যাবে। এ অবস্থায় কিছু গণ-অসন্তোষ অনিবার্য। কংগ্রেসী শাসনে আমরা কাউকে পুরো খুশি করতে পারবো না; কেননা কংগ্রেস কোনও বিশেষ শ্রেণীর সংগঠন নয়। মালিক বলুন, শ্রমিক বলুন, জমিদার কি রায়ৎ, মধ্যবিত্ত কি উচ্চ-বিত্ত, গ্রামীণ মানুষ কি শহর-বাসিন্দা, ছাত্র কি শিক্ষক—কেউ এ শাসনে পুরো সন্তুষ্ট হবে না। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় কথা হল কোনও শ্রেণীকে পুরো অসন্তুষ্ট করেও আমরা রাখিনি, রাখবো না। এই হল কংগ্রেসী সমাজবাদের মূল কথা। সবাই আমাদের কম-বেশি নিন্দা করবে, কিন্তু ভোটের সময় অধিকাংশই গিয়ে দাঁড়াবে কংগ্রেসের তাবুতে। তারা জানে কংগ্রেসী রাজত্বে কিছু মঙ্গল তাদের সবারই হয়েছে। কেউ খালি হাতে ফিরে যায় নি কংগ্রেসী রাজদরবার থেকে।"

"এবার আপনাকে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই।"

"কর। সময় কিন্তু বেশি নেই।"

"একটু আগে আপনার বাড়ীর দরজায় দুর্গাপ্রসাদ কোশলকে গ্রেপ্তার করা হল। এ আদেশ কি আপনি দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"গ্রেপ্তারের আগে তাঁর সঙ্গে আপনার অনেকক্ষণ কথাবার্তা হ'য়েছিল। আপনি কি তাঁকে বিপজ্জনক রাজনীতি ত্যাগের উপদেশ দিয়েছিলেন?"

"না, দুর্গাপ্রসাদ আমার ছেলে। তার প্রতি আমার দুর্বলতা কারুর অজানা নেই। বহুদিন তাকে দেখিনি, তাই ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তার সঙ্গে পারিবারিক কথাবার্তা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা হয় নি। ফটকের বাইরে যাবার আগে গ্রেপ্তারের কথা সে একেবারেই জানতো না।"

"এ গ্রেপ্তারের কি সত্যই প্রয়োজন ছিল?"

ম্লান হেসে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "না থাকলে পিতা পুত্রকে পুলিশের হাতে তুলে দিত না।"

"দুর্গাপ্রসাদ কোশলের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি ?"

"উদয়াচলের শান্তি ও শৃঙ্খলা নিরাপদ রাখার জন্ম তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।"

পাঁচটা বাজতেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সাক্ষাৎকার সমাপ্ত করলেন।

"এবার শেষ করতে হয়। অনেক সহকর্মী আসছেন দেখা করতে। আজ আমার একেবারে সময় নেই।"

"ধন্যবাদ কোশলজী।" গোপালকৃষ্ণণ বিদায় নিতে নিতে বলল "আশা করি কাগজে ইনটারভিউটা বেশ ভালো করেই ছাপা হবে।"

"এবার আমার একটা অনুরোধ আছে।"

"নিশ্চয়।"

"এই ইনটারভিউটা ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সুদর্শন দুবে জানতে পারলে ভালো হয়।"

"সবটা ?"

"অন্তত তার সম্বন্ধে আমি যা বলেছি।"

"বেশ তো।"

"কৌশলে জানাতে হবে। সে যেন ধারণা না করে যে আমার কথায় তুমি তাকে বলেছ।"

"বুঝতে পেরেছি।"

গোপালকৃষ্ণণ বিদায় নিলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিওয়ারীকে তলব করলেন।

"কাল সকালের 'ভারত টাইমস্' প্রত্যেক কংগ্রেসী এম. এল. এ-র হাতে আটটার মধ্যে পৌছনো চাই।"

"জী।"

"নীচে কারা ব'সে আছেন ?"

"বালকৃষ্ণ শুক্লজী, হরিসাধন ইংলে-জী, আর তুলসীদাস গৌতমজী।"

"হুঁম। আচ্ছা, এঁদের তিনজনকে একসঙ্গে নিয়ে এসো।"

তিওয়ারী দরজার বাইরে যাবার আগেই আবার ডাক পড়ল।

"শোন।"

ভিতরে এসে দাঁড়াতে, "তোমার কাজে বেশ গাফিলতি দেখতে পাচ্ছি।"

তিওয়ারী নীরব জিজ্ঞাসায় তাকিয়ে রইল।

"মনে রেখো, তোমার উপরে নজর রাখবার লোকও রয়েছে।"

"কিছু গলতি হয়েছে কি আমার ?"

"যা করেছো—বা করোনি—তুমি ভালোই জান। তুমি আমার সেবা কম করোনি। তোমাকে আমি অনেক দিয়েছি। আরও দেব। কিন্তু লোভকে ভয়ানক বাড়িয়ে তুলো না। সর্বনাশ হবে।

তিওয়ারী কিছু বলবার জন্য মুখ খুলতে :

"এখন নয়। তোমার কথাও আজই শুনবো   রাত ন'টার পরে। এখন যাও, কাজ করোগে।"

উঠে দাঁড়াতে :

"সেই মেয়েটির সঙ্গে সংযোগ করেছ ?"

"জী হাঁ।"

"কি বলে সে ?"

"দেখা করতে চায়।"

"কবে ?"

"আজই।"

"আচ্ছা, দাঁড়াও।" একখানা কাগজে আজকার কর্মসূচী লিখে রেখেছিলেন। তাতে চোখ রেখে, "আটটা দশ মিনিটে হতে পারে। খবর পাঠিয়ে দাও।"

দেড় ঘণ্টা ধ'রে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উপদলপতিদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। কাউকে ডেকে আনলেন একা ; আবার কয়েক জনকে একসঙ্গে। বিস্তারিত কথাবার্তা নয় ; যে-রাজনৈতিক সংলাপ আগে

থেকেই চলে আসছিল তার সুচারু সমাপ্তি। কারুর কারুর কাছে তিনি কঠিন হলেন, আবার কারুর কাছে ননীর মত কোমল। সবাই দেখতে পেলেন, দেখে বিস্মিত হলেন, মুখ্যমন্ত্রী সব বিষয়ে আগে থেকেই ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত প্রস্তুত রেখেছেন। অনেকে সচকিত হ'য়ে দেখতে পেলেন তাদের কার্যকলাপেব এমন বিশেষ কিছু নেই যা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অজানা; কেউ কেউ ভীত হ'য়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী এ-সব গোপন তথ্য স্বার্থের প্রয়োজনে ব্যবহারে উদ্যত; আবার অনেকে দেখে আশ্বস্ত হলেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মনুষ্য চরিত্রের দুর্বলতা, জীবন-ধারণের প্রয়োজনে এবং উচ্চাকাঙ্খার তাগিদে মানুষ যা ক'রে থাকে তার প্রতি পরিপূর্ণ সহানুভূতিশীল; তাঁর সংবেদন-সিক্ত ব্যবহারে তাঁদের চক্ষু আর্দ্র হ'ল। অনেকেব সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পাঁচ-দশ মিনিটের রাজনৈতিক বিতর্কে সংযুক্ত হ'য়ে নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত করলেন। এঁরা বিস্মিত হ'য়ে দেখলেন তাঁর এমন সব অকাট্য তথ্য ও যুক্তি বয়েছে যার কাছে তাঁদের অভিযোগ দাঁড়াতে পারে না। আবার কারুর কাছে অকপট বিনয়ে ও মার্জনা ভিক্ষায় তিনি এমন ভাবে অপরাধ স্বীকার ক'রে নিলেন যে তাঁদের মানতে হল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, নেতৃত্বের দৃঢ়তা। যাঁদের নালিশ ছিল যে তাঁদের জিলার চেয়ে অন্য জিলাব উন্নতি কল্পে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করেছেন, তাঁবা বুঝতে পেরে হতবাক্ হলেন যে তাঁদের নালিশ সত্যি নয়। আবার দু'ক্ষেত্রে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ত্রুটী স্বীকার ক'রে ভবিষ্যতে পুবোপুরি পুষিয়ে দেবার অঙ্গীকার দ্বারা সমর্থন জয় করলেন। যাব যা কাম্য, প্রার্থনা, অভিযোগ, নালিশ, সব তিনি ধৈর্য ও বিনয়ের সঙ্গে শুনলেন। উপদলপতিগণ প্রদেশের ঘটনাবলী ও জীবনযাত্রা বিষয়ে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের জ্ঞানের ব্যাপকতায় বিস্মিত না হ'য়ে পারলেন না। কোন জিলায় কি শস্য উৎপন্ন হয়; কোথায় কোন পুরাতন বা নতুন শিল্প গ'ড়ে উঠেছে; কোন শহরে কি নিয়ে সাম্প্রতিককালে কোন

কলহের সূত্রপাত হয়েছে ; কোথায় কোন নদী, পাহাড়, অরণ্য ; কোন শহরের কোন কংগ্রেসপ্রার্থী কবে উল্লেখযোগ্য কি করেছে ; অথবা কোন শহর বা গ্রামাঞ্চলের বিশেষ কি সমস্যা : সব তাঁর নখদর্পণে। কারুর নাম তিনি কদাচ বিস্মৃত হন না ; কোনও মুখ একবার দেখলে কোনও দিন ভোলেন না। বয়োবৃদ্ধ আগন্তুককে পুত্রকন্যাদের নাম উল্লেখ ক'রে কুশল প্রশ্নে তিনি যেমন বিগলিত করলেন, তেমনি অপেক্ষাকৃত নবীনদের বিস্মিত করলেন পিতা, পিতামহের খবর জানতে চেয়ে। লছমনপুর জিলার কৃষাণ সভার সভাপতি রসুল মহম্মদকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অভিভূত ক'রে ফেললেন।

"জনাব, আপনার একটা জাঁদরেল গাভী ছিল। সে এখন কেমন আছে ?"

গাভীটি রসুল মহম্মদ পাঞ্জাব থেকে কিনে এনেছিলেন। ষোল থেকে বাইশ সের দুধ দেয় সে। রসুল মহম্মদের তাকে নিয়ে গর্বের সীমা নেই।

"ভাল আছে, কোশলজী। কিন্তু তার খবর আপনি জানলেন কি করে ?"

"তাই তো, রসুল মিঞা। আপনারা ভাবেন আমি শুধু মুখ্যমন্ত্রীত্বই করি—আপনাদের কারুর কোনও খবর রাখি না। আপনার গরুটি পাঞ্জাবের ফিরোজপুর থেকে কেনা, গত বছর রোজ আধমন দুধ দিত ; প্রাদেশিক গোবর্ধন মেলায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল। চকচকে কালো আর সাদা দেখতে, কি বলেন ?"

"জী হাঁ। কিন্তু—"

"তাই তো, রসুল মিঞা, আমি জানি কি ক'রে ? আমিও তো চাষী—আপনার মত আমিও এককালে কুষাণপুর কৃষাণ সভার সভাপতি ছিলাম। আপনি আমি হচ্চি একদলের লোক—আর আজ কি না আপনি সুদর্শন দুবের সঙ্গে ভিড়েছেন ?"

"না, কোশলজী। আমি মোটেই পাকা ভিড়িনি। তবে কিনা—"

"মানছি, আপনার জিলায় সে রকম রাস্তা তৈরী হয় নি। সেচের যে খাল তৈরী হয়েছে, আপনার জমির সামনে দিয়ে তা কেটে নেওয়া উচিত ছিল, তাও হয়নি। আপনার ছেলে মুন্সেফের পদের জন্য দরখাস্ত করেছে তাও আমার অজানা নয়। লছমনপুর জিলায় আরও দু তিনটে মাদ্রাসা তৈরী করাও এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। এসব সামান্য ব্যাপার আপনি আগে আমাকে জানালেই পারতেন।"

"আপনাকে তো দু তিনবার বলেছিলাম। একটা মেমোরেণ্ডামও পাঠিয়েছিলাম।"

"তাই নাকি? কসুর হ'য়ে গেছে। নানা কাজে হয়ত ওদিকে মন দিতে পারি নি। কিন্তু ঠিক মনে আছে সব কিছু। দেখুন, আরও বলছি, আপনার কথা। আপনার ছোটছেলে আকবর আলির বিরুদ্ধে গাড়ার পারমিট বিক্রী করার অভিযোগে পুলিশ কেস চলছে। ঠিক কি না?"

"আজ্ঞে, সে নির্দোষ।"

"নির্দোষ বই কি। তাই তো ভাবছি ও কেসটা তুলে নেওয়া সম্ভব কি না"

"কোশলজী, আমি—আমরা তিনজন—আপনার সঙ্গেই আছি। অন্য দুজনের কথাও একটু ভাববেন।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। জনাব মনসুর আলি এবং জনাব রুস্তম খান। এই দেখুন এরা কি চান তাও আমি ফাইলে লিখে রেখেছি।"

রসুল মিঞা বিদায় নেবার ঠিক আগে:

"ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা, মিঞাসাহেব, আমাদের সবারই আছে। আমরা দেশসেবী হলেও মানুষ তো বটে। তবু আমি জানি আপনারা আমার পাশে দাঁড়াবেন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়, উদয়াচল ও ভারতবর্ষের বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে। এটুকু বিশ্বাস আছে বলেই—এ বৃদ্ধ বয়সেও এ গুরুভার বইবার সাহস আমি রাখি। আমার বল ভরসা যা কিছু সব-আপনারা।"

কুড়ি

চন্দ্রপ্রসাদ ও বসন্ত প্রস্থান করলে অকারণ খুশিতে দুর্গাভাই-এর মন ভ'রে উঠল। দুটি যুবক-যুবতীর লজ্জারুণ ভীত-চকিত প্রণয়ের আলো পড়ল দুর্গাভাইয়ের প্রাচীন চেতনায়। বসন্তকে তিনি বড় ভালবাসেন, তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের প্রায় সবটুকু মাধুর্য তাকে নিয়ে। অথচ বসন্তের বিবাহ-চিন্তা এ পর্যন্ত তাকে ব্যস্ত ক'রে তোলে নি। মনোরমা কখনও সখনও উত্থাপন করেছেন, কিন্তু খুব জোরের সঙ্গে নয়, এ-জন্য হয়ত যে দুর্গাভাই-তনয়ার বিবাহ, একবার মনস্থির করলে, সহজেই সংঘটিত হবে। অথচ এই বিষয়েই দুর্গাভাইয়ের মনে সংশয় ছিল। মন্ত্রী তিনি, যদি কোনও সৎপাত্রের পিতাকে কন্যা গ্রহণের অনুরোধ করেন, রাজপদ সেক্ষেত্রে কতখানি প্রভাব বিস্তার করবে? অর্থাৎ, মন্ত্রীত্ব এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব দ্বারা কোনও মতেই তিনি বসন্তের জন্য সুপাত্র সন্ধান করতে পারবেন না। অথচ মন্ত্রী এবং নেতাই বর্তমানে তাঁর একমাত্র পরিচয়।

এ সংশয় আজ এই ম্লান অপরাহ্নে বড় সুন্দর ভাবে দূর হ'য়ে গেল। দুর্গাভাইএর মনে হল চন্দ্রপ্রসাদই বসন্তের উপযুক্ত পাত্র। তার হাসি খুশি কৌতুক দীপ্ত স্বভাবের সঙ্গে বসন্তের নম্রশ্রী সুন্দর মিলবে। চন্দ্রপ্রসাদ অবশ্য লেখা পড়া বেশি শেখেনি, কিন্তু বুদ্ধি তার প্রখর এবং কথা বার্তায় শিক্ষার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। বিমান বাহিনীতে নিজের চেষ্টায় কমিশন পেয়েছে; ভবিষ্যত তার নিশ্চিত। অধিকাংশ মন্ত্রীপুত্রদের মত সে পিতার ঔদার্য-দুর্বলতা-নির্ভর নয়। এ বিবাহে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও পদ্মাদেবীর সম্পূর্ণ সম্মতি আছে জানতে পেরে দুর্গাভাই আরও পুলকিত হলেন। একবার খচ্ ক'রে মনের

মধ্যে সন্দেহ জাগল: কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আজকের দিনে এক চমৎকার খেলায় তাকে পুরোপুরি নিজের সঙ্গে বেধে ফেলতে চাইছেন হয়তো। কিন্তু পরক্ষণে সে সন্দেহ দূরীভূত হল যখন ভাবলেন এতে পদ্মাদেবীর ও পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। তাছাড়া, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে চন্দ্রপ্রসাদের কাছে স্বীকার করেছেন যে মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে দুর্গাভাই কদাচ তাঁর দ্বারস্থ হবেন না। তাতেও তার তৃপ্তি ও আনন্দ কম হল না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাকে খুব ভালই জানেন। অন্যের সঙ্গে দল ও নিজ স্বার্থের জন্য তিনি মাঝে মধ্যে যাই করুন, আমার সঙ্গে ব্যবহারে তিনি চিরকাল শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রীতি দেখিয়ে এসেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোনও নালিশ নেই। নিন্দুকরা যাই বলুক, আমি জানি উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী হবার যোগ্য এখনও একমাত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

মনোরমা খুশি হ'য়ে সহজে এ বিবাহে মত দেবেন না। দুর্গাভাই ভাবলেন, বর্তমানে তাঁকে না জানানই শ্রেয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুনর্বার মুখ্যমন্ত্রী হবার পর তার মন নরম হতেও বা পারে। তখন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈবাহিক সেতু তৈরী করবার প্রস্তাব তিনি হয়ত গ্রহণ করতেও পাবেন। মনোরমার বিরোধিতাকে মোট কথা দুর্গাভাই খুব বড় বাধা মনে করলেন না। ববং তাঁর ভাবতে ভাল লাগল যে বসন্ত মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও পিতার আশীর্বাদ নিয়ে চন্দ্রপ্রসাদের গলায় বরমাল্য দেবে।

রোদ প'ড়ে এল। গাছের ছায়া নামলো সবুজ লনে। দুর্গাভাই সহসা অনেক পাখীর একত্রিত কুঞ্জন শুনতে পেলেন। তাকিয়ে দেখলেন শ্বেত ও রক্ত করবীর গাছগুলি ফুলভারে আনত। আকাশ ঘন নীল। মেঘের চিহ্ন মাত্র নেই। পৃথিবীকে বড় সুন্দর মনে হল দুর্গাভাই-এর।

গাড়ী ঢুকল ফাটক পেরিয়ে। থামল বাংলো-বাড়ীর ডান দিকে দপ্তর ঘরের সামনে। দুর্গাভাই দেখলেন, গাড়ী থেকে নামল

চেনা-চেনা এক সুবেশা রমণী। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। দূর থেকে দেখে মনে হল, সুন্দরী।

চিনতে পারলেন। পরশু রাতেই একে দেখেছেন। সরোজিনী সহায়।

বেয়ারা মহিলাকে অপেক্ষা-গৃহে বসাল। দুর্গাভাই মন্দ-পদ-ক্ষেপে দপ্তর ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন।

কয়েকমিনিট অপেক্ষা করতে হল সরোজিনী সহায়কে। যখন বেয়ারা তাকে দুর্গাভাই-এর কাছে পৌছে দিল, তিনি অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে নমস্কার বিনিময় করলেন। সেই সময় অন্য এক গাড়ীতে, দুর্গাভাই-এর নিজের গাড়ীতে, পত্নী মনোরমা গৃহে ফিরলেন। দুর্গাভাই-এর দপ্তর গৃহের সামনে ক্ষণিক দাঁড়িয়ে মনোরমা অন্দরে চলে গেলেন।

দুর্গাভাই বললেন, "বসুন। আপনাকে তো আমি চিনি। পরশু রাত্রেই আমাদের দেখা হয়েছে। আগেও আপনার কাজকর্মের সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় ছিল।"

সরোজিনী চেয়ারে বসল। অদূর অতীতের প্রত্যক্ষ অবতারণায় সে অপ্রতিভ হল না। দুর্গাভাই দেখলেন, বসবার ভঙ্গি সহজ, ঋজু। মুখে বেশ বুদ্ধির ছাপ। মৃদু হেসে কথা বলল। দুর্গাভাই দেখলেন দাঁতগুলি ধবধবে সাদা, সুন্দর সমান।

"পরশু রাতে আপনাকে দেখলাম প্রজাপতি শেঠডের বাড়ীতে। কথা কিন্তু বলেন নি আমার সঙ্গে একটিও।"

সামান্য হেসে দুর্গাভাই বললেন, "পরশু রাতের বৈঠকে আমি কিছু বলতে যাই নি। কেবল মাত্র শুনতে গিয়েছিলাম।"

"আমি কিন্তু আপনাকে দেখে দেখে বিস্মিত হচ্ছিলাম। দুঘণ্টা আমাদের কথাবার্তা চলেছিল। আপনি একটি শব্দ উচ্চারণ না করে কেবল শুনে যাচ্ছিলেন। আপনার চরিত্রের আশ্চর্য দৃঢ়তা দেখে আমি অবাক হচ্ছিলাম।"

"চুপ ক'রে থাকা যদি চারিত্রিক দৃঢ়তা হয় তাহলে তা আমার আছে। গান্ধীজী সপ্তাহে একদিন একটি কথাও বলতেন না। গান্ধীর চেলাদের মধ্যেও অনেকে মৌন অভ্যাস করতেন।"

"আমরা তো অত্যন্ত শব্দপ্রিয় জাত; চেচামেচি, হৈ-হৈ, হট্টগোল আমাদের জীবনের অঙ্গ। এর মধ্যে নীরবতা যেন ছন্দ-পতন।"

"শুনেছি আপনি ভারতবর্ষের একজন উদীয়মান ট্রেডইউনিয়ন নেত্রী। উদয়াচলের দলীয় রাজনীতিতে আমার দখল ও জ্ঞান সামান্য। মন্ত্রীত্ব ক'রে বাড়তি সময় আমি একেবারে পাইনে, পেলেও তাতে রাজনীতি করিনে। অতএব, এপ্রদেশে আপনাদের নবীন-নবীনাদের কার্যকলাপের খবর আমি তেমন রাখিনে। এখবর যিনি সবচেয়ে বেশি রাখেন তাঁর নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। পরশু সুদর্শন দুবের একান্ত অনুরোধে তার দলের 'শীর্ষ-বৈঠকে' আমি হাজির হয়েছিলাম; ওখানে আপনাকে দেখে কম বিস্মিত হইনি। কারণটা বলছি। সুদর্শন বলেছিল, আমি তাদের 'শীর্ষ-বৈঠকে' হাজির থেকে কেন তারা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর পুনঃনির্বাচনের বিরুদ্ধে শুধু সেটুকু যেন নীরবে শ্রবণ করি। কোনও মতামত দেবার ইচ্ছে না থাকলে যেন না দি। সুদর্শন, প্রজাপতি শেউড়ে এবং হরিশংকরজীকে একসঙ্গে দেখব, আমি জানতাম। এরাই হল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরুদ্ধ দলের 'মাথা'। কিন্তু এদের সঙ্গে আপনার মত একটি অপরিচিতা তরুণীকে দেখতে পাব তার জন্যে আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। এত কথা এজন্য বলছি যে উদয়াচলের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আপনার ভূমিকা আমি একেবারে বুঝতে পারছি না।"

"আপনার বিস্ময় অকারণ নয়," সরোজিনী নম্র হাসির সঙ্গে বলল, "সত্যিই পরশু রাত্রির বৈঠকে আমার উপস্থিতি বেমানান ছিল। আমি তা উল্লেখও করেছিলাম। তবু দোষ বোধ করি বেশিটা আমারই। আপনার কথা অনেক শুনেছি, অথচ আপনাকে

ঘনিষ্ঠভাবে দেখিনি। পরিচয়ের ও সুযোগ হয়নি। দুবেজীর বাড়ীতে আপনি আসছেন শুনে লোভ চাপতে পারিনি। এটাই অবশ্য একমাত্র কারণ নয়।”

“অন্য কারণটাও বলুন।”

“অনেক বছর আগে হরিশংকর ত্রিপাঠীজীর কাছে আমি ট্রেড-ইউনিয়নে কাজ করবার প্রথম সুযোগ পাই। বলতে গেলে তিনি আমার রাজনৈতিক গুরু। উদয়াচলের জাতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসে আমি অনেকদিন কাজ ক'রে আসছি। ত্রিপাঠীজীর সহকর্মী হিসেবেই সুদর্শন দুবেজী এবং প্রদেশের অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে। বর্তমানে, আপনি হয়ত জানেন না, আমি উদয়াচল জাতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী। তাছাড়া, প্রদেশিক কংগ্রেসের শ্রমিক বিভাগের দায়িত্বও আমার।”

“আপনার সম্বন্ধে এসব খবর এখন আমার জানা।”

“আমরা কিছুদিন ধ'রে দেখে আসছি, কংগ্রেসী শাসননীতি ক্রমাগতই ধনী শ্রেণীর অনুকূল হ'য়ে আসছে; দেশের দরিদ্র জনসাধারণ দেশকল্যাণের যোগ্য ভাগ পাচ্ছে না।—”

“আপনারা কারা?”

“আমরা যারা ট্রেড-ইউনিয়ন বা কৃষাণ সভায় কাজ করি, অথচ কংগ্রেসের বাইরে নই।”

“হুঁম। বলুন।”

“ভারতবর্ষের উন্নতি সাধনে সরকারী ভূমিকা যেমন গভীর, তেমন ব্যাপক। সরকার কেবল শাসন করে না, তার আসল কাজ গঠন। শিল্পায়নে তার ভূমিকা মুখ্য। কৃষির উন্নতিতেও। অর্থাৎ কি গ্রামে কি শহরে, সরকারী উদ্যোগে বেশির ভাগ গঠন মূলক কাজ চলছে। আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আছে, সমাজবাদী আদর্শ আছে। অথচ কাজের বেলায় দেখছি, ধনীদের ধন বাড়ছে, দরিদ্রের

দারিদ্র্য। গ্রাম ও কৃষি উন্নয়নে যে-অর্থ ব্যয় হচ্চে তার সিংহ ভাগ পাচ্ছে ধনী চাষী বা গা-ঢাকা জমিদার; তাদের বাড়ীতে বিজলী এসেছে, ক্ষেতে রাসায়নিক সার, সেচের জল। এমন কি রাস্তা, স্কুল, ডিসপেন্সারী স্থাপনের সময়েও তাদের সুবিধে আমরা সর্বাগ্রে দেখছি। অথচ জমিহীন ভাগচাষীর অবস্থা দরিদ্র হ'তে দরিদ্রতর হচ্চে; ক্রমাগত সে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে নোংরা রোগময় বস্তীতে 'নতুন জীবন' গঠন করছে। সচরাচর শুনতে পাই, কারখানার মজদুরদের অবস্থা ভাল হয়েছে। কিছু হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু সে তুলনায় শিল্পপতিদের তো সোনায় সোহাগা। তারা যে যা তৈরী করছে, যে কোনও দামে দেশের লোক তা কিনতে বাধ্য। সমাজ-তন্ত্রের নামে আমরা এক বিরাট ধনিক ও সামন্ততন্ত্র গ'ড়ে তুলছি।"

দুর্গাভাই বেশ একটু প্রভাবিত হয়েই সরোজিনী সহায়ের কথা শুনছিলেন। মেয়েটির বলার ভঙ্গীতে আত্ম-প্রত্যয় আছে, শব্দ পরিষ্কার, উচ্চারণ অভিজাত। কণ্ঠস্বরে এমন একটি আন্তরিকতার ব্যঞ্জনা যা সহজে হৃদয় স্পর্শ করে।

"আপনার সঙ্গে আমি একমত নই। তবু, বলুন আমি শুনছি

"তাই কিছুদিন, এই বছর দুই আগে কংগ্রেসের মধ্যে শ্রমিক ও চাষীদের নিয়ে যাদের কাজ তাদের প্রতিনিধিরা দিল্লীতে মিলিত হ'য়ে সিদ্ধান্ত করেন, কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তব রূপায়নের জন্য আরও অনেক বেশি তৎপর হ'তে হবে। পার্লামেন্টে এবং প্রাদেশিক বিধান সভায় পার্টির মধ্যে 'আরও বেশি সমাজবাদ চাই' দল গঠন করা হবে। উদয়াচলেও গত বছর এমন একটি দল গঠিত হয়।"

"শুনেছি। তার নাম 'জিঞ্জর গ্রুপ'। অশোক আপ্তে বলে একটি তরুণ তার নেতা বলে জানি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের দল নেহাৎ ছোট নয়। দশজন আমাদের গ্রুপের সভ্য। সহানুভূতিশীল আরও অনেকে।"

"বর্তমান মন্ত্রীত্ব সংকটে আপনারা কোশল-বিরোধী।"

"হ্যাঁ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের বিরুদ্ধে আমাদের অনেক অভিযোগ। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি দাম্ভিক, অহংকারী, অত্যন্ত বল-সচেতন। আমাদের মানুষ বলেই মনে করেন না। অশোক আপ্তেকে বিধান সভায় এবং পার্টি মিটিংএ বার বার অপদস্থ করছেন তিনি কেবল গায়ের ঝাল মেটাবার জন্যে। বর্তমান সংকটে আমরা তাঁর সঙ্গে আপোষ করতে রাজী নই। তিনি জমিদার ও মালিকদের মিত্র ; তাঁর নেতৃত্বে উদয়াচলে সমাজতন্ত্রের গোড়াপত্তন কিছুতেই হ'তে পারে না। তাছাড়া, তিনি কংগ্রেসের প্রাচীন রোগগুলি সব বাঁচিয়ে রেখে—ধরুন, জাত, ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক গোষ্ঠী—নিজের নেতৃত্ব পাকা করেছেন।"

"আপনার ধারনা সুদর্শন তুবে বা হরিশংকর ত্রিপাঠী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ে যোগ্য লোক ?"

"মার্জনা করবেন, রাজনীতিতে নেতা-নির্বাচনের পথ সর্বদা এক নয়। যখন এমন কোনও নেতা থাকেন যাঁর ভূমিকা ঐতিহাসিক, যিনি স্রষ্টা, যাঁর যাদু-নেতৃত্বে দেশ জাগে, মানুষের চিত্ত প্লাবিত হয়, স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে লক্ষ লোকের সৃজনী প্রতিভা তখন নেতা নির্বাচনের কাজ সহজ। কিন্তু কোনও দেশেই এমন নেতা বেশিদিন থাকেন না। তাঁরা ক্ষণজন্মা। বেশির ভাগ সময় রাজনৈতিক নেতারা, দেখতে পাওয়া যায়, অতি সাধারণ মানুষ—দশজনেরই একজন। রাজনীতির রহস্যময় খেলায় এঁদেরই একজন হঠাৎ নেতা হ'য়ে ওঠেন। সেক্সপীয়র বলেছেন—কেউ কেউ জন্ম হ'তেই বড়, কেউ বা কষ্ট ক'রে বড়,—আবার কেউ বা জোর ক'রে বড়। উদয়াচলে একজন বাদে সব নেতারাই হয় কষ্ট করে নয়তো জোর ক'রে নেতা।"

নীরব তুর্গাভাই-এর চোখে চোখ রেখে সরোজিনী সহায় অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বলল ; "সে একজন, আপনি।"

দুর্গাভাই প্রতিবাদ করতে চাইলেন। কণ্ঠে স্বর ফুটল না।

সরোজিনী সহায় বলল, "কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নেতা হবার কোনও যোগ্যতা নেই। অর্থাৎ এমন কিছু নেই যা আরও দুচার পাঁচজনের না আছে। আপনি তাঁর অতীত জানেন। ইংরেজের তাঁবেদারী ক'রে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু। তারপর কংগ্রেসে ঢুকে তিনি এ পর্যন্ত ভাগ্যবান। উদয়াচলের নেতৃত্ব ছিল আপনার—এখনও রয়েছে। আপনার সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে বহুদিন আগে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পতন হত। আপনি জানেন না, কি ভয়ংকর বিষে-বিষক্ষয় নীতির প্রয়োগে তিনি নিজের নেতৃত্ব বজায় রেখেছেন। আজ উদয়াচলের কংগ্রেস দল, উপদল, অনু-দলে জর্জরিত। জিলায় জিলায় ঝগড়া, গ্রামে গ্রামে কলহ। কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সরাতে না পারলে এ বিষ কংগ্রেসকে একদিন ধ্বংস করবে।"

দুর্গাভাই বললেন, "এ ব্যাধির দায়িত্ব একা কোশলজীর নয়।"

"মান্‌ছি। অন্যদের দোষ আমি ছোট ক'রে দেখছি না। আপনি বলছিলেন, সুদর্শন দুবে বা হরিশংকর ত্রিপাঠী কোশলজীর চেয়ে ভাল লোক কি না। হয়তো, না। কিন্তু এঁদের কাউকে উদয়াচলের নেতৃত্বে আমরা বরণ করতে চাই নে। আমরা চাই আপনাকে।"

"আমাকে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা জানি আপনি নেতৃত্ব চান না; দলীয় রাজনীতির নোংরা ঘাটায় আপনার আপত্তি। কিন্তু আপনার নিজের চাওয়া-না-চাওয়া, পছন্দ-অপছন্দর ওপরেও কিছু আছে। তার নাম, জনস্বার্থ। উদয়াচলের ও ভারতবর্ষের স্বার্থ। আমরা জানি আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের সঙ্গে আপনি সমদৃষ্টি নন। তবু আমরা বিশ্বাস রাখি আপনার আদর্শ ও পথের সঙ্গে দেশের বৃহত্তম সংখ্যার আদর্শ ও পথ মিলে যাবে। আপনাকে মুখ্যমন্ত্রী পেলে আমরা উদয়াচলে কংগ্রেসের সংগঠন বিপুল উৎসাহে গ'ড়ে

তুলব। আপনার নেতৃত্বের পেছনে এসে দাঁড়াবে চাষী, মজদুর, নিম্ন মধ্যবিত্ত, ছাত্র-ছাত্রী, সব। এক নতুন চেতনা এসে যাবে উদয়াচলে, নতুন গণ-জাগরণ ; একদিন তা ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত ভারতবর্ষে।"

শুনতে ভাল লাগছিল দুর্গাভাই-এর।

"ভেবে দেখুন, দুর্গাভাইজী। স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সংগ্রামের কথা একেবারে ভুলে গেছি। দেশের বিরাট জনশক্তিকে আমরা আর সম্পদ ভাবিনে, ভয় পাই। তাদের আমরা দূরে সরিয়ে রেখেছি ; রেখে, উপকার করতে চাইছি, কাছে টেনে এনে সমান আসন দি'নি। শাসক শাসিতের মধ্যে আজ যে দূরত্ব বোধ করি ইংরেজ আমলেও তা ছিল না। আপনি যদি আমাদের নেতৃত্ব করেন, কংগ্রেসের পতাকাতলে আমরা সবাইকে সমান সম্মানে সমবেত করব। দেশকে স্বাধীন করবার সময়ে যে জন-জাগরণ হয়েছিল, দেশ-গঠনেও তেমনি জাগরণ দেখতে পাবেন।"

দুর্গাভাই কিছু বলতে যাবেন, টেলিফোন বাজল।

অন্য প্রান্তে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। তার কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা।

"দুর্গাভাইজী ; শুনতে পেলাম আপনার তবিয়ত ঠিক নেই ?"

"তেমন কিছু নয়। একটু ক্লান্তি বোধ করছি।"

"করবেনই তো। সব দায়িত্বই তো আপনার ওপর। ডাক্তার দেখে গেছেন ?"

"না। ডাক্তারের দরকার নেই।"

"দরকার অবশ্য আছে। চন্দ্রপ্রসাদ সিভিল সার্জনকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার কাছে আসবে।"

"আশ্চর্য লোক আপনি। আজকের দিনেও এতসব দিকে আপনার নজর থাকছে কি করে ?"

"আপনার স্বাস্থ্য 'এত সবাদিক' নয়, দুর্গাভাইজী। আমি বর্তমানে দলীয় রাজনীতির গভীর পংকে ডুবে আছি। এ এক বিচিত্র

বাজার। এখানকার বেচা-কেনার নিয়মও বিচিত্র। একের পর এক নেতারা আসছেন। কখনও বা দলে, কখনও অ-দলে। কত তাঁদের নালিশ, অভিযোগ, দাবী। অবশ্যি, বৈচিত্র্য আসলে খুব নেই। দাবীগুলি সবই প্রায় এক বা দু'রকমের।"

"বলবেন না। আমার শুনে কাজ নেই।"

"না। বলবো না। এরই এক ফাঁকে চন্দ্রপ্রসাদ এসে দ্বার পথে উদিত হলেন। মুখখানা খুব হাসি-খুশি। দেখে আমার হঠাৎ জয়দেবের একটি শ্লোক মনে পড়ল 'স্ফুরদতি মুক্তলতা পরিরম্ভণ পুলকিত মুকুলিত চূতে'। পুলকে মুকুলিত সহকার তরু বসন্ত আবির্ভাবে। মনে হল, কিছু একটা দিগ্বিজয় ক'রে এসেছেন রাজকুমার। কিন্তু খবর যা দিল তা তো একেবারে অন্যরকম। বলল, আপনার মাথা ঘুরছিল, বাইরে লনে চুপ ক'রে বসেছিলেন।"

"সেরে গেছে। তবু, ডাক্তার বলিরামকে আসতে বলে আপনি বোধহয় ভালোই করেছেন। আমার ধন্যবাদ জানবেন।"

"এখন কাজকর্ম ছাড়ুন। গিয়ে শুয়ে পড়ুন।"

"কাজকর্ম কিছু করছি না। একটু কথাবার্তা বলছি।"

" 'ইতি চটুল-চাটু-পটু-চারু—' "

"বুঝলাম না, কোশলজী। আপনার মত আমি সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে পণ্ডিত নই।"

"কিছু না, দুর্গাভাইজী। রসিকজন, রসিকমন না হ'লে রাজনীতি করা অসম্ভব। আপনি কার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন আমি জানি।"

"আপনাকে তো আমি বলেছি টেলিফোনে।"

"তাইতো জানতে পেরেছি।"

"ডাক্তার কখন আসবেন?"

"একটু পরেই আশা করছি।"

"আচ্ছা। ধন্যবাদ।"

সরোজিনী সহায় অপ্রস্তুত হ'য়ে বলল, "আমি জানতাম না, অপনি অসুস্থ।"

"এমন কিছু নয়। একটু ক্লান্ত লাগছিল।"

"আমি তাহলে আব বেশি সময় নেব না। ডাক্তার ও তো এসে যাবেন।"

"আপনার কথা শুনতে ভাল লাগছিল," দুর্গাভাই-এর কণ্ঠ দুর্বল শোনাল।

"কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"কেন ?"

"কারণ খুব সহজ। আজ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে হারিয়ে যদি আমি মুখ্যমন্ত্রী হই, তাহলে আমি হব কংগ্রেসের অন্যতম দলপতি। অর্থাৎ, কাল একটি বা একাধিক বিশেষ দল এবং কতিপয় বিশেষ মানুষের সঙ্গে একজোট হ'য়ে আমাকে মুখ্য-মন্ত্রীত্ব করতে হবে। তাতে আমি রাজী নই।"

সরোজিনী সহায় কিছু বলতে গেল।

দুর্গাভাই তাকে নিরস্ত ক'রে উত্তেজিত স্বরে বলে চললেন, "প্রদেশের সব মানুষকে কংগ্রেসের পতাকাতলে একত্রিত ক'রে দেশগঠন করতে পারলে হ'ত। কিন্তু ভারতবর্ষ গণতন্ত্র—এখানে বহুদলের-রাজনীতি চলছে। কংগ্রেসতো কোনও দিনই সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল নয়ঃ আজও সে বহুস্বার্থের মিলিত প্লাটফর্ম। রাজনীতি যে ধারায় প্রবাহিত তার পরিবর্তন আজ আর সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী হ'তে চাইলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজেই আমায় আসন ছেড়ে দেবেন। আপনি হাসছেন ? কিন্তু তাঁকে আপনার চেয়ে আমি বেশি চিনি। মুখ্যমন্ত্রীত্বে সত্যিকারের আমার অধিকার নেই। আজ পাঁচ বছরের বেশি এ গুরু দায়িত্ব তিনি পালন ক'রে এসেছেন; সহকর্মী হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোনও নালিশ নেই। তিনি যা কিছু করেছেন সব আমি সমর্থন করিনে; সব মানুষের

মত তাঁরও দুর্বলতা আছে ; কিন্তু আজ যাঁরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, মানুষ হিসেবে, নেতা হিসেবে, তিনি তাঁদের চেয়ে শ্রেয়। আজ যদি তাঁকে সরিয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রী হ'য়ে বসি, লোকে বলবে বৃদ্ধ বয়সে ক্ষমতা ও সম্মানের লোভই একাজ আমায় করিয়েছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের চেয়ে সফল মুখ্যমন্ত্রী আমি হ'তে পারবো কি না সন্দেহ, কারণ রাজনীতির নোংরা আমি ঘাটতে জানি নে, বার বার আমার পরাজয় হবে, পতন হবে, স্খলন হবে।"

"একটা কথা ভেবে দেখছেন কি ?"

"কি কথা ?"

"আজ যদি হরিশংকর ত্রিপাঠী মুখ্যমন্ত্রী হন, তাঁকে সর্বদা আপনার ইচ্ছেমত চলতে হবে। অর্থাৎ আপনি অনায়াসে তাঁর পথ নির্দেশ করতে পারবেন।"

"কি ক'রে ?"

"তিনি জানবেন, আপনার সমর্থন ছাড়া তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্ব একদিনও টিকবে না। সুতরাং আপনি যে পথে চালাবেন, তাঁকে সে-পথে চলতে হবে।"

দুর্গাভাই একবার ন'ড়ে চ'ড়ে বসলেন।

সরোজিনী সহায় বলল, "আমি জানি, তিনি আপনার নির্দেশ মত চলতে এবং মন্ত্রীত্ব চালাতে সম্পূর্ণ তৈরী। কারণ তিনি জানেন আপনার পথ জনকল্যাণের পথ।"

দুর্গাভাই এবার যেন অনেক দূর থেকে কথা বললেন ঃ

"আপনি আমায় জানেন না। আমি রাজা হ'তে চাইনে। রাজা বানাতেও চাইনে। এবার আপনি আসতে পারেন। নমস্তে।"

একুশ

সূর্যপ্রসাদ বলেছিল, উদয়াচলে বর্তমান রাজনৈতিক নাটকের একমাত্র নায়িকা সরোজিনী সহায়।

সূর্যপ্রসাদের অনেক উক্তির মত এটাও আংশিক সত্য। সরোজিনী সহায়ের ভূমিকা নাট্যমঞ্চের উপর, পাদপ্রদীপের ঝলসান আলোর সামনে, দর্শকের মুখোমুখি। পদ্মাদেবী এবং মনোরমার ভূমিকা নেপথ্যে।

উদয়াচলের বিধান সভায় মহিলা সদস্য সর্বসমেত ছয়জন। এঁদের দুজন বিরোধীদলের, চারজন কংগ্রেসের। এঁদের কারুরই রাজনৈতিক মূল্য বেশি নয়। বস্তুত পক্ষে, হাই কমাণ্ডের নীতি—যথাসম্ভব বেশি মহিলাদের বিধান সভায় আসন দেওয়া—পালন করবার জন্যেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও দুর্গাভাই চারজন স্ত্রীলোককে নির্বাচনে দাঁড় করিয়েছিলেন। এঁদের কাউকে মন্ত্রীসভায় স্থান দেবার প্রশ্ন ওঠেনি।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মাঝে মাঝে কৌতুক ক'রে বলতেন, "উদয়াচলের মন্ত্রীদের চরিত্র শুদ্ধ হ'তে বাধ্য। এমন পুরুষ-প্রধান বিধানসভা ও সবপুরুষ মন্ত্রীসভা সারা ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নেই!"

সুতরাং কয়েক বছর আগে, ট্রেড-ইউনিয়নের শাখাপথ ধ'রে উদয়াচলের কংগ্রেসী রাজনীতিতে সরোজিনী সহায়ের আবির্ভাব বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

সে যে কিভাবে বিলাসপুরে উপস্থিত হ'য়ে নিজের আসন তৈরী ক'রে নিল, কেউ ঠিক বলতে পারে না। তবে এটুকু সবাই জানে যে তাকে বিলাসপুরে আনবার মূলে তৎকালীন শ্রম-মন্ত্রী হরিশংকর ত্রিপাঠী।

হরিশংকর উদয়াচলের জাতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের

সভাপতি। শ্রমিকদের উপযুক্ত সামাজিক শিক্ষাদেবার জন্যে তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। স্কুলের দায়িত্ব বহন করতে নিয়ে এলেন সরোজিনী সহায়কে আহ্‌মেদাবাদ থেকে। সরোজিনী তখন এম. এ. পাশ ক'রে দুবছর বিদেশে ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠন ও পরিচালনা শিখে সবেমাত্র দেশে ফিরেছে।

শ্রমিকদের বিদ্যালয় সরোজিনীর নেতৃত্বে উত্তরোত্তর স্ফীত হ'য়ে উঠল। শুরু হয়েছিল বিশ-পঁচিশ জন নিয়ে, একবছরে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা একশ' ছাড়িয়ে গেল। স্কুলের জন্য আলাদা বাড়ীভাড়া নেওয়া হল, আরও দুজন শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। বিদেশীরা স্কুল দেখে প্রশংসা করতে লাগলেন। দিল্লীর নেতাদের দু একজনও সাধুবাদ দিলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একদিন শ্রম-মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন "ত্রিপাঠীজী, আপনারা নাকি শ্রমিকদেব জন্যে একটি বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন?"

"শ্রম-বিভাগ করেনি। আই. এন. টি. ইউ. সি-র স্কুল।"

"ও। সরকারী কোনও অর্থ সাহায্য দেওয়া হচ্চে না?"

"সামান্য। শ্রম-বিভাগের শ্রমিক-কল্যাণ ফাণ্ড থেকে বছরে মাত্র দশহাজার টাকা।"

"শিক্ষা বিভাগ কিছু দিচ্ছে না?"

"সামাজিক শিক্ষাবাবদ বরাদ্দ টাকা থেকে স্কুলকে শিক্ষামন্ত্রী দশহাজার টাকা বাৎসরিক সাহায্য মঞ্জুব করেছেন।"

"বেশ, বেশ। স্কুলটির বেশ সুখ্যাতি শুনতে পাই।"

"চলছে ভালোই।"

"কি শিক্ষা দেওয়া হয় শ্রমিকদের?"

"ট্রেড-ইউনিয়ন কি ভাবে গঠন করা উচিত, কিভাবে ভালো ক'রে চালান যায়, শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হ'য়ে কেমন করে নিজেদের অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে, বাড়ীঘর সাফ রাখা, স্বাস্থ্যের

নিয়ম মেনে চলা, সন্তানদের সুন্দর ভাবে মানুষ করা—এসব শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে।"

"খুব ভাল। স্কুলটি চালায় কে ?"

"ম্যানেজিং কমিটি আছে। তার অধিকাংশ সদস্যই শ্রমিক। মালিকদের দুজন প্রতিনিধি আছেন, দুজন আই. এন. টি. ইউ. সি-র, একজন শ্রমদপ্তরের।"

"খুব সুন্দর ব্যবস্থা।"

"মালিকরা স্কুলের জন্য একটি বাড়ী দিয়েছেন, তাছাড়া বছরে আড়াই হাজার টাকাও দিচ্ছেন।"

"বাঃ! পড়াশোনার দায়িত্বও বুঝি ম্যানেজিং কমিটির ?"

"শিক্ষকদের।"

"শিক্ষক কজন ?"

"ঠিক জানিনে। তিন চারজন হবে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেশ একটু আশ্চর্য হ'য়ে লক্ষ্য করলেন হরিশংকর বহুযত্নে সরোজিনী সহায় নামটি পর্যন্ত এড়িয়ে গেলেন। সরোজিনীর খবর তিনি জানতে পেরেছিলেন। এবার তাঁর কৌতূহল বেড়ে গেল।

কয়েকদিনের মধ্যে তিনি সরোজিনী সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য পেয়ে গেলেন। উত্তর প্রদেশ নিবাসী স্থানেশ্বর সহায় আহ্‌মেদাবাদে কাপড়ের কলে মাঝারি ধরনের কাজ করে। তার তৃতীয়া কন্যা এবং পঞ্চম সন্তান সরোজিনী। স্থানেশ্বরের সঙ্গে হরিশংকর ত্রিপাঠীর বহুকালের পরিচয়। সরোজিনী কলেজে পড়ার সময় একটি সহপাঠী ক্রিশ্চান ছেলেকে বিবাহ করে। এজন্য তাকে পিতার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হয়। দুবছর পর তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। বিচ্ছেদের কারণ রিপোর্টে স্পষ্ট পেলেন না কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। সরোজিনী তারপর এম. এ. পাশ করল এক মিশনারী সাহেবের সাহায্যে। তিনিই তাকে বৃত্তি পাইয়ে বিদেশে যাবার

ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। বিদেশে ট্রেড-ইউনিয়ন সম্বন্ধে পড়াশোনা করল, হাতে-কলমে শ্রমিকদের সঙ্গে কাজও। দেশে ফিরে এসে চাকরীর সন্ধান করছিল এমন সময় বোম্বাই-এ হরিশংকর ত্রিপাঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। এবং তার পর বিলাসপুরে শ্রমিক-কল্যাণ-বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল হ'য়ে আগমন।

রিপোর্টের সঙ্গে একখানা ফটো ছিল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেখলেন, সরোজিনী সহায় সুন্দরী এবং তরুণী।

তার অতীত বা বর্তমানে এমন কিছু পেলেন না যাতে তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার মনে হল। তবু হরিশংকর ত্রিপাঠীর ব্যবহারে আশ্চর্য হওয়াটা ফুরিয়ে গেল না। মেয়েটিকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন কেন ত্রিপাঠীজী? একটা ব্যাখ্যাও তার মনে এল। পরিণত বয়সে হরিশংকর ত্রিপাঠির অন্তরে নতুন রং লেগে থাকবে। এসব ব্যাপারে মাথা গলাবার বা ঘামাবার লোক নন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল।

একদিন খবর পেলেন সরোজিনী সহায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতির সভ্যা মনোনীত হয়েছেন।

এও এমন কিছু তাৎপর্য পূর্ণ ব্যাপার নয়। তখন সুদর্শন দুবে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি। শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসেবে সরোজিনী সহায়কে কার্যকরা সমিতির সভ্যা মনোনয়ন করা তাঁর ক্ষমতার বাইরে নয়। প্রাদেশিক কংগ্রেসের সঙ্গে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সম্পর্ক শীতল। কে একজন নতুন ব্যক্তি এসে সুদর্শন দুবের দল ভারী করল তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ চিন্তিত হলেন না।

কিন্তু চিন্তার কারণ ঘটল শীঘ্রই।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন লক্ষ্য করলেন, তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মধ্যে একটি 'বাম-পন্থী' দল তৈরী হ'তে চলেছে। এদের কথাবার্তায় প্রথমে তিনি কান দিতেন না। কিন্তু দেখতে পেলেন এদের সমালোচনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। এরা তাঁকে জমিদার

ও শিল্পপতিদের বন্ধু বলে নিন্দা করছে। সরকারী পরিসংখ্যান দিয়ে 'প্রমাণ' করছে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সচেতন এবং সক্রিয় ভাবে সমাজ-তন্ত্রের বদলে উদয়াচলে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র গ'ড়ে তুলছেন। তিনি, অতএব, কংগ্রেসের আদর্শের বিরুদ্ধে চলছেন; তাঁর নীতি ও কর্মপন্থার সংশোধন প্রয়োজন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানতে পারলেন, এই বামপন্থী উপদলটির আসল প্রেরণা সরোজিনী সহায়।

প্রথম প্রথম তেমন গায়ে মাখলেন না। বিধান সভার কয়েকটি তরুণ কংগ্রেসী সদস্যদের নিয়ে 'বামপন্থী' উপদল। জিঞ্জব গ্রুপ। এঁরা অর্থনৈতিক, শিল্প-প্রসার ও কৃষিবিষয়ে মাঝে মধ্যে বিবৃতি দিয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে। বিবৃতি প'ড়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কৌতুক লাগত। অনেক সুন্দর সুন্দর শব্দ, যার মানে পর্যন্ত তিনি জানেন না। কে লিখে দেয় এসব বিবৃতি? সরোজিনী সহায়? তাহলেতো মেয়েটি সত্যিকারের শিক্ষিতা?

প্রথম প্রমাদ গণলেন এই 'বামপন্থী' দলের সঙ্গে সুদর্শন দুবে ও হরিশংকর ত্রিপাঠীর যোগাযোগ জানতে পেরে। বুঝতে পারলেন এ বিষবৃক্ষ শিশুকালেই উৎপাটিত করতে হবে।

এই সময় সুদর্শন দুবে সরোজিনী সহায়ের প্রতি গভীর ভাবে আসক্ত। এক দিকে সুদর্শন দুবে — অন্যদিকে হরিশংকর ত্রিপাঠী: এই দুই অতিকায় পুরুষের সাহায্যে উদয়াচল কংগ্রেসে সরোজিনী সহায়ের প্রাধান্য দ্রুত বাড়বার উপক্রম। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানতে পারলেন সরোজিনীকে সহ-সভাপতির পদে নির্বাচিত করাবার চেষ্টায় রত হয়েছেন সুদর্শন দুবে। সাহায্য করছেন হরিশংকর ত্রিপাঠী।

এতদিন নিষ্ক্রিয় থাকবার পর এবার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল কল কাঠি নাড়লেন।

কয়েকদিনের মধ্যে সুদর্শন দুবে এবং সরোজিনী সহায়কে নিয়ে মুখরোচক কাহিনী জমে উঠল বিলাসপুরে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আবিষ্কার করলেন, দু'জন মন্ত্রী সরোজিনী সহায়কে বিদেশ সফরের জন্যে এক বছর আগে বেশ কিছু টাকা পাইয়ে দিয়েছেন। একজন হরিশংকর ত্রিপাঠী, অন্যজন মহেন্দ্র বাজপাঈ।

কাগজ পত্র তিনি একদিন দুর্গাভাই-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কয়েকদিন পরে দুজনে কথাবার্তা হল।

দুর্গাভাই বললেন, "মেয়েটিকে আপনি জানেন?"

"না। দেখিনি কখনও। শুনেছি বেশ সুশ্রী।"

"অর্থসাহায্যের ব্যাপারটা এমনিতে খুব গুরুতর নয়। অর্থ বিভাগের সম্মতি নিলে একেবারে নির্দোষ হত।"

"তা ঠিক। কিন্তু কাগজে কাগজে এ নিয়ে কি সব লেখা হচ্চে দেখেছেন তো?"

"মন্ত্রীদের চরিত্র নিয়ে সমালোচনা অত্যন্ত অন্যায়।"

"দুর্গাভাইজী, আপনার মত শুচিশুদ্ধ মানুষ সবাই নয়, হতে পারেও না। আমি মানুষের দুর্বলতা মার্জনা করতে রাজী। তবে, এসব বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হ'তে হয়।"

"হুঁম। হয়তো কিছুই ঘটেনি। তবু মন্ত্রীদের আমার মতে, সীজর-পত্নী হওয়া দরকার। সব সন্দেহের বাইরে। কংগ্রেস-শাসন নিয়ে স্ত্রীঘটিত কেচ্ছা রটলে আমার সহ্য হবে না।"

"আমিও তাই বলি।" একমত হলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। "সরোজিনী সহায়কে বিলাসপুর এবং উদয়াচল থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিলেই সব চুকে যায়। সুদর্শন দুবের কথা বলছিনে। হরিশংকর ত্রিপাঠীকে আমি বিশ্বাস করি না। ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মী হিসেবে সে তো অন্য প্রদেশেও কাজ করতে পারে।"

এর কিছুদিন পরে কংগ্রেস সভাপতি বিলাসপুর এলে দুর্গাভাই তাঁর সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করলেন।

মাসতিনেক পরে সরোজিনী সহায় বৃহত্তর শ্রমিক কল্যাণ বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়ে কাণপুর বদলী হল।

সে যে কি করে, কোন্‌ পথে আবার বিলাসপুরে ফিরে এল, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তা জানতে পারেন নি। মন্ত্রীসভা নিয়ে গোলমাল চলছিল অনেকদিন; ছোটখাট বিষয়ে মন দিতে পারছিলেন না কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। তথাপি একদিন খবর পেয়ে বিস্মিত হলেন যে জিঞ্জর গ্রুপে'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ সভায় সভানেত্রী হবে ট্রেড-ইউনিয়ন নেত্রী সরোজিনী সহায়।

তার মাসছয়েক পরে কাগজে দেখলেন উদয়াচলের আই. এন. টি. ইউ. সির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে সরোজিনী সহায়।

বাইশ

উপদলপতিদের শেষ দল যখন বিদায় নিলেন তখন সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। সূর্য অস্তগামী পশ্চিমের আকাশ সূর্যের শেষ আভায় বিষণ্ণ-রক্তিম। সন্ধ্যার প্রথম কৃষ্ণচ্ছায়া দূরতম দিগন্তে নেমে এসেছে। গভীর নীল আকাশে দ্রুত পট বদলিয়ে কালো হ'য়ে উঠেছে; ভীতচকিত পাখী প্রাণপণে ছুটছে নীড়ের আশ্রয়ে। ধ্রুব-তারা জেগে উঠেছে উত্তর দিগন্তে। প্রতি মুহূর্তে নতুন তারা অন্ধকারের আলোয় আত্মপ্রকাশ করছে।

দীনদয়াল পাথরের গ্লাসে দইএর সরবৎ নিয়ে এলো।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে বললেন, "তিওয়ারীকে ডেকে দে।"

দীনদয়াল প্রশ্ন করল, "হাঁটতে যাবেন না?"

"যাবো।"

"সন্ধ্যা হ'য়ে এলো।"

"উঠছি।"

"মা আপনাকে একবার অন্দরে যেতে বলেছেন।"

"কেন?"

"তাতো বলেন নি।"

"আচ্ছা। তুই যা। তিওয়ারীকে ডেকে দে।"

একটু পরে তিওয়ারী হাজির হল।

আমি একটু পরে পায়চারি ক'রে আসছি। বড় ক্লান্ত লাগছে তেষ্টাও পাচ্ছে খুব।"

তিওয়ারী নীচু গলায় বলল, "আচ্ছা।"

"চ্যাটার্জি এলে বসতে বোলো। একটু দেরী হ'তে পারে আমার।"

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। দপ্তর ঘরে তখনও কর্মচারীরা কাজ করছে। সবাই তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়াল। বড় বড় পা ফেলে তিনি দপ্তর-বাড়ী ত্যাগ ক'রে খাস-মহলের দিকে অগ্রসর হলেন। দীনদয়াল বাড়ীর মধ্য থেকে খদ্দরের চাদর এবং বেতের ছড়ি নিয়ে মাঝ পথে তাঁর হাতে তুলে দিল। খাস মহল ডান দিকে রেখে মুখ্যমন্ত্রীভবনের বিরাট লনে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হাঁটতে গেলেন। অন্যান্য দিন এসময় সচরাচর তার দুচারজন সঙ্গী থাকে। হয় কোনও মন্ত্রী, নয় কোনও রাজনৈতিক নেতা, নয়তো সাক্ষাৎ প্রার্থীদের কয়েকজন। মাঝে মধ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একাই পায়চারি করতে চান। বিশেষত যখন তাঁর মন কোনও কিছুতে বিশেষ আবিষ্ট থাকে। কিংবা যখন একাকী ভ্রমণের নির্জন আনন্দটুকু লোভনীয় মনে হয়।

আজও তিনি যখন বাগানের দিকে অগ্রসর হলেন, বারান্দায় চার পাঁচজন সাক্ষাৎ প্রার্থী সমবেত হ'য়েছিল। তিওয়ারী এদের জানিয়ে দিয়েছিল কোশলজীর আজ সময় হবে না কথা বলার; তথাপি এরা বিদায় নেয়নি। সাধারণ মানুষ এরা, এসেছে অনেক দূর থেকে; আশা নিয়ে এসেছে কোশলজী এদের আর্জি শুনবেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা এদের ছোটখাট ভিড় হয়। দশজনের বেশি প্রহরী অন্দরে ঢুকতে দেয় না। যারা আগে আসে তারাই ঢুকতে পাবে। দশম জনের প্রবেশের পর ফাটক বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। রাস্তায় বাকীরা ভিড় জমাতে পারে না। ফিরে যায়।

প্রায় প্রতিদিনই সান্ধ্য পায়চারিতে বার হবার সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এদের মধ্যে এসে দাঁড়ান। একজন সেক্রেটারী তাঁর পাশে দাঁড়ায় নোটবই আর পেন্সিল নিয়ে। দর্শন প্রার্থীরা হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রত্যেকের দুহাত নিজের দুহাতে নিয়ে কর

মর্দ্দন করেন। তারপর একে একে প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেন। এক এক জনের সঙ্গে কথা বলার পর সেক্রেটারীকে নির্দেশ লিখে নিতে বলেন।

"সীতাপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট। লোচন সিং, গ্রাম সোনাচর, পেশা ক্ষেত মজুব। খাজনা না দিতে পারায় পুলিশ ওব বাড়ী ক্রোক করার ভয় দেখিয়েছে। এক বছরের খাজনা এব্র মার্জনা করা হোক। তিনমাস সময় দেওয়া হোক খাজনা দেবার।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অন্তরঙ্গ বন্ধুদের বলেন, "এ আমার একমাত্র সামন্ততান্ত্রিক বিলাসিতা। দূর দূর গ্রাম-শহর থেকে প্রতিদিন যারা আমার দর্শন প্রার্থী হ'য়ে এবাড়ীর দরজায় হাজির হয়, তাদের আবেদন, সম্ভব হলে আমি মঞ্জুব করি। কাউকে একেবারে ব্যর্থ-মনোরথ ক'রে ফিরিযে দিতে আমার তুঃখ হয়। আমি জানি, যারা এখানে এসে জড় হয় না, তাদেরও অভিযোগ, নালিশ অনেক। তবু যারা আমার দরজায় এসে দাঁড়ায় তাদের প্রতি কেমন তুর্বলতা বোধ করি।"

কোনও কোনও দিন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আগন্তকের সঙ্গে দেখা করার সময় পান না। কর্মচারীদের মধ্যে একজন এসে সবিনয়ে ভাব হ'য়ে মার্জনা প্রার্থনা করে। বলে, "কোশলজীর আজ একেবাবে সময় নেই। আপনারা মাপ করবেন। আগামীকাল আসবেন, যদি ইচ্ছে হয়।"

ওরা চলে যায়। পরেরদিন আবার আসে। যার গরজ খুব বেশি সে তুপুরের পরেই এসে দরজার অনতিদূরে গাছতলায় ব'সে থাকে। দশজনের একজন না হ'তে পারলে প্রবেশের ছাড়পত্র পাওয়া যাবে না।

আজ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সত্যিই সময় নেই। তাই তিওয়ারীকে আগেই বলে দিয়েছিলেন, সন্ধ্যা বেলা অনাহুত কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। বাগানের দিকে অগ্রসর হবার সময়

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একবার তাকিয়ে এদের দেখলেন। সংখ্যায় বেশি নয়, চার পাঁচজন। মনটা কেমন কোমল হ'য়ে উঠল। ফিরে গিয়ে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সামনে দাঁড়ালেন।

"আজ আমার একেবারে সময় নেই। সকাল থেকে বড় ব্যস্ত আছি। চটপট বলুন আপনারা, কি সেবা আমার দ্বারা সম্ভব।"

একজন সেক্রেটারী ততক্ষণে নোটবুক ও পেন্সিল নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে।

বেশ খানিকটা পরিতৃপ্তি নিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সান্ধ্য পায়চারিতে নিযুক্ত হলেন। এখন আকাশ লাল নেই ; সন্ধ্যা নেমে এসেছে। অন্ধকারের কোমল স্পর্শে পৃথিবী স্নিগ্ধ হ'তে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী ভবনের লন বিরাট। ঘন সবুজ ঘাসের গালিচায় ঢাকা। চারিদিকে নানা রকম ফল, ফুল ও বাহারে পাতার গাছ। মালতী, কামিনী, করবী, টগর ও অপরাজিতার মিলিত সৌরভ। হাস্নাহানার উগ্র-মধুর গন্ধ। গাছ থেকে অসংখ্য ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকের সঙ্গে কদাচিৎ দু একটা পাখীর ডাকও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শুনতে পাচ্ছেন। নির্মল আকাশে লক্ষ কোটি তারকার মৌন সজাগ কুতূহলী দৃষ্টি। পৃথিবীর মানুষের রাত্রি-জীবন দেখে নেবার অদম্য আগ্রহ।

দিনের শেষ ও রাত্রির শুরু: এই সন্ধ্যা আজীবন কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বিচলিত করেছে। সারাদিনে জীবন যেন বড় বেশি ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে। সন্ধ্যা তাকে গুছিয়ে আনে, অজানা রহস্যের লোভে সে সংকুচিত হ'য়ে আসে। রাত্রির জমাট অন্ধকারে জীবনরহস্য ঘন হ'য়ে ওঠে। সৃষ্টির প্রতি কোণ হ'তে বিষণ্ণ উদাস জিজ্ঞাসা সন্ধ্যায় তরল অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। হঠাৎ দেখা যায় তারা ঘিরে দাঁড়িয়েছে জীবন্ত মানুষকে। সে-সব বোবা জিজ্ঞাসার ভাষা শুনতে পেলেও বোঝা যায় না; অথচ তারা জবাবের জন্যে জুলুম করে। বার বার সন্ধ্যায় চটুল অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে, কিম্বা পদসঞ্চালনে, কৃষ্ণ-

দ্বৈপায়নের মনে হয়েছে মানুষ কত ক্ষুদ্র, কত নিঃস্ব, কত দুর্বল, অথচ কি বিরাট, ব্যাপক, ভয়ানক তার বেচে থাকার দাবী। "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণা সন্তি তে বসন্তি কলেবরে।" মানুষ এতো ব্যাপক ও বিরাট বলেই এতো দীন, এতো শূন্য। এমন ব্যাকুলভাবে চায় বলেই তার পাওয়ায় তৃপ্তি নেই। এতো দিতে চায় আর নিতে চায় বলেই সে দিয়ে নিতে পারে না, নিয়ে পারে না দিতে।

বাগানে বড় বড় পা ফেলে পরিক্রমণ করতে গিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মনে হল, পদ্মাদেবীর দাবী যতোই-না অসম্ভব হোক, তাঁর অভিযোগ অসত্য নয়। সত্যিই আমার বয়স হয়েছে ; বাইবেলের তিনকুড়ি-দশের বেশি দেরী নেই। জীবনে ভোগ কম হয়নি। অনেক ঘটনা, অনেক মানুষ, অনেক বৈচিত্র্য নিয়ে আমার অতীত। পেয়েছি কম নয় ; জীবন থেকে আদায় ক'রে নিয়েছি অনেক সে তুলনায় বরং দিয়েছি কম। এই পাঁচ-ছয় বছর অমিত প্রতাপে উদয়াচলের নাট্যমঞ্চে বিরাজ করেছি। নতুনের আস্বাদ বারবার জীবনে অপূর্ব উন্মাদনা এনেছে। এক-একটি নতুন গড়া বাধ, কারখানা, পুল, এমন কি স্কুলগৃহ দেখে পর্যন্ত যে উন্মাদনা পেয়েছি তার সঙ্গে প্রথম প্রেমেরই একমাত্র তুলনা করা যায়। মনে আছে যেদিন সোনামুখী নদীর বাঁধ উদ্‌ঘাটন হল। হাজার হাজার মানুষের সমাবেশে অজানা অচেনা কুসুমপুর গ্রাম অবর্ণনীয় রূপ ধারণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী এসেছেন দিল্লী থেকে। সোনামুখী ছিল অবাধ্য নদী ; গ্রীষ্মে ক্ষীণাঙ্গী, বর্ষায় সর্বনাশ বয়ে আনা প্রগল্‌ভা দামিনী। তাকে বেঁধে তৈরী হয়েছে বিরাট জলাশয়, যেন এক টুকরো সাগর। বাঁধের একাংশ খোলা : সোনামুখী বিরাট গর্জনে প্রবাহিত। অদূরে নতুন তেরী বিদ্যুৎ কারখানা। বহুকালের খল-স্বভাব নদী কি আশ্চর্য ঔদার্যে হঠাৎ মানুষের জীবন শস্যে, ফুলে, আলোয় ভ'রে দিতে নতুন রূপ নিয়েছে! সেদিন মনে হচ্ছিল বিধাতা অসীম কৃপায় আমাকে দিয়ে উদয়াচলের

রূপায়ণ করছেন। যে ঐতিহাসিক সম্মান ও মর্যাদা ভাগ্যক্রমে আজ আমার, তার যোগ্য না হ'তে পাবলেও তাকে যেন অপমান না করি।

পদ্মাদেবী বলছেন, অনেক হয়েছে, এবার ত্যাগ করো, ছেড়ে দাও, রেহাই দাও নিজেকে। ভাবতে বিস্বাদ হাসি পেল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের। সুদর্শন দুবে, হরিশংকর ত্রিপাঠী আর মহেন্দ্র বাজপাঈ! একসঙ্গে বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁর পতন ঘটাবার চেষ্টা! সে চেষ্টাকে আমি প্রায় ব্যর্থ ক'রে এনেছি। পদ্মাদেবী ঠিকই বলেছেন: এতোদিন যা কবিনি, কবতে হয়নি, আজ তাই ক'বে এঁদের হারিয়েছি। এতদিন দাম না দিয়ে রাজত্ব করেছি, আজ রাজত্ব করবার জন্যে দাম দিতে হল। তা হোক। আমি না দিলে এব চেয়ে অনেক বেশি দাম দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হত হরিশংকর ত্রিপাঠী বা সুদর্শন দুবে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে মুখ্যমন্ত্রী রাখবার জন্য উদয়াচলেব মত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর প্রদেশেও যদি কংগ্রেস দুর্বল হ'য়ে যায়, তবে তার বল সত্যিই খুব কম। যে মাটি থেকে রস টেনে সে জীবিত, সে মাটিতে তা হলে সার গেছে নিঃশেষ হ'য়ে।

সত্যিই কি অনেক দাম দিয়েছি? কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অন্ধকারে চুপি চুপি প্রশ্ন করলেন নিজেকে। উত্তর শুনলেন, তা একেবারে কম দাওনি। প্রতিবাদ ক'রে বললেন, কই? দুর্গাভাই দেশাইকে আমি ছাড়ছি না। শুনতে পেলেন. তাঁর পাখাও কেটে দিচ্ছ তুমি। যেভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করতে যাচ্ছ, দুর্গাভাই তাতে যোগ না দিয়ে পারবেন না,—যাবেন কোথায়?—কিন্তু তাঁর এতদিনকার সম্মান ও প্রভাব আর থাকবে না। হাসি পেল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের। বললেন, বড্ড সুচিবাই লোকটির; নিজের সুনাম বাঁচাতে সব কিছু করতে পারেন। অত সুনামের মায়া থাকে, মন্ত্রীসভায় না এলেই পারবেন! শুনতে পেলেন, শুচিস্নিগ্ধ লোকটিকে রাখতে পেরেছিলে, তাই তোমারও সুনাম ছিল, শক্তি ছিল। এবার তুমি

তাকেও কিছুটা নোংরা ক'রে নিচ্ছ। মন্ত্রীত্ব না নিয়ে যাবেন কোথায়? বনবাসে? মন্ত্রীত্বের জন্যে তোমার কাছেই আসবেন, লজ্জার মাথা খেয়ে, বিবেকের সঙ্গে গোঁজামিল পাতিয়ে; কিন্তু এই বিশুদ্ধ মানুষটিকে নীচে নামিয়ে তুমি নিজেকেও দুর্বল ক'রে ফেললে।

প্রতিবাদ করলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। সত্যি নয়, সত্যি নয়। দুর্গাভাইকে আমি অর্থমন্ত্রী রাখবো, তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব তেমনি থাকবে যেমন রয়েছে এতোদিন। শুনতে পেলেন, একথা সত্যি নয়। তুমি সুদর্শন দুবেকে মন্ত্রীত্ব দিতে যাচ্ছ; আজ রাত্রেই তোমাদের মধ্যে বোঝাপড়া হবে, নতুন মন্ত্রীসভা হবে তোমার একার নয়, তোমাদের দুজনের। সুদর্শন দুবেকে স্থান দেওয়া মানেই দুর্গাভাইকে পঙ্গু করা। বলে উঠলেন, তা নয়। দুজনকে দুজনের বিরুদ্ধে খেলিয়ে দুজনকেই দুর্বল ক'রে রাখা। শুনলেন, তা হলে তুমিও দুর্বল হ'য়ে যাবে। তোমার সহকর্মীদের দুর্বল রেখে তোমার যে বল হবে তা আসলে দুর্বলত্ব।

বললেন, হরিশংকর ত্রিপাঠীকে মন্ত্রীসভায় নেব না ঠিক করেছি। সেটা বুঝি কিছু নয়? শুনতে পেলেন, কিছু নিশ্চয়, তবে অনেক কিছু নয়। কারণ, অল্পদিনের মধ্যেই হরিশংকরকে তুমি অন্য পদে বহাল ক'রে খুশি রাখবে। তা ছাড়া সরোজিনী সহায় সম্বন্ধে তোমার মতলব ভালো নয়। বললেন, না, না। আমি কিছুই ঠিক করিনি। জবাব এল, নিজেকে প্রতারণা কোরো না। তুমি জানো, মনে তোমার জটিল মতলব তৈরী হচ্চে।

প্রতিবাদ করলেন, সরিৎসাগর কোঠারীকে আমি রাখছি। স্বায়ত্বশাসন বিল আমি পাশ করাবোই। উত্তর হল, ভেজাল না দিয়ে পারবে না। এবার তুমি অনেক ভেজাল দেবে। শাসনে, ন্যায়-নীতিতে, জীবন দর্শনে। তার চেয়ে দলপতি পদে পুনর্বার নির্বাচিত হবার পর পদ্মাদেবীর উপদেশ মত, পদত্যাগ ক'রে

যদি সব ছাড়তে পারতে তোমার অনেক গৌরব হ'ত, উদয়াচলের ইতিহাসে তুমি স্মরণীয় হ'য়ে থাকতে।

এবার কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ভীষণ রাগ হল। বোবা উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, সব ছেড়ে কোথায় যাবো? আজ মুখ্যমন্ত্রী বলেই আমার যা কিছু সম্মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি। সাধারণ নাগরিক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে কাল বিলাসপুরের কেউ চিনতেও চাইবে না। রাস্তায় পায়ে হেঁটে চললে লোকে তাকে 'নমস্তে' পর্যন্ত করতে ভুলে যাবে। কি বলছ? রাজ্যপাল? রাজ্যপালের রাজ্য নেই, পাল তুলে সে কেবল অলস নৌকার মত ব'য়ে বেড়ায়ঃ ও জীবন আমার একদিনের জন্যও সইবে না। কেন্দ্রে মন্ত্রীত্ব? তার জন্য এ বৃদ্ধ বয়সে নতুন খবরদারী তাবেদারী করতে হবে, আর দূর দিল্লী হ'তে দেখব আমার এত আদরের উদয়াচলের উপর নিশান উড়ছে সুদর্শন তুবের কিংবা হরিশংকর ত্রিপাঠীর! জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত উদয়াচলকেই আমি মেনে এসেছি—এর প্রত্যেক জিলা, মহকুমা, থানা আমার জানা, প্রায় প্রত্যেকটি মানুষকে যেন আমি চিনি, তাদের মুখের ভাষা, বুকের ভাষ, সব আমি বুঝতে পারি। উদয়াচলের আকাশের প্রভাতে কি রং ধরে, সূর্য উঠবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে সে রং বদলায়, গ্রীষ্মের জলন্ত অপরাহ্নে গাছের পাতাগুলি কেমন কাতর হ'য়ে পড়ে, সন্ধ্যায় কিভাবে দিগন্তে রহস্য জমে ওঠে: সব আমার জানা। আজ জীবনের এই গোধূলি লগ্নে দূর প্রবাসে গিয়ে অপরের দাক্ষিণ্যে রাজ সম্মানও আমার অসহ্য।

আধঘণ্টার বেশি আজ আর হাঁটা হল না। ফিরলেন দপ্তর বাড়ীর দিকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। পথে দীনদয়াল গতি রোধ করল।

"মা একবার অন্দরে ডেকেছেন।"

"ও। আচ্ছা। যাচ্ছি।"

খাসমহলের ভিতরে ঢুকতে পদ্মাদেবীর সঙ্গে দেখা হল।

"তুমি আজ বড় ব্যস্ত। তবু তোমাকে বারবার ডাকতে হল। একটু বোসো। ছুটো কথা আছে।"

নিজের শয়ন ঘরে গিয়ে বসলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

পদ্মাদেবী পেছন পেছন এসে অদূরে দাঁড়ালেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর মুখে ক্লান্তি, ঔদাস্য, বেদনা মিলেমিশে নিরাকার ম্লান বৈরাগ্য সৃষ্টি করেছে।

কোথায় যেন বুকের মধ্যে কোন এক প্রাচীন তন্ত্রীতে ব্যথাব সুর বেজে উঠল।

পদ্মাদেবী বললেন, "আমি আজ রাত্রির গাড়ীতেই কাশী যাচ্ছি।"

"কেন? রাত্রে কেন?"

"তাতে সুবিধে। দিন থাকতে থাকতে পৌঁছে যাব।"

"সঙ্গে নিচ্ছ কাকে?"

"চন্দ্র যাচ্ছে।"

"ভাল। টাকা পয়সা বেশি ক'রে নিও। আর যত তাড়াতাড়ি পার চলে এসো।"

ক্ষীণ হাসি ফুটল পদ্মাদেবীর মুখে।

"তুমি আমার কথা শুনলে না।"

"না। শোনা সম্ভব নয়।"

"সাবধানে পা ফেলো। যতদূর পার নিজের গৌরব বাঁচিয়ে চলো।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রশ্ন করলেন: "পুত্রবধূর কাছে গিয়েছিলে?"

খানিকক্ষণ চুপ থেকে পদ্মাদেবী বললেন, "হ্যাঁ। কমলা গহনা নিয়েছে, টাকা নিতে রাজী হয়নি। তার মেয়েকে হারটা দিয়েছি।"

"শুনেছি সে বেটি খুব সুন্দরী হয়েছে।"

"যেন লক্ষ্মীর প্রতিমা।"

"আমি চলি এবার।"

"একটু দাড়াও। একটা প্রশ্ন করব। সত্যি জবাব চাই।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উঠেছিলেন। আবার বসলেন।

দুর্গাপ্রসাদকে আজকের দিনে এই বাড়ীর দরজায় এভাবে পুলিশের হাতে না তুলে দিলে কি তোমার মুখ্যমন্ত্রীত্ব বজায় থাকতো না?"

পদ্মাদেবীর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। চোখ জলে ভ'রে এল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উঠে দাঁড়ালেন। কথা বলতে গিয়ে দেখলেন গলা ধ'রে রয়েছে। গলা ঝাড়লেন শব্দ করে।

"উপায় ছিল না।"

"কেন? লোকের কাছে বাহবা একটু কম পেতে? আমার কথাও তোমার একবার মনে হল না?"

"আজ সন্ধ্যায় দুর্গাপ্রসাদের পার্টি জনসভা আহ্বান করেছিল, দিনের বেলা মিছিলের পর। এতে সুদর্শন দুবের সমর্থন ছিল। হঠাৎ খবর পেলাম হরিশংকর ত্রিপাঠি দুজন লোক ভাড়া করেছে দুর্গাপ্রসাদ যখন বক্তৃতা করবে তখন তাকে পাথর ছুড়ে জখম করবার জন্যে। হরিশংকর জানে, দরকার হলে সুদর্শন দুবে তার সঙ্গ ত্যাগ করবে। সে এ-ও জানে, আমার নতুন মন্ত্রীসভায় তার স্থান হবে না। একটা শেষ রসিকতা সে আমার সঙ্গে করতে চাইবে মনে হচ্ছিল। রিপোর্ট পেয়ে মনে হল. 'এই তার শেষ রসিকতা।' রিপোর্ট সত্যি নাও হ'তে পারে। দুর্গাপ্রসাদের শরীরটা তেমন ভালো নেই শুনেছিলাম। চন্দ্রপ্রসাদই বলেছিল সেদিন। দেখলাম বেশ রোগা হ'য়ে গেছে, গায়ের রং আর নেই। ভাবলাম, দু-একমাস একটু বিশ্রামে থাকুক।"

পদ্মাদেবীর পানে তাকিয়ে সামান্য হাসলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

হাত তুলে বললেন, "প্রণামের কোনও প্রয়োজন ছিল না। সাবধানে থেকো। আর, ফিরে আসতে বেশি দেরী কারো না।"

তেইশ

দপ্তরবাড়ী ফিরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজের আপিস ঘরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আরাম ক'রে বসলেন। মনের এককোণে বিষাদ জমে রয়েছে, সঙ্গে খানিক ক্লান্তি। কিন্তু মনের বেশির ভাগ শক্তি কাজে লেগে গেছে আসন্ন সংঘাতে বিজয় পরিপূর্ণ ও নিশ্চিত করতে। একখানা ফাইল খুলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কয়েক মিনিট হিসাব মেলালেন। মুখে প্রসন্ন আশ্বস্তির আভা ফুটে উঠল।

তিওয়ারী এল পানীয় নিয়ে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সতৃষ্ণ আগ্রহে চিক্কণ গ্লাসে চুম্বন দিলেন।

কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হল ঃ "আঃ।"

তিওয়ারী বলল, "এডিটর সাব অনেকক্ষণ বসে আছেন।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "আরেকটু বসুন।"

টেলিফোন বাজল।

"কোশল।"

"আমি পিতাজী। চন্দ্রপ্রসাদ।"

"বল।"

"মাকে নিয়ে রাত্রির গাড়ীতে কাশী যাচ্ছি।"

"জানি। সাবধানে যেয়ো।"

"আর কিছু কাজ আছে কি, পিতাজী ?"

"ওঙ্কারনাথ পণ্ডিতজীকে দিয়ে বেশ ভালো ক'রে ভগবান বিশ্বনাথের পূজা দিতে হবে। কাল তোমাকে 'তার' করবে তিওয়ারী।"

"বহুৎ আচ্ছা, পিতাজী।"

"তুমি কবে ফিরবে ?"

"দু'দিন থেকে মার সব গুছিয়ে দিয়ে চলে আসবো।"

"বেশ। ফিরে এসে দেখা কোরো। ডাক্তার নিয়ে দুর্গাভাইজীর বাড়ী গিয়েছিলে ?"

"জী হাঁ।"

"কি বললেন ডাঃ বলিরাম?"

"অতিরিক্ত পরিশ্রম ও মানসিক দুশ্চিন্তায় ক্লান্তি। সপ্তাহ খানেক বিশ্রাম করতে বললেন।"

"চিন্তার কারণ নেই তো কিছু?"

"না।"

"আচ্ছা, এসো তবে।"

"একটা প্রার্থনা আছে, পিতাজী।"

"বলো।"

"একটু হুসিয়ার থাকবেন।"

"থাকবো।"

"ধৃষ্টতা মাপ করবেন, পিতাজী। কাল আমি বিলাসপুর থাকবো না। আপনাকে আগে থেকেই জয়ের অভিনন্দন জানাতে চাই।"

"খুব চালাক হ'য়ে উঠেছ। টাকা পয়সা কিছু লাগবে নাকি?"

"না, পিতাজী। অনেক আছে।"

সুভাষ চট্টোপাধ্যায়কে যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ডেকে পাঠালেন, তখন মেজাজ বেশ চাঙ্গা, দেহের ক্লান্তি আর নেই, চোখে কৌতুকময় হাসি।

"এসো চ্যাটার্জি, এসো। অনেকক্ষণ তোমায় বসে থাকতে হল। আজ আর সময়ের হিসাব মেলাতে পারছি না।"

"কে একজন আমেরিকান বলেছেন, পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ বিয়াল্লিশ ঘণ্টা সপ্তাহের দাবী করছে। আর পৃথিবী চলছে যাঁদের জোরে তাঁরা চাইছে প্রতিটি দিন বিয়াল্লিশ ঘণ্টা চলুক।"

"তা বটে। তবে আমি আজ তা মোটেই চাইছি না। আমার ধৈর্য শেষ হ'য়ে এসেছে। আমি চাইছি এ নাটকের উপর এক্ষুণি যবনিকা পড়ুক।"

সুভাষ চট্টোপাধ্যায় বলল, "তার মানে, সব ঠিকঠাক আছে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "তোমায় কেন ডেকেছি বলি। সময় নেই। সব সংক্ষেপে সারতে হবে। প্রথম কাজ হল, কাল তোমার কাগজে রাজনৈতিক রিপোর্ট কি-রকম হবে। আমি বলে দিচ্ছি, তুমি লিখে নাও। যেমন বলছি ঠিক তেমন ছাপবে। একটি শব্দেরও যেন অদল বদল না হয়। নিজে প্রুফ দেখবে। সব দায়িত্ব তোমার।"

"বেশ। রাত্রে প্রেসেই থাকবো।"

লিখে নাও: "উদয়াচলের মন্ত্রীসভা নিয়ে সংকটের অবসান হয়েছে। আজ অপরাহ্ণে বিধানসভায় কংগ্রেসীদলের বৈঠকে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন কোশলের পুনর্নির্বাচন নিশ্চিত।

আশা করা যাচ্ছে তাঁর পুনঃ নির্বাচন হবে সর্বসম্মতিক্রমে। অর্থাৎ, সংগঠন ও সরকার, কংগ্রেসের এই তুই বাহু পুনর্বার মিলিত হবে। হাই কম্যাণ্ডের এই অভিপ্রায় সফল হবার পূর্ণ সম্ভাবনা। এর জন্যে দায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কোশল ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী সুদর্শন তুবের মিলিত প্রচেষ্টা।

"গতকাল প্রভাতে শ্রী তুবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যে সম্ভাবপূর্ণ আলাপ আলোচনা আরম্ভ করেন প্রায় মধ্য রাত্রিতে তুজনের দ্বিতীয় বৈঠকে তা সন্তোষজনক পরিণতি লাভ করে। ইতিমধ্যে, সারাদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জিলার নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যান। এ ধারাবাহিক আলোচনায় দেখা যায় দলের অধিকাংশ সদস্য শ্রী কোশলের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখেন।

প্রদেশ কংগ্রেস অধিপতি, মুখ্যমন্ত্রীর মতোই, কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ ও বলিষ্ঠ করবার জন্যে, সমান আগ্রহী। তিনিও বহু কংগ্রেস কর্মীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, এবং তাতে তাঁর ঐক্য ও সমন্বয়ের আগ্রহ গভীরতর হয়।

তুই পক্ষের এই গভীর আগ্রহের পরিণতি শ্রী কোশল ও শ্রী তুবের মধ্যরাত্রির বৈঠক। এই বৈঠক গভীর সম্প্রীতি ও

পারস্পরিক আস্থার সঙ্গে এক ঘণ্টা চ'লে। দুজনে সকল বিষয়ে একমত হ'য়ে পরস্পরের নিকট হ'তে বিদায় নেন।

উদয়াচলের নাগরিকগণ যখন নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন, প্রদেশের এই দুই কর্ণধার তখন একত্রিত হ'য়ে উদয়াচলের নির্বিঘ্ন অগ্রগতির পথ নিশ্চিত করেন।

এখন আশা করা যাচ্ছে যে আজকার সভায় শ্রী দুবের তরফ হ'তে মন্ত্রী শ্রী প্রজাপতি সেউড়ে দলপতি পদের জন্যে শ্রী কোশলের নাম প্রস্তাব করবেন, এবং মন্ত্রী শ্রী নিরঞ্জন পরিহার এ প্রস্তাব সমর্থন করবেন।

সভায় সভাপতিত্ব করবেন অর্থমন্ত্রী শ্রী দুর্গাভাই দেশাই। উদয়াচলের এই মহাপ্রাণ, সত্যসেবী, আত্মত্যাগী নেতাও এই অতি-স্বাগত ঐক্য ও সমঝোতার জন্যে কম পরিশ্রম করেন নি।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল নতুন মন্ত্রীসভা গঠনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন মতবাদকে একত্রিত করবার ইচ্ছা পোষণ করেন। বর্তমান মন্ত্রীসভায় বয়স্কদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। তাঁর ইচ্ছা কংগ্রেসের নবীন নেতাদের মন্ত্রীসভায় স্থান দিয়ে ভবিষৎ নেতৃত্বের পথ সুগম করা। যাঁরা কংগ্রেসের মধ্যে সচরাচর 'বামপন্থী' ব'লে পরিচিত তাঁদেরও মন্ত্রীসভায় আসন দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর অভিপ্রায়। তার সঙ্গে গ্রামীণ নেতৃত্বকেও তিনি মন্ত্রীসভায় আনবার ইচ্ছা পোষণ করেন। এসব ব্যাপারে শ্রীদুবে ও শ্রীদেশাইর পরামর্শ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চলবেন। বর্তমানে তাঁরা একমত।

বর্তমান মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্যকে নতুন মন্ত্রীসভার নেওয়া সম্ভব নাও হ'তে পারে। তবে, তাঁদের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও জ্ঞানবুদ্ধি যাতে উদয়াচলের সেবায় ভবিষ্যতেও বিনিযুক্ত হয় শ্রী কোশল সে বিষয়ে সচেষ্ট হবেন।

আমাদের বিশেষ সংবাদদাতাকে মুখ্যমন্ত্রী রজনীর তৃতীয় প্রহরে এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, 'কংগ্রেসের একমাত্র আদর্শ

জনসেবা ; একমাত্র পথ, জনকল্যাণ। আমাদের মধ্যে মত বিরোধে কোনও ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের সংঘাত নেই। বিরোধ লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে নয়। পথ বা নীতি নিয়েও নয়। ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে। তাই তা অনায়াসে আমরা দূর কবতে পেরেছি। আমার সম্মানিত সহকর্মী শ্রী সুদর্শন দুবে ও শ্রী দুর্গাভাই দেশাই-এর সাহচর্যে আজ আমি পূর্বাপেক্ষা বলশালী।"

ডিকটেশন নেবার সময় সুভাষ চট্টোপাধায় যে বার বার বিস্মিত হচ্ছিল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তা লক্ষ্য করছিলেন।

ডিকটেশন শেষ হলে বললেন, "পাশের ঘরে গিয়ে এটা নিজের হাতে টাইপ ক'রে নিয়ে এসো। দু'কপি করবে। একটা আমার কাছে থাকবে। অন্যটা তোমার কাছে রাখবে। অন্য কেউ যেন না জানে, না দেখে। কার্বন পেপারটাও আমাকে দিয়ো।

রাত্রি বারোটা দশ মিনিটে আমাকে এই নম্বরে ফোন করবে। যদি আমি বলি, 'গো' এহেড' তাহলে এই রিপোর্ট কাল সকালে ছাপবে।"

সুভাষ চট্টোপাধ্যায় যখন টাইপ ক'রে রিপোর্ট নিয়ে উপস্থিত, তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভীষণ গম্ভীর। মুখের গৌরবর্ণে রক্তিম আভা। নাসিকায় ভয়ংকর নিষেধ।

রিপোর্টটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। দুটি শব্দ বদলালেন। দু' কপিতেই। আবার পড়লেন। এক কপি এবং কার্বন নিজের কাছে রাখলেন। অন্যটি দিলেন সুভাষকে।

"আচ্ছা। আজ এসো।"

"একটা প্রশ্ন ছিল।"

"প্রশ্ন তোমার অনেক আছে, এডিটর সাব, আমি জানি। কিন্তু সময় আমার একেবারে নেই।"

"আজ্ঞে, রাজনৈতিক প্রশ্ন নয়। ব্যক্তিগত প্রশ্ন।"

"শুনতেই হবে, মনে হচ্ছে। বলে ফেল।"

"আপনি পুনর্বার মুখ্যমন্ত্রী হবেন বুঝতে পারছি। এরপরে 'মর্নিং টাইমসে'র ম্যানেজিং এডিটর হবেন কি জগন্মোহন তিওয়ারী ?"

"একথা তোমায় কে বললে ?"

"নাম বলতে পারবো না। তবে, দায়িত্বশীল কেউ না বললে, আপনাকে আজ রাত্রে এ প্রশ্ন করতাম না।"

"তোমার আরও কিছু বলবার আছে ?"

"আছে। জগন্মোহন তিওয়ারীকে ম্যানেজিং এডিটর করবার আগে আমার পদত্যাগ পত্র অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করবেন।"

রক্তিম মুখে লাল চোখে থমথমে গাম্ভীর্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সুভাষ চট্টোপাধ্যায়ের চোখে তাকিয়ে রইলেন।

সামান্য হাসির বক্রস্রোত বুঝি বয়ে গেল মুখাবয়বে। বললেন, "মনে থাকবে। তুমি এখন এসো। বারটায় ফোন কোরো।"

রাত্রির আহার নিয়ে এল দীনদয়াল। গ্লাস ভর্তি দুধ, একটি বড় লাল আপেল, কিছু আঙ্গুর।

"মার গাড়ী ক'টায় ?"

"দশটা ক'মিনিটে, হুজুর।"

"তুই যাবি ষ্টেশনে ?"

"না, হুজুর।"

"কেন ?"

"আপনার যদি কিছু প্রয়োজন হয় :"

"আমার কিছু প্রয়োজন হবে না। তুই যাস সঙ্গে। জিনিষ-পত্র সব গুছিয়ে নিয়ে যাস। ষ্টেশন থেকে ফিরে এসে আমায় খবর দিস।"

"জী সরকার।"

সরোজিনী সহায় যখন এসে সামনে বসল, আহার সমাপ্তির সামান্য পরে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হঠাৎ মনে হল, একে যেন অনেক

আগে কখন কোথায় দেখেছেন। কোনও মুখই তিনি কখনও ভোলেন না; নাম মনে রাখবার ক্ষমতাও তার আশ্চর্য। অথচ মনে করতে পারলেন না কোথায় কবে সরোজিনীকে দেখেছেন। ছবি দেখেছেন, মনে পড়ল। কিন্তু ছবির বাইরেও দূর-স্মৃতি কেমন যেন জেগে উঠতে চাইল।

দেখে মনে হয় বছর ত্রিশেক বয়স। রং গৌর না হলেও, ফর্সা। মসৃণ চওড়া কপালে চিক্কণ ভ্রূ প্রায় কান পর্যন্ত প্রসারিত। চোখ দুটি ছোট, কিন্তু বুদ্ধিতে, লাস্যে ঝলমল। মুখের আদল অনেকটা গোল, কিন্তু চিবুকের দিকে চাপা। নাকটি ছোট হলেও সরু ও সুন্দর। কোকড়া চুলের অশান্ত কয়েকটি গোছ কপালে ঝুলে পড়েছে। ওষ্ঠাধর ধনুকের মত তির্যক। এমন ওষ্ঠাধর অপর আর একটি মেয়ের ছিল। বহুকাল আগের কথা। অন্য জীবনের কথা। তবু মনে আছে। সেই মেয়ের নাম ছিল কৌশল্যা। সরোজিনী মারাঠা তাঁতের শাড়ী পরেছে, পাতলা নীল। রং-মেলানো চৌলি। ছিপছিপে সুগঠিত দেহ। বসেছে ঋজু হ'য়ে।

বেশ ভাল লাগল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের।

"আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় নি;" কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "অথচ আপনার কাজকর্মের পরিচয় আমার আছে।"

"শুনেছি এ প্রদেশে এমন কোনও রাজনৈতিক কর্মী নেই যার নাড়ী-নক্ষত্র আপনার অজানা," মৃদু কণ্ঠে বলল সরোজিনী।

"নাড়ী-নক্ষত্র জানলেও চেহারা যে চিনিনা তাতো নিজেকে দিয়েই জানলেন।"

"সত্যিই আপনি সবাকার সব কিছু জানেন?"

"ও সব আমার মিত্রদের প্রচার। তবে সারাজীবন উদয়াচলে কাটল। বহু মানুষকে চিনি। উদয়াচলকে বেশ ভালো ভাবেই জানি।"

"আমি অনেকবার আপনার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছি।"

"আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হইনি বলে তো মনে পড়ছে না।"

"না। আমি শুনেছি, আপনি দেখা করবেন না।"

"কে বলেছে?"

"বেশ বড়ো-বড়ো মানুষরা।"

"কারণ কি?"

"কারণ, আমি বামপন্থী।"

"দেখুন, 'বাম' ব্যাপারটা একটু কম বুঝতে পারি, কিন্তু 'বামা'-দের একেবারে বুঝি না তা নয়।"

"আপনি কি সত্যি আমাদের বিরুদ্ধে?"

"আপনারা কারা?"

"কংগ্রেসের বামপন্থী দল।"

"এতো সোনার পাথর বাটির মত শোনাচ্ছে।"

"কেন?"

"সারা কংগ্রেসই তো বামপন্থী। সমাজতন্ত্র আমাদের লক্ষ্য। সর্বোদয় আমাদের কাম্য।"

"লক্ষ্য যাই হোক, কাজে আমরা সমাজতন্ত্র না গড়ে ধনতন্ত্র গড়ছি"

"তাই নাকি?"

"আপনি অস্বীকার করেন?"

"নিশ্চয়। স্বীকার করা মানে রাজনৈতিক আত্মহত্যা।"

সরোজিনী হেসে ফেলল। "তা আপনি করতে রাজী নন।"

"একেবারে নই। মরতে তৈরী নই এখনও। না নিজের হাতে, না অন্যের।"

"আপনি স্বীকার না করলেও আমাদের অভিযোগ সত্যি।"

"কোন্ অভিযোগ? আমি সমাজতন্ত্রের বদলে ধনতন্ত্র গড়ছি?"

"হ্যাঁ।"

"তবু তো আমি কিছু গড়ছি। আপনারা তো কিছুই গড়ছেন না।"

"সুযোগ পাচ্ছি কোথায়?"

"কোন্ সুযোগ চান? আমি আপনাকে একহাজার একর জমি দিতে রাজী আছে। ট্রাকটর ইত্যাদি কেনবার টাকাও। যৌথ কৃষি তৈরী ক'রে দেখান না দেশবাসীকে? সর্ত শুধু একটি। দশ বছরে যদি আশানুরূপ ফল দেখাতে না পারেন তা হলে জনসভায় দাঁড়িয়ে বলতে হবে আপনাকে যে আপনার পথ ভুল।"

"এভাবে সমাজতন্ত্র তৈরী হ'তে পারে না। ধনতন্ত্রের সমুদ্রে সমাজতন্ত্রের দু-চারটি লোকদেখানো দ্বীপ। এ সম্ভব নয়।"

"তা হলে?"

"বরং সমাজতান্ত্রিক সমুদ্রে দু'একটা ধনতান্ত্রিক দ্বীপ থাকতে দেওয়া যেতে পারে।"

"সুতরাং আপনি আগে সমুদ্র তৈরী করতে চান।"

"অর্থাৎ সরকার হাতে পাওয়া দরকার।"

"তার মানে তো বিপ্লব!"

"না। আমরা বিপ্লবে বিশ্বাসী নই। ওটা কম্যুনিজম।"

"মুস্কিল। আমি ঠিক বুঝিনে আপনাদের কথাবার্তা। আসলে উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা পাইনি ছোটবেলা। তবে আমি খেলতে রাজী আছি।"

"তার মানে?"

"আপনাদের সুযোগ দিতে। ক'জন নিয়ে আপনাদের দল?"

"দশজন। অশোক আপ্তেকে জানেন?"

"নিশ্চয়। বুদ্ধি ভয়ানক কম।"

সরোজিনী হেসে ফেলল, "কিন্তু লোক ভালো।"

"বোকারা ভালোই হয়। আপনারা মন্ত্রীসভায় স্থান চান, এই তো?"

"পেলে ভালো হয়।"

"আসুন না। আমি তো চাই নতুন রক্ত, নতুন চিন্তাধারা।"

"সে কি? শুনে আসছি আপনি এসব একেবারে চান না।"

"আমার মিত্রগণ অমন অনেক কিছু বলেন। যদি আমি মন্ত্রীসভা গঠন করি আপনাদের মধ্যে থেকে দুজনকে নিতে রাজী আছি। সর্ত একটা।"

"কি?"

"তার মধ্যে একজন আপনি।"

"আমি?"

"হ্যাঁ, আপনি। আপনি বিধানসভার সদস্য নন। আপনাকে নির্বাচিত ক'রে নিতে কষ্ট হবে না। তিনটে আসন খালি রয়েছে। আপনার কাছে আমি সমাজতন্ত্র শিখব।"

"আপনাকে শেখাতে পারলে আমার সৌভাগ্য।"

"তা হলে আপনি আমার ডেপুটি মিনিষ্টার হবেন। উদয়াচলের পাঠশালা যোজনা কার্যকরী করবার ভার থাকবে আপনার।"

"সত্যি বলছেন?"

"হ্যাঁ। হরিশংকর ত্রিপাঠী যদি মুখ্যমন্ত্রী হন, আপনার স্থান হবে না মন্ত্রীসভায়।"

"জান।"

"আমি আপনার স্থান করবো। কিন্তু হরিশংকর ত্রিপাঠীর স্থান হবে না।"

"সুদর্শন দুবেজী?"

"তিনি, আশা করছি, নতুন মন্ত্রীসভায় যোগ দেবেন।"

"আমাদের দলের অন্যজনকে কি পদে রাখবেন?"

"পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী।"

"কাকে নেবেন?"

"আপনি বলুন।"

"অশোক আপ্তে।"

"না।"

"বিপিন ঝা।"

"তাও নয়।"

"অর্থাৎ আমার মনোনীত কাউকে নয়।"

"ঠিক বলেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম করবো আমি। কিন্তু সে হবে আপনার মনোনীত। সুদর্শন দুবে ও দুর্গাভাই দেশাই জানবেন, তার নাম করেছেন আপনি।"

সরোজিনী চুপ ক'রে রইল।

"রাজী কিনা বলুন? তবে, হ্যাঁ। আরেকটা কথা জেনে রাখুন। আপনাব দলেব সমর্থন ছাড়াও আমি পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হবো।"

"রাজী। নাম বলুন।"

"সূর্যপ্রসাদ কোশল।"

"সে আমাদের দলে নয়।"

"আপনি জানেন না। চারদিন আগে সে আপনাদের দলে যোগ দিয়েছে।"

সরোজিনী ঠোঁট কামড়ে বলল, "বেশ, তাই হবে।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন টের পেলেন মনে হালকা আনন্দ সঞ্চারিত হচ্ছে। দেহের ক্লান্তি দূর হ'য়ে যাচ্ছে, ইচ্ছে হচ্ছে এসব রাজনীতিচর্চা স্থগিত রেখে কোমল কিছুতে মনোনিবেশ করতে। সুন্দর সুন্দর কবিতা মনে পড়ছে। রসঘন কবিতা। মন কেমন রসিক হ'য়ে উঠছে। হাল্‌কা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে হো-হো ক'রে হেসে উঠতে। বললেন, "রাজনীতি তো হল। এবার আসুন অন্য কথা বলি। সকাল থেকে রাজনীতি ক'রে ক'রে দারুব্রহ্ম হ'য়ে গেছি।"

"দারুব্রহ্ম কি জিনিস?"

"এই তো মুস্কিল আপনাদের নিয়ে। আপনারা বিদেশে

লেখাপড়া ক'রে দেশটাকে আর চিনতে পারেন না। রোমের সিষ্টিন চ্যাপেলের মূর্তিগুলি আপনাদের চেনা, অথচ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দারুব্রহ্ম একেবারে অচেনা।"

"দারুব্রহ্ম মানে কি?"

"বিষ্ণু শুকিয়ে কাঠ।"

সরোজিনী হেসে প্রশ্ন করল, "কেন? কিসের দুঃখে?"

"দুঃখের কি সীমা আছে? জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নামে এক পণ্ডিত প্রবর ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'একা ভাযা প্রকৃতি মুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া',—বিষ্ণুর এক স্ত্রী মুখরা, অন্য স্ত্রী চপলা; একমাত্র পুত্র দুর্ণিবার কামাসক্ত; বাহন একটা পাখী; জলের উপর সাপের বিছানা সম্বল; এ হেন সংসারের কথা ভে'ব শুকিয়ে কাঠ না হ'য়ে উপায় কি? 'স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারীঃ' আমরা সবাই স্বগৃহচরিত্রের কথা স্মরণ ক'রে নানারূপ মূর্তি ধারণ করি।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

"আপনার কথা সব বুঝলাম না। আপনি বুঝি খুব সংস্কৃত জানেন?"

"আপনারা যেমন ইংরেজী জানেন তেমনি।"

"শুনেছি, আপনি মস্ত কবি।"

"ভুল শুনেছেন।"

"আপনার তো একখানা মহাকাব্য আছে।"

"তা আছে।"

"কি নিয়ে লেখা?"

"কৃষ্ণলীলা।"

"আপনার ডেপুটি হ'লে মাঝে মাঝে মহাকাব্য শোনাবেন তো?"

"তা হয়তো শোনাতে পারি। কাব্য শোনাবার লোভ কবিদের ভয়ানক।"

"শুধু শোনাবেন না। বুঝিয়ে দেবেন।"

"কৃষ্ণলীলা বুঝিয়ে দিতে হয় না। সবাই এমনিতেই বোঝে :

'ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয় মতিযত্নম্।' "

"বাঃ। শুনতে তো বড় ভালো লাগছে। সংস্কৃত কবিতা এত সুন্দর।"

"এর চেয়েও অনেক সুন্দর।

'বিকসিত সরসিজ ললিত মুখেন
স্ফুটতি নসা মনসিজবিশিখেন ॥
অমৃত মধুর মৃদুতরবচনেন
জ্বলতি ন সা মলয়জপবনেন ॥' "

"অর্থ বুঝলাম না। তবু শব্দের ঝংকার মধুর লাগছে। আপনার কণ্ঠে অপূর্ব শোনাচ্ছে।"

"রসগ্রহণ এতো সহজ নয়। আগে আসুন আমার ডেপুটি হ'য়ে। সমাজতন্ত্রটা ভালো ক'রে শিখিয়ে নিন; তখন কবিতাব অর্থ বুঝতে পারবেন।"

"আপনাকে হঠাৎ দেখে ভয় হয়। মনেই হয় না আপনি এত রসিক মানুষ।"

"কালিদাসেব নাম শুনেছেন?"

"শুনেছি।"

"প্রবৃদ্ধ-তাপো দিবসোঽতি মাত্র মত্যর্থ মেব ক্ষণদা চ তন্বি।
উভৌ বিরোধ-ক্রিয়য়া বিভিন্নৌ জায়াপতি সানুশয়া বিবাস্তাম।"

"অর্থ বলে দিন।"

"পরিণত গ্রীষ্ম দিবসের বর্ণনা। অর্থ নেই। রূপ আছে। মাধুর্য আছে। মোহ আর জাদু আছে।"

"বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে দিন।"

দুষ্মন্ত আংটি ফেরৎ পেয়েছেন, অথচ শকুন্তলার দেখা নেই।

'সপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রম নু

ক্লিষ্টং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যম্।

অসন্নিহত্ত্যৈ তদতীত মেতে

মনোরথানামতট প্রপাতাঃ॥'"

"আপনি কাব্যরসে ডুবে থেকে রাজত্ব চালান কি করে?"

"অ্যাঁ? কি ক'রে চালাই? রাজত্ব চালাবারও রস আছে। শীঘ্রই তার আস্বাদ পাবেন। আচ্ছা। তাহলে ঐ কথা রইল। দুদিন পরেই আমরা সহকর্মী।"

"আমি আজ তাহলে আসি।"

"চলুন। আপনাকে বাইরে এগিয়ে দি। কটা বাজলো?"

"দশটা।"

"চলুন। একট দেখে আসি। এক্ষুণি চলে যাবে কি না।"

"কে? কার কথা বলছেন?"

"অ্যাঁ? না, কেউ নয়। মেঘ। মেঘ চলে যাবে, পূর্ব মেঘঃ

'তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবাণীর শাখং

হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম।

প্রস্থানংতে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি

জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতু সমর্থঃ॥'"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে কষ্ট হল না। কিন্তু বাইরে এসে একটু দুর্বল বোধ করলেন। দীনদয়াল পেছনে ছিল। তার কাঁধে হাত রাখলেন।

"বৃদ্ধ হয়েছি। রাত্রিতে চলতে একটু সাহায্য পেলে ভালো হয়।"

"বৃদ্ধ হননি একটুও আপনি। চশমা নিলেই রাত্রে চলতে পারবেন।"

"তাই নিতে হবে। সমাজতন্ত্র দেখতে হলে চশমা লাগবেই।"

গাড়ীতে বসে সরোজিনী বলল, "দুবেজীকে কিছু বলব?"

'অ্যাঁ? ও। সুদর্শনকে?"

"কিছু বলব?"

"বলবেন, রাত বারোটা পর্যন্ত আমি দপ্তর ঘরেই থাকব। মধ্য রাত্রি পর্যন্ত।"

"আচ্ছা।"

"নমস্তে।"

"নমস্তে। আপনার ডেপুটি হবার পর কিন্তু আর আমায় 'আপনি' বলবেন না। 'তুমি' বলবেন।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়। নমস্তে।"

গাড়ী স্টার্ট নিয়ে ফাটক দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেখলেন খাসমহলের সামনে বাড়ীর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

বললেন, "দীনদয়াল, আমার সঙ্গে চল।"

দীনদয়ালকে আর ধরতে হল না। নিজেই এগিয়ে গেলেন। দীনদয়াল রইল পাশে।

গাড়ীতে মাল পত্র তোলা হয়েছে। চন্দ্রপ্রসাদ ভেতরে বসেছিল। বেরিয়ে এল।

"আপনি এলেন কেন, পিতাজা?"

"এমনি চলে এলাম। তোমার মা কই?"

"পূজার ঘরে। দেরী হ'য়ে গেছে।"

"পূজা দিয়ে আর লাভ নেই, রাজকুমার। হিসাব-নিকাশ পুরো হ'য়ে গেল।"

"পিতাজী, আপনি ঘরে যান।"

"তোমার মা আসুন।"

পদ্মাদেবী পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে পুত্রবধূ রাধা।

গাড়ীতে বসতে যাবেন, দেখলেন সামনে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

"তোমাকে ষ্টেশনে তুলে দিতে যেতে ইচ্ছে করছে। অথচ উপায় নেই। আমিতো তোমার স্বামী নই। আমি মুখ্যমন্ত্রী।"

"তুমি আবার শুরু করেছ?" বেদনায় তীক্ষ্ণ পদ্মাদেবীর কণ্ঠস্বর।

"আজ বিশেষ দিন। অংক একেবারে মিলে গেল। ঠিক যা ভেবেছিলাম, ঠিক যা আশা করেছিলাম, তাই।"

"তার মানে, তুমি জিতেছ।"

"অর্থাৎ, কাল আমি জিতবো।"

"বিশ্বনাথ তোমাকে রক্ষা করুন।"

পদ্মাদেবী গাড়ীতে গিয়ে বসলেন।

চন্দ্রপ্রসাদ পিতাকে প্রণাম ক'রে ড্রাইভারের পাশে বসল।

গাড়ী স্টার্ট দিল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "সাবধানে থেকো। তাড়াতাড়ি চলে এসো?"

দেখতে পেলেন, দীনদয়াল পাশেই দাঁড়িয়ে।

"তুই গেলিনে সঙ্গে?"

"মা বললেন, আপনার সঙ্গে থাকতে।"

"তবে তাই থাক। চল, ঘরে চল। দাঁড়া, তোর কাঁধে একটু হাত রাখি। চল।"

তিওয়ারী পানীয় নিয়ে এল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন,"ব্যস। আর নয়।"

তিওয়ারী চ'লে যাবার জন্যে পা বাড়াতে,"যেওনা। বোসো।"

অদূরে বসল তিওয়ারী, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাকিয়ে দেখলেন তার কালো চামড়া শুকিয়ে ঝুলে পড়েছে গলায়, গালে, কানের পাশে। হলদে চোখে বোবা দৃষ্টি। কপালে গভীর রেখায় মাটি জমেছে। চিকচিক করছে বিদ্যুতের বাতিতে।

"তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

হলদে বোবা চোখ মেঝেতে নিবদ্ধ।

"তুমি জানতে আজকের সন্ধ্যা বেলায় জনসভায় তুর্গাপ্রসাদের বক্তৃতা দেবার কথা ছিল।"

"জী।"

"জানতে, তাকে জখম করবার জন্যে হরিশংকর লোক নিযুক্ত করেছিল?"

"না।"

"তুমি জানতে। না জানলেও, তোমার জানা উচিত ছিল।"

তিওয়ারীর নীরব দৃষ্টি আবার মেঝেতে নিবদ্ধ।

"তোমার অন্য সব কাজ ভাল হয়েছে। খুব পরিশ্রম করেছে: তুমি।"

"আপনার সেবায়—"

"তুমি জীবন দিয়েছো। তোমাকে আমিও কম দি' নি।"

"আপনার দয়া।"

"তা বলে ভেবো না তুমি যা চাইবে তাই পাবে।"

"আমি এমন কিছু চাইনে—"

"চাও। তুমি মর্নিং টাইম্‌স্-এর মালিক হ'তে চাও।"

"আপনি এক সময়ে বলেছিলেন।"

"তখন ব্যাপার অন্য রকম ছিল। ওটা সম্ভব নয়। ও তুমি ভুলে যাও।"

"জী।"

"কি যেন বলেছিলে তুমি? মনে পড়ছে না।"

"আপনার চাকর হ'য়ে জীবন কেটে গেল। নিজের সম্মানে—"

"ও, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। তুমি ভদ্রসমাজে নিজের দাবীতে প্রতিষ্ঠা চাও। তাই না?"

"আপনার দয়া হলে—"

"তোমার বাপ কি কাজ করত?"

তিওয়ারীর দৃষ্টি পুনরায় মেঝেয় নিবদ্ধ।

"নাপিত ছিল সে। আজ থেকে পনের বছর আগেকার কথা বারাণসীতে তুমি আমার সঙ্গ নিয়েছিলে।"

"জী।"

"লোকে জানে তুমি কায়স্থ।"

"জী।"

"কখানা গ্রামেব তুমি মালিক?"

"তিনখানি।"

"পড়াশোনা কতদূর করেছিলে?"

"ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম।"

"আরও দুখানা গ্রাম তুমি পাবে।"

"আপনার কৃপা।"

"প্রেসের কথা ভুলে যাও।"

"জী।"

"তুমি ভদ্রলোক বইকি। তুমি আমার পার্সোনাল সেক্রেটারী। সবাই তোমাকে কত খাতির করে। পাঁচশ' পঁচাত্তর টাকা তোমার মাইনে। সরকারী বাড়ী পেয়েছো। টেলিফোন পেয়েছো। আমার গাড়ীতে চলাফেরা করো। তোমার মত ভদ্রলোক উদয়াচলে ক'জন?"

"আপনার অগাধ দয়া। কিন্তু আপনার অবর্তমানে এসব কিছুই থাকবে না।"

"তুমি কম অর্থ সঞ্চয় করো নি। তোমার কি কি গোপন ব্যবসা আছে তাও আমি জানি। কিছুদিন আগে বেনামীতে তুমি দিশী মদের দোকান পেয়েছো। ঠিক কি না?"

"জী।"

"এরকম কাজ আর করতে যেওনা।"

"জী।"

"আচ্ছা, তুমি এবার যাও। আমি বারোটা দশ মিনিটে শুতে যাবো।"

একবার তাকালেন কৃষ্ণদ্বৈপান তিওয়ারীর দিকে। তিওয়ারীর চোখে চোখ রেখে বললেন ঃ

“এ বাড়ীতেই শোবো।”

“জী।”

তিওয়ারী প্রস্থান করলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেওয়ালের পাশে সাবধানে সংরক্ষিত অত্যন্ত জরুরী এবং একান্ত গোপনীয় ফাইলগুলি থেকে একখানা টেনে বার করলেন। তখনও তৃষ্ণা প্রবল, কিন্তু মনস্থির করেছেন, পানীয় আর নয়। মধ্যরাত্রির এখনও ঘণ্টাধিক বাকী আজকার নাটকের শেষ দৃশ্য এখনও অনভিনীত।

ফাইলের ওপরে লাল কালিতে লেখা ঃ জগন্মোহন তিওয়ারী।

ফাইল খুলে কয়েকখানা কাগজে পুনরায় চোখ বুলালেন কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন। এসব তাঁর আগেই পড়া এবং জানা; তথাপি কারুর সম্বন্ধে সন্দেহ হলে বা নতুন ক'রে ভাবার প্রয়োজন পড়লে তার 'ইতিহাস'টা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আর একবার দেখে নেন।

চোখ বুলিয়ে পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। ফাইল বন্ধ ক'রে যেখানে ছিল সেখানে সরিয়ে রাখলেন।

জানালা দিয়ে নিস্তব্ধ রজনীর শান্ত আকাশ অসংখ্য তারার জ্যোতিতে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে। দেওয়ালে একটা টিকটিকি ঝট ক'রে মাকড়সাকে ধরল আর আনন্দে ঝাপটাতে লাগল। অনেক দূর থেকে কুকুরের ডাক ভেসে এল, আর কাছাকাছি কোথাও থেকে মোরগের কণ্ঠ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মনে পড়ল সরোজিনী সহায় অতীতকালের কৌশল্যার মত অনেকটা দেখতে। কৌতুকবোধ করলেন। আশ্চর্য মানুষের জীবন। কোনও কিছুরই সমাপ্তি নেই। আজ যা আপাত অনুভূতিতে ফুরোয়, অন্যদিন অন্যরূপে, অন্য আসরে আবার তার দেখা মেলে।

সুর ক'রে আবৃত্তি করলেন;

'আঁখ ন মুহু, কান ন রুধুঁ. কায়াকষ্ট্ ন ধারাঁ।
খুলে নয়ন মৈঁ হঁস দেখুঁ সুন্দর রূপ নেহারুঁ॥'

হঠাৎ মনে পড়ল, দুর্গাভাই দেশাইর বাড়ী ফোন ক'রে খবর নিতে হবে।

টেলিফোন ধবল বসন্ত।

"আমি কে. ডি. কোশল কথা বলছি।"

"আমি বসন্ত, কাক্কাজী। নমস্তে।"

"বেটি, এখনও ঘুমোও নি।"

"না, কাক্কাজী। রাত তো বেশি হয় নি।"

"পিতাজী কেমন আছেন ?"

"ভালো।"

"ডাঃ বলিরাম দেখে গেছেন তো ?"

"জী হ্যাঁ।"

"চন্দ্রপ্রসাদ সঙ্গে ছিল ?"

"হ্যাঁ জী।"

"বেশ। কি বললেন ডাক্তার ?"

"বেশি পরিশ্রম ও দুর্ভাবনার জন্যে ক্লান্তি। বিশ্রাম করতে বললেন কয়েকদিন।"

"দুর্গা ভাইজী ঘুমুচ্ছেন ?"

"বোধহয় না। শুয়ে পড়েছেন। টেলিফোন দেব পিতাজীকে ?"

"না, না। তবে কাল সকালে বোলো বেটি যে আমি খবর করেছিলাম।"

"বলবো।"

"তোমারা সব ভালো তো, মা ?"

"হ্যাঁ, কাক্কাজী।"

"তোমার মা আর ভাই-এরা সব ভালো ?"

"জী হ্যাঁ।"

"একবার এসো আমার কাছে। তোমাকে অনেকদিন দেখিনি! শুনেছি, অনেক বড় হয়ে গেছ, আর বহুৎ খুবসুরৎ হয়েছ?"

"কে বলল আপনাকে?"

"চন্দ্রপ্রসাদ।"

"ধেৎ।"

হাসতে হাসতে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। জীবনটা মন্দ নয়। বেশ। অত বিরাট উন্মুক্ত আকাশের মতো যতো-দূরে-চাও-চলে-যাও নয়; তবু কত বিচিত্র ঘটনায়, অনুভূতিতে ব্যথা-আনন্দে, ব্যর্থতা-সার্থকতায়, জয়-পরাজয়ে পরিপূর্ণ। কত মানুষের মিছিল একটি মানুষের জীবনে; কতো কর্মের আহ্বান; কতো নতুন দায়িত্ব, কতো অভিনব সংগ্রাম। কি দুরন্ত তৃষ্ণা, কি ভীষণ ক্ষুধা: কতো বিচিত্র লোভ, কি উদার অপচয়! জীবন, বিধাতার মতো, কাননে কাননে শ্যামলে শ্যামল; পর্বতে পর্বতে উন্নত; নদীতে নদীতে ক্ষিপ্র-চঞ্চল; সাগরে সাগরে কি মহা-গম্ভীর। বিপুল হর্ষে বারবার সে কোন অমৃত স্পর্শে সীমা হারিয়ে কি আবেগে প্রবাহিত! আবার, অমাবস্যা রাত্রির তিমির ঘন আকাশের ন্যায় কখনও সে মহা মৌন।

বেঁচে থাকতে বড় ভাল লাগল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের। ভাল লাগল জীবন-জ্বালা। অনির্বাণ জ্বালা। মৃত্যুও যার কাছে পরাস্ত।

আকাশের পানে তাকিয়ে বলে চললেন:

'কুসুম শয়নং ন প্রত্যগ্রং ন চন্দ্র মরীচয়া
ন চ মলয়জং সর্বাঙ্গীণং ন বা মণিযষ্টয়ঃ।
মনসিজরুজং সা বা দিব্যা মমালমপোহিতুং
রহসি লঘয়ে দারব্ধা বা তদাশ্রয়িনী কথা॥'

মনে পড়ল কৃষ্ণলীলাকাহানী রচনার সময় কালিদাসের এ শ্লোকটি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গ্রহণ করেছিলেন। রাজার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণও, তাঁর কাব্যে বলছেন, আমার জ্বালা জুড়োয় না কুসুমশয্যা, বিমল

জ্যোৎস্না, সদ্যঃ মলয়জ চন্দন লেপন অথবা মণি-মুক্তার হার। এরা আমার দেহ-মনের জ্বালা বাড়ায়। আমার জ্বালা কমাতে চাও তবে নিয়ে এসো—সেই অনুপম ললনা রাধা; অথবা আমার কাছে বসে রাধার কথা বলো।

মনে পড়ল কৌশল্যা 'গীতগোবিন্দ' শুনতে ভালো বাসত। তার চলন ভঙ্গী দেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রায়ই একটি শ্লোক আবৃত্তি করতেন। শুনে খুশি হত কৌশল্যা:

'ত্বদভি সরণরভসেণ বলন্তী
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী'

—দেখলাম, অন্তরের আকুল আগ্রহে তিনি অভিসারের জন্যে পা বাড়ালেন; কিন্তু চলতে পারলেন না; কয়েক পা যেতে না যেতেই অবশ হ'য়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

কৌশল্যা হেসে লুটিয়ে পড়ত। তার শাড়ীর আচল—সে বহু, বহু বছর আগেকার কথা—তবু কেমন হারিয়ে যায়নি,—সে সময় কৌশল্যার গা থেকে শাড়ীর আচল খসে পড়ত—

টেলিফোন বাজল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জ্বলন্ত হাসির সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন টেলিফোনের দিকে।

দু'বার বাজবার পর রিসীভর তুললেন।

"কোশল।"

"নমস্তে কোশলজী।"

"আ, দুবেজী! নমস্তে, নমস্তে। এত রাত্রে কি মনে ক'রে?"

"সরোজিনীর কাছে আপনার আহ্বান শুনতে পেলাম।"

"আর একটু কান পেতে শুনুন, দুবেজী। কোথায় সোনার নূপুর বাজে, বুঝি আমার হিয়ার মাঝে। শুনতে পাবেন আহ্বান আসছে আপনারই অন্তরাত্মা থেকে।"

হেসে ফেললেন সুদর্শন দুবে। "আপনি রসিক মানুষ।"

"বটবৃক্ষ, ত্রিবেদী। মাধব দেশপাণ্ডে আমায় বলেন বটবৃক্ষ। ইট-চূণ-পাথর থেকেও রস টেনে বার করি। আমি বলি, তা হবে। কিন্তু বট তো নিষ্ফল গাছ। তার ছায়ায় আর কিছুই জন্মায় না। আমার ছায়ায় কি উদয়াচল তেমনি হ'য়ে গেল?"

"কোশলজী আজ প্রভাতে আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলাম।"

"সেজন্যে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। না, না, মিথ্যা বিনয় নয়। আপনার সুদর্শন মুখ প্রভাতে দর্শন করেছি বলে দিনটা একেবারে খারাপ গেল না।"

"সকাল থেকে এই মধ্যরাত্রির মধ্যে অবস্থার বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। মানতে বাধ্য হচ্ছি।"

"ত্রিবেদী, যদি তাই মানতে পারছেন, আপনার মধ্যে মহানুভবতা আছে। সব কথাতো টেলিফোনে হ'তে পারে না। কাল সকালে আমি আপনার বাড়ী হাজির হবো, যদি আপনার আপত্তি না থাকে।"

"সে তো পরম সৌভাগ্য কোশলজী। কিন্তু কাল সকালে আপনার সময় হবে কি? শুনেছি, আপনি সকালে কোন গ্রামে যাচ্ছেন, ফিরবেন অপরাহ্ণে।"

"ঠিক।"

"আপনি কি খুব ক্লান্ত?"

"না। একটুও না।"

"আমি এখুনই আপনার কাছে আসতে পারি কি?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। যদি আপনার কষ্ট না হয়।"

"তাহলে আসছি। পনের মিনিটে এসে যাবো।"

"একাই আসছেন তো ত্রিবেদী?"

"হ্যাঁ। একাই আসছি। আপনিও একা আছেন আশা করি।"

"একা। একেবারে একা। আসুন।"

টেলিফোন নামিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দরজা দিয়ে শয়নকক্ষের দিকে তাকালেন।

তাঁর শয্যা তৈরী হচ্ছে।

যে তৈরী করছে তাকে দেখতে পেলেন।

"তিওয়ারী।"

তিওয়ারী যেন দেওয়াল ভেদ ক'রে এসে সামনে দাঁড়াল।

"সুদর্শন তুবে আসছেন। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে।"

বলে, শয়নঘরের দিকে তাকালেন।

তিওয়ারী আদেশ বুঝল। বলল, "ঠিক আছে।"

"তুবেজী সরবৎ খেতে ভালোবাসেন। তৈরী রেখো।"

"জে আজ্ঞে।"

পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট মথুরা প্রসাদকে ডেকে পাঠালেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

মিনিট তিনেক ডিকটেশন দিলেন।

"এইটে টাইপ ক'রে নিয়ে এসো পাঁচ মিনিটের মধ্যে।"

মথুরাপ্রসাদ টাইপ-করা কাগজ নিয়ে এলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মনোনিবেশের সঙ্গে পড়লেন। "বেশ হয়েছে। তুমি এবার বাড়ী যাও। কুসুমকে আর আধঘণ্টা থাকতে বোলো।"

কুসুম খান দ্বিতীয় পি এ.। ঘড়ির দিকে তাকালেন।

সুদর্শন তুবের আসবার সময় হল।

একবার ভাবলেন, নীচে গিয়ে সুদর্শন তুবেকে স্বাগত ক'রে ওপরে নিয়ে আসবেন। কিন্তু, নিরস্ত হলেন। এতরাত্রে সিঁড়ি বেয়ে বার বার ওঠা নামা করতে ইচ্ছে হল না। তাছাড়া, সুদর্শন তুবে এখন আসছে প্রার্থী হ'য়ে, মনে মনে বললেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। সকালে এসেছিল প্রচণ্ড মুখর দাবী নিয়ে। ভেবেছিল ভাগ্যের স্রোত তার দিকে বইছে। এখন আসছে পরাজিত উচ্চাশার ভগ্নাবশেষ নিয়ে। আসুক সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে একা, জগন্মোহন তিওয়ারীর সঙ্গে।

গাড়ীর শব্দ শুনতে পেলেন। ফাটকে এসে গাড়ী দাঁড়াল। ফাটক খুলল প্রহরী। ভেতরে ঢুকে গাড়ী এসে থামল দপ্তর-বাড়ীর সামনে।

শুনতে পেলেন তিওয়ারী স্বাগত করছে সুদর্শন দুবেকে।

"কোশলজী কোথায়?"

"ওপরে আছেন। আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আসুন।"

পদধ্বনি একেবারে এগিয়ে এলে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন গাত্রোত্থান করলেন। দরজা পর্যন্ত এসে সুদর্শন দুবেকে আলিঙ্গন করলেন।

"আসুন, আসুন, দুবেজী। আপনাকে দেখে বড় আনন্দ হচ্চে।

সংভু সময় তেহি রামহি দেখা।
উপজা হিঁয় অতি হরষু বিশেষা॥
ভরি লোচন ছবিসিন্ধু নিহারী।
কুসময় জানি ন কীহ্নি চিহ্নারী॥"

সুদর্শন অপ্রস্তুত হলেন। ঠিক বুঝলেন না কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তামাসা করছেন, না ব্যঙ্গ, না নিছক জয়োল্লাস।

বললেন, "সরোজিনীও বলছিল, আজ আপনি কবি হ'য়ে রয়েছেন। মুখ দিয়ে অনর্গল কাব্যসুধা নির্গত হচ্চে। কাব্য মানেই তো অতিশয়োক্তি। স্ত্রীলোকের মুখকে চন্দ্রের চেয়েও সুন্দর ঘোষণা করা। তাই আমাকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র দর্শনের আনন্দ আপনার অন্তরে না হলেও মুখে-মুখে হওয়া বিচিত্র নয়, কোশলজী।"

"জীবনে কোনও কিছুই বিচিত্র নয়।" কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আরাম ক'রে সুদর্শনকে বসালেন, নিজে বসলেন। "আপনাকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র দর্শনের আনন্দ কেন হবে না, বলুন? প্রথমত, শ্রীরামচন্দ্র সর্বত্র সবভূতে বিরাজমান। আপনাতে আমাতে এমনকি হরিশংকর ত্রিপাঠীতেও। দ্বিতীয়ত, তুলসীদাসের ক'টি লাইন মনে পড়ে গেল আপনাকে দেখে—অতএব আপনি পুণ্যবান লোক।"

"পুণ্যবান আপনিও কম নন। পুণ্যবান আমরা সবাই।"

"আপনি পুণ্যবান লোক সুদর্শনজী। তুলসীদাস আরও বলেছেন:

কাম ক্রোধ লোভাদি মদ প্রবল মোহকৈ ভারি।
তিন্থু মহঁ অতি দারুণ ছুখদ মায়ারূপী নারী ॥”

সুদর্শন দুবের কান জ্বালা ক'রে উঠল।

বললেন, “মধ্য রাত্রিতে ধর্মালোচনা চলবে না, কোশলজী। আপনি জানেন, আমি শাস্ত্রপাঠ খুব কম করেছি। আমাকে যা বলতে চান, আপনার সোজা ভাষায় বলুন, অন্যের রচিত কবিতায় বলবেন না। সবটা আমার মাথায় ঢোকে না।”

“ঠিক বলেছেন। এখন রজনীর দ্বিতীয় প্রহর। এখন কারা জেগে থাকে জানেন ?”

“কারা ?”

“আমরা।

‘পহেলা প্রহরমে সবকৈ জাগে
দুসরা প্রহরমে ভোগী।
তিসরা প্রহরমে তস্কর জাগে
চৌথা প্রহরমে যোগী।’

একটু সরবৎ পান করুন, দুবেজী। কাজের কথাতো হবেই। একটু সরবৎ পান করুন।”

দীনদয়াল পাথরের গ্লাসে সরবৎ নিয়ে এসেছিল। সুদর্শন ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দুজনেই হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলেন।

সুদর্শন দুবে চুমুক দিয়ে বলে উঠলেন, “বাঃ, বেশ তো।”

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিঞ্চিৎ পান ক'রে বললেন, “ভালো লাগছে তো, দুবেজী ? নিরানন্দে কোনও বড় কাজ হয় না। সন্তান জন্ম দেবার সময় মার যে প্রসব-যন্ত্রণা তার মধ্যেও আনন্দে থাকে। আপনি আমি উদয়াচলের কোটি কোটি মানুষের জীবন-গঠনের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। দিল যদি আনন্দিত না থাকে, এত লোকের ভালো করবেন কি ক'রে ? নিন, পান করুন।”

সরবৎ-এর গ্লাস অর্ধেক শূন্য হ'য়ে গেল কয়েক মিনিটে। সুদর্শন

দুবের মন হালকা হ'য়ে উঠল, সন্ত্রস্ত ভাব কেটে গেল। নতুন বিস্ময়ে তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দেখতে লাগলেন। সকাল বেলার কথা মনে পড়ল। পূজার ঘর থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের গৌরবর্ণ দেহে কেমন অতিরিক্ত দীপ্তি ছিল। আর এখন, সারাদিনের কর্মশেষে মধ্যরাত্রিতে, আসন্ন বিজয়ের নিশ্চিন্ত প্রশান্তিতে, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন কেমন কোমল, রসাপ্লুত হ'য়ে উঠেছেন। সুদর্শন দুবে ভেবেছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হ'য়ে উঠবেন তীক্ষ্ণ অহঙ্কারী ; ক্ষুরধার হবে তাঁর বাক্য, জর্জরিত ক'রে তুলবেন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ব্যঙ্গে, কৌতুকে, পরিহাসে। কিন্তু এ একেবারে অন্য মানুষ!

সুদর্শন দুবে সরবৎ পান করতে করতে বলে উঠলেন, "বাঃ বাঃ।"

"আনন্দে হচ্চে তো, দুবেজী ?" উৎসাহিত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলতে লাগলেন, "বেঁচে যে আছেন, এটাই আনন্দ। বেঁচে আছেন একা নয়, আলাদা নয়, ঐ তারা-ভরা আকাশ, ঐ অপূর্ব-সুন্দর বহুবর্ণ প্রকৃতি, এই অগণিত মানুষের সঙ্গে একত্রে। এক বিরাট জীবন-স্রোতের অংশ হ'য়ে। তাহলে দেখুন, কতো বড় আমাদের স্বত্ত্বা' যখন বহুর সঙ্গে আমরা মিলিত, যখন আমরা একা নই। যদি জীবনকে এভাবে দেখেন, তাহলে বুঝবেন মানুষ জন্মেছে মিলিত হবার জন্যে, সরে দাঁড়াবার জন্যে নয়। তার রক্তধারা অনন্ত প্রবাহে এক থেকে বহুমুখী ; তার অতল-গভীর মানস বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন-উৎসুক। অমন যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তিনি এক হ'য়েও একা থাকতে চাইলেন না, দুবেজী। তাই উপনিষদে বলা হয়েছে, 'স বৈ নৈব রেমে'। একা একা তাঁর ভালো লাগল না। কেন ? রস পান না বলে, আনন্দরূপ প্রকাশ পায় না বলে। তাই,'স দ্বিতীয়-মৈচ্ছৎ' তিনি দ্বিতীয়কে ইচ্ছা করলেন। নিজেকে দুই করলেন। তখন রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ দিয়ে তৈরী এই বিচিত্র বিশ্ব এল।"

সুদর্শন ব'লে উঠলেন, "আনন্দ রূপমমৃতং যদ্ বিভাতি।"

"ঠিক বলেছেন, দুবেজী। ঐতরেয় উপনিষদ বলছেন, ব্রহ্মার

সবচেয়ে প্রকট যে রূপ তা আনন্দরূপ। 'রসো বৈ সঃ'। তিনি রসিক, রসপ্রিয়, রসলোভী। (দীনদয়াল, দুবেজীকে আর একটু সরবৎ এনে দাও)। 'রসং হি এবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।' রস অনুভব ক'রে তিনি আনন্দ পান। আর, রসতো একা অনুভব করা যায় না, দুবেজী। তার জন্যে, চাই আরও একজন। দুয়ের জানাজানি, পরিচয়, প্রীতি: এ না হ'লে রসের ধারা বইবে কি ক'রে? আর, মনে রাখবেন, এই যে দ্বিতীয়, এ হ'ল বন্ধুরই নামান্তর। এক থেকে যেই আপনি দুই হলেন, আব আপনার বন্ধু হবার তর সইল না।"

সরবতের দ্বিতীয় গ্লাসে চুমুক দিয়ে সুদর্শন দুবে বললেন, "অতি সত্যি কথা।"

ঘড়ির দিকে একবার ক্ষিপ্র দৃষ্টি পড়ল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের।

বললেন, "তা হলেই ভেবে দেখুন, দুবেজী, একা আপনি আব একা আমি দুজনকে দুজনে না ল'ড়ে একসঙ্গে হাত মিলিয়ে উদয়াচলের সেবা করা কি বেশি ভালো নয়?"

"নিশ্চয়।"

খুব আস্তে, যেন রাত্রিও না শুনতে পায়, অথচ আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে, ব'লে উঠলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, "কালকার নির্বাচনে আপনি হেরে গেছেন।"

শব্দ কটি সুদর্শন দুবের বুকে বন্দুকের গুলীর মতো আঘাত করল। প্রতিবাদ করার শক্তি রইল না।

"তাই তো দেখছি।"

তেমনি ভীষণ আস্তে, ভীষণ জোরে: "সহজ হাব নয়। অন্ততঃ আশি ভোটে আপনার হার হবে।"

"তা হ'তে পারে।"

"আমি চাইনে, আপনি হেরে যান। তাতে আমার লাভ নেই, আপনার ও তো নেইই। সবচেয়ে ক্ষতি উদয়াচলের। হেরে গিয়ে আপনি আবার লড়বেন, জিতে গিয়ে আমি আপনাকে আবও

হারাতে চেষ্টা করবো। তাতে উদয়াচলে কংগ্রেস দুর্বল হ'য়ে যাবে।"

সুদর্শন ডুবে একবারে সবটুকু সরবৎ পান ক'রে নিলেন।

দীনদয়াল এসে পুনরায় তাঁর গ্লাস ভরতি ক'রে দিল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "তার চেয়ে আসুন আমরা একসঙ্গে কাজ করি। আপনি মন্ত্রীসভায় আসুন। আপনাকে পেলে মন্ত্রীসভা বলশালী হবে। কংগ্রেসে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। উদয়াচলের অগ্রগতি বেড়ে যাবে। আমি আপনার সাহচর্য চাইছি। আপনি মন্ত্রীসভায় আসুন।"

"কি সর্তে?"

"সর্ত কিছু নেই। একমাত্র সর্ত সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব। দুর্গা-ভাইকে প্রশ্ন করলে জানতে পারবেন মন্ত্রীদের আমি পূর্ণ স্বাধীনতা দি নিজ নিজ দপ্তরের পরিচালনায়। আপনার মান, সম্মান, সব আমার হাতে সঁপে দিন। দেখবেন, আপসোসের কারণ থাকবে না।"

"অর্থাৎ, আপনার কাছে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে।"

"তা নয়। মন্ত্রীসভায় না এলে শাসন কাকে বলে জানতে পারবেন না। আমার অবর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী হয়তো আপনাকেই হ'তে হবে। সে দিনের জন্যে তৈরী হোন। দুর্গাভাই কদাচ মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করবেন না। আপনার ও তাঁর মধ্যে আজ যে ব্যবধান তাও দূর করতে হবে। আমি আর কতদিন? আমি বিদায় নিলে হয় আপনি, নয় অন্য কেউ।"

"আপনি আমাকে উত্তরাধিকার দিয়ে যাবেন?"

"যদি আপনার যোগ্যতা থাকে নিশ্চয় দিয়ে যাবো। কংগ্রেসের সংগঠনে আপনার কৃতিত্ব সবাই জানে। এবার দেশ শাসনের কাজে কৃতিত্ব দেখান।"

"কোন্ মন্ত্রীত্ব দেবেন আপনি আমাকে?"

"জানি না। তবে, প্রধান মন্ত্রীত্বগুলির একটা আপনি নিশ্চয় পাবেন।"

"স্বরাষ্ট্র থাকবে আপনার হাতে, অর্থ থাকবে দুর্গাভাইজীর হাতে। শিল্প ও বাণিজ্য আমাকে দিতে রাজী আছেন?"

একটু ভেবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "আছি।"

"আর—।"

সেই রকম ভীষণ আস্তে ভীষণ জোরে, "আর কিছু নয়। অন্য কোন সর্ত যদি তোলেন, আমি মানবো না। তা হলে কাল নির্বাচন হবে। আপনার দল ভয়ানক হারবে। আর, এক বছরের মধ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতৃত্বও আপনার থাকবে না।"

সুদর্শন কয়েক মিনিট চুপ ক'রে রইলেন। সরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন।

"আর কোনও সর্ত আমার নেই। তবে কয়েকটা প্রশ্ন আছে। জবাব দেবেন?"

"নিশ্চয়।"

"হরিশংকর ত্রিপাঠীকে নতুন মন্ত্রীসভায় নেবেন না শুনছি। একি সত্যি?"

"আমার ইচ্ছা ত্রিপাঠীজীকে অন্য দায়িত্ব দেবার।"

"মহেন্দ্র বাজপাঈজী"

"আর কারুর সম্বন্ধে কিছু বলা এখন সম্ভব নয়। তবে নতুন মন্ত্রীসভায় কিছু নতুন রক্ত আমদানী করা আমার ইচ্ছে। বিশেষত কম বয়সীদের সুযোগ দিতে চাই।"

"অর্থাৎ, মন্ত্রীসভা বৃহত্তর হবে।"

"হতে পারে।"

"সরোজিনীকে মন্ত্রীসভায় নেবেন কি?"

"ইচ্ছে আছে।"

"সে তো সূর্যপ্রসাদকেও মন্ত্রীসভায় আনতে চাইছে।"

"আমাকেও তাই বলে গেছে। মন্ত্রীসভা, দুর্গাভাই ও আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে আপনাদের সম্মতি নিয়ে গঠন করবার ইচ্ছা পোষণ করছি। আমার ছেলেকে স্থান দেবার খুব আগ্রহ আমার নেই। সরোজিনী সহায়ের দাবী যদি আপনারা আমায় মানতে বলেন, মেনে নেব।"

সুদর্শন দুবে নীরবে সরবৎ পান করতে লাগলেন। চোখ মুখ থম থমে গম্ভীর।

"আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, দুবেজী?"

"না।"

"আমার কিছু বক্তব্য বাকী আছে। আজ সকালে আপনি আমায় এক বিবৃতিতে সই করতে বলেছিলেন। আজ রাত্রে আপনাকে আমি অন্য এক বিবৃতিতে সই করতে বলব।"

আতঙ্কিত কণ্ঠে সুদর্শন বলে উঠলেন, "কিসের বিবৃতি?"

"আপনি চেয়েছিলেন আপনার কাছে আমি দাসখৎ লিখে দি; আমি তা চাইনে আপনার কাছ থেকে। চাই সহযোগিতার অঙ্গীকার। একটি বিবৃতির খসড়া আমি তৈরী ক'রে রেখেছি। আমরা দুজনে তা সই ক'রে পি. টি. আইকে দিয়ে দেব। প'ড়ে দেখুন। এতে বলা হয়েছে উদয়াচলের মন্ত্রীত্ব নিয়ে যে মত-বিরোধ দেখা দিয়েছিল, আপনি এবং আমি একত্র হ'য়ে তার সমাধান করে ফেলেছি। আপনি আমার সরকারী নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন, আমি মেনে নিয়েছি আপনার সাংগঠনিক নেতৃত্ব। উদয়াচলের বৃহত্তম স্বার্থের খাতিরে অনিচ্ছা সত্বেও আপনি আমার একান্ত অনুরোধে, মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে রাজী হয়েছেন। আগামী কালের পার্টি সভায় আপনি নিজেই দলপতি পদে পুনঃনির্বাচনের জন্যে আমাকে মনোনীত করবেন। আমরা দুজনে আশা করি উদয়াচলের কংগ্রেস এবার অত্যন্ত বলশালী হবে, অন্তঃবিরোধ একেবারে ঘুচে যাবে; মন্ত্রীসভা কায়মনোবাক্যে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারবে।

বিবৃতির প্রত্যেকটি শব্দে ও বাক্যে আমি আপনার মান ও সম্মান পূর্ণ বাঁচিয়ে রেখেছি। প'ড়ে দেখুন।"

ফাইল থেকে একখণ্ড টাইপ-করা কাগজ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সুদর্শন দুবের হাতে দিলেন। সুদর্শন প'ড়ে কয়েক মিনিট ভাবলেন। তারপর পকেট থেকে কলম তুলে নিয়ে নাম সই করলেন।

সুদর্শন দুবের স্বাক্ষরের নীচে সই করলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল।

তিওয়ারীকে ডাকলেন।

"এই বিবৃতি নিয়ে এক্ষুণি পি. টি. আই. অপিসে চ'লে যাও। সুন্দরবাজনকে বলবে, এ যুক্ত বিবৃতি এক্ষুণি সুদর্শন দুবেজী এবং আমি স্বাক্ষর ক'রে তোমার হাতে পাঠাচ্ছি। আজ রাত্রে আমরা দুজনে আর কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব না। সুন্দরবাজন যেন আমার সঙ্গে কাল প্রাতে আটটার সময় দেখা করে।"

তিওয়ারী কাগজ নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, "মন্ত্রী হ'তে দেখবেন ভালো লাগবে, দুবেজী। আসুন আর একটু সরবৎ পান করা যাক। দীনদয়াল, সরবৎ নিয়ে আয়।"

এক চুমুকে গ্লাস শেষ ক'রে ফেললেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

"আঃ। আ-হাঃ। দুবেজী, এত গম্ভীর কেন?"

"আপনি রাজা। আনন্দ আপনারই শোভা পায়।"

"কই? আমি তো আমার রাজত্বে নিরানন্দের আদেশ জারী করিনি! যেমন করেছিলেন দুষ্মন্ত। শকুন্তলার কথা তাঁর মনে পড়েছে, তাই রাজ্যের সর্বত্র বসন্তোৎসব বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। নিরানন্দের সেকি সুন্দর বর্ণনা! শুনবেন, দুবেজী?

'চূতানাং চিরনির্গতাপি কালিকা বধ্নাতি ন স্বংরজঃ
সন্নদ্ধং যদাপি স্থিতং কুরুবকং তৎ কোরকাবস্থয়া।
কণ্ঠেষু সললিতং গতেঽপি শিশিরে পুংস্কোকিলানাংরুতং
শংকে সংহবতি স্মরোঽপি চকিতস্তূর্ণার্দ্ধকৃষ্টং শরম্॥'

—রাজা নিষেধ করেছেন তাই বসন্ত বিকশিত হয় নি। গাছ-পালা, ফুল, পাখী সবাই রাজার আদেশ মেনে নিয়েছে। আমের মুকুল সেই কবে বেরিয়েছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত তার পরাগ বাঁধেনি। কুরুবকের ফুল ফুটি-ফুটি ক'রেও ফুটলো না; কুঁড়ি থেকে গেল। সেই কবে হিমকাল চলে গেছে, তবু এখনও কোকিল কুহুরব করছে না; রাজাদেশ অমান্য করবার সাহস নেই। এমন যে ত্রিভুবনবিজয়ী কন্দর্পদেব, তিনি বসন্তের সমাগমে তূণ হ'তে বাণ প্রায় নিষ্কাশিত করেছিলেন। এমন সময় রাজাদেশ হল, আর তিনি চমকিত হ'য়ে শশব্যস্তভাবে সেই বাণ আবার তূণীরে রেখে দিলেন।"

"আমি আজ আসি, কোশলজী। সরবৎ একটু বেশি পান করা হয়ে গেছে। নিদ্রায় চোখ জড়িয়ে আসছে।"

"আসুন, আসুন। কাল একেবারে পার্টি মিটিং-এ দেখা হবে; বাড়ী গিয়ে পরম সুখে নিদ্রাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করুন:

'দিন জলদী-জলদী ডলতা হ্যয়।
হো জায় ন পথ মে রাত কঁহী
মঁজিল ভী তো হ্যয় দূর নঁহী—
বহ্ সোচ থকা দিন কা পন্থী ভী
জলদী-জলদী চলতা হ্যয়
দিন জলদা জলদী ঢলতা হ্যয়।'"

ঘড়ির দিকে তাকালেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

বারোটা আট।

জানলার বাইরে আকাশ নিশ্চুপ, সুস্থির।

অন্ধকার মনলোভা রমণীর হাতের কোমল স্পর্শ।

সুদর্শন তুবের সঙ্গে হাত মেলালেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল।

"নমস্তে মুখমন্ত্রীজী।"

"নমস্তে শিল্পমন্ত্রীজী।"

সুদর্শন দুবে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন দীনদয়ালের সঙ্গে ধীর পদক্ষেপে, সন্তর্পণে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

টেলিফোন বেজে উঠল।

"কোশল।"

"আমি সুভাষ, কোশলজী।"

"রাইট অন্ টাইম। ভেরী গুড। গো অ' হেড।"

"যে-আজ্ঞে।"

"তুমি নিজে থেকে সব কাজ কর্ম দেখছ তো?"

"কাগজ বেরুবার পর বাড়ী যাবো।"

"বেশ। আর একটা কাজ করবে।"

"বলুন।"

"পি. টি. আই.-কে একটা বিবৃতি পাঠিয়েছি। সুদর্শন দুবের ও আমার সই-করা। এক্ষুণি তুমি পেয়ে যাবে। ওটা বেশ বড়ো ক'রে প্রথম পৃষ্ঠায় ছেপো। সঙ্গে আমার, সুদর্শন দুবের এবং দুর্গাভাই দেশাইর ছবি দেবে—দুবেজী মাঝখানে, বুঝলে তো? সম্পাদকীয় প্রবন্ধ তুমি নিশ্চয়ই লিখেছ। তার মধ্যে এ বিবৃতির কথা উল্লেখ করা দরকার। অর্থাৎ তোমাকে সম্পাদকীয়টা আর একবার লিখতে হবে। কি বললে? পারবে? খুব ভালো। হ্যাঁ শোনো। সুন্দররাজনকে ফোন কর। তোমার সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছে, এবং যে রাজনৈতিক সংবাদ তুমি ছাপছ তার কিছুটা তাকে দিয়ে দাও। অন্য সব কাগজেও তো ছাপা দরকার। বুঝেছ তো? বেশ। ভেরী গুড।"

"আপনাকে অভিনন্দন জানাই, কোশলজী"

"অভিনন্দন? আজ নয়। কাল রাত্রে। কাল রাত্রে খেতে এসো আমার এখানে। গুড নাইট।"

চব্বিশ

মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত। কর্মের গৌরবতৃপ্ত সমাপ্তি। এবার বিশ্রাম। এবার নিদ্রা। আবার সূর্যালোকিত প্রভাতে নতুন সংগ্রামের প্রস্তুতি।

তিওয়ারী ফিরে আসবার আগেই সুদর্শন দুবে বিদায় নিয়েছেন। দীনদয়ালের কাঁধে হাত রেখে নেমে গেছেন সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাকিয়ায় দেহ এলিয়ে তারা-ভরা আকাশের পানে তাকিয়ে শুনতে পেয়েছেন গাড়ীর প্রস্থান শব্দ। শুনতে শুনতে আধা-জাগ্রত চাঁদকে বলেছেন :

'তুহুঁ যৈছে রসবতী কানু রসকন্দ।
বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥
তুহুঁ যদি কহসি করিয়ে অনুসঙ্গ।
চৌরি-পিরীতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ॥'

অনেক পুণ্যে রসবতীর সঙ্গে রসবন্তের মিলন হয়। (বাঁকা হাসি দেখা দিল কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাসিকার নীচে।) আর প্রেমের সঙ্গে একটু চৌর্যবৃত্তি মিশিয়ে দাও, তবে হবে লাখগুণ রঙ্গ। [হেসে উঠলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।]

হাসতে হাসতেই দেখতে পেলেন তিওয়ারী এসে ঘরে দাঁড়িয়েছে।

"রাত অনেক হল," তিওয়ারী নিবেদন করল। "সাড়ে বারোটা।"

"হ্যাঁ, এবার উঠবো। কাগজপত্রগুলি গুছিয়ে দাও।"

তিওয়ারী ফাইল, কাগজপত্র, বই সব গুছিয়ে ফেলল। জরুরী ফাইলগুলি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজের হাতে সরিয়ে রাখলেন। কিছু কাগজপত্র বাক্সে তুলে রেখে নিজের হাতে চাবি লাগালেন।

একটু ধর আমাকে। কোমরে ব্যাথাটা···"

জগন্মোহন তিওয়ারীর কাঁধে ভর ক'রে উঠে দাঁড়ালেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

হরিণ-চামড়ার চটিজুতা পরিয়ে দিল তিওয়ারী তার পায়ে।

দরজা পেরিয়ে বারান্দা। একদিকে ক্যাবিনেট রুম। অন্যদিকে, শেষ প্রান্তে, বিশ্রাম ঘর, অর্থাৎ শোবার ঘর। শোবার ঘরের সঙ্গে বাথরুম।

বারান্দার শেষ পর্যন্ত তিওয়ারী নিয়ে গেল কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে। সারা মুখ্যমন্ত্রী ভবন নিঃশব্দ। রাত্রি গভীর আলিঙ্গনে বেধে রেখেছে সবাইকে, সব কিছুকে। কেউ আর কিছু দেখছে না, শুনছে না, জানছে না। কারুর মুখে, চোখে আর কোনও প্রশ্ন নেই। এখন কেবল ধারাবাহিক অবলুপ্তি।

বাথরুমের কাছে তিওয়ারী থামল।

ধুতি, ফতুয়া, তোয়ালে, সাবান নিয়ে বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল আর একজন। সে এক-পা এগিয়ে এল।

তিওয়ারী দু পা পিছিয়ে গেল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হাত বাড়িয়ে বাথরুমের দরজা ধরলেন।

তিওয়ারী নিঃশব্দে দ্রুত বিদায় নিল।

দপ্তর ঘরের আলো নিভল। তিওয়ারী গাড়ীতে বসল। গাড়ী ছাড়ল।

দিনদয়াল এক তলায় তার শোবার ঘরে চলে গেল।

ফাটকে বন্দুক-ধারী প্রহরী বলে উঠল, রামা হৈ, রামা হৈ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাথরুমে ঢুকে নরম গদি-আঁটা চেয়ারে বসলেন। ঈষৎ-উষ্ণ জলে তাঁর হাত, পা সাবান দিয়ে সে ধুয়ে দিল। নিজের হাতে মুখ ধুলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। মুখ ও ঘাড় সে সযত্নে মুছিয়ে দিল। কুর্তা ও বেনিয়ান ছাড়িয়ে পরিয়ে দিল ধবধবে সাদা ফতুয়া। ধুতি বদলে তিনি যখন বেরিয়ে এলেন তখন মন একেবারে হালকা, দেহ আরাম-অভিলাষী।

বাথরুম থেকে তার কাঁধে হাত রেখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শয়ন ঘরে গেলেন। সে বিছানা অনেক আগেই তৈরী রেখেছিল। নরম সুখকর শয্যার ওপর বিছানো ছিল মণিপুরী বেড-কভার। এক-পাশে ফুলদানীতে একগুচ্ছ লাল গোলাপ। সব ঘর জুড়ে মৃদু সৌরভ। শয্যা ও দেওয়ালের মাঝামাঝি আরাম কুরসিতে বসলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

নরম হাত দিয়ে ভীরু, সন্তর্পন যত্নে সে তাঁর কপাল, মাথা ঘাড় টিপতে লাগল।

বাথরুমে ঢোকার পর থেকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কথা বলে যাচ্ছিলেন। একটানা নয়। মাঝে মধ্যে, হঠাৎ। নীরবতার অন্ধকারে জোনাকি আলো। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কাউকে উদ্দেশ্য ক'রে কিছু বলছিলেন না। নিজেকেও না। শুধু বলছিলেন। না বলে উপায় ছিল না, তাই বলছিলেন।

তাঁর কথা কারুর মনে একটুও রেখাপাত করছিল না।

সে একটি কথাও শুনছিল না।

সে একটি কথাও বলছিল না।

একটি কথাও বুঝছিল না।

দপ্তরবাড়ীতে রাত্রি যাপন করলে অনেক সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সুনিদ্রা লাভের জন্য তার সেবা গ্রহণ করেন।

সারাদিন ক্লান্তির পর মাথা, কপাল, ঘাড়, পিঠ ও কোমর টিপে দিলে ভালো ঘুম হয়। সারাদিন পরে, অনেক রাত্রিতে, কর্ম শেষে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কখনও সখনও সরবৎ পান করেন। একটু বেশি পান হ'য়ে গেলে কথা বলতে ইচ্ছে হয়। দীর্ঘ কালের চর্চায় যে-সব কবি তাঁর কণ্ঠস্থ, তাঁদের কবিতাবলী ঝর্ণার মত চোখের সামনে ব'য়ে যায়। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ দিয়েও কাব্যরস নির্গত হ'তে থাকে।

সেবা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পান। নরম হাতের কোমল সেবা।

চোখের ও আরাম হয়। দেখতে সে সুন্দর।

সে নীরব, নিশ্চুপ. নিরীহ।

একটা কথাও সে বলে না। শোনে না। বোঝে না।

বোবা, কালা, জগন্মোহন তিওয়ারীর স্বামী পরিত্যক্তা সুন্দরী কন্যা।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের সেবিকা।

দিনটা মন্দ কাটলো না। সুদর্শন দুবে হেরে গেল। যা সকালে ভাবতেও পারেনি, মধ্য রাত্রিতে তাই তাকে করতে হল। সকালে বলে গেল, এক গগনে দুই সূর্য, দুই চন্দ্রের সহ-অবস্থান সম্ভব নয়। সুদর্শন দুবে আর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল এক মন্ত্রীসভায় সহযোগিতা করতে পারে না। সকাল বেলাকার সূর্য মধ্যরাত্রিতে মন্দজ্যোতি তারকা হ'য়ে গেল। কাল সকালে সে আর সূর্য থাকবে না। দিবসেও তাকে নক্ষত্র হ'য়েই বিরাজ করতে হবে। সুদর্শন দুবেকে আর একটু সান্ত্বনা দিতে পারলে ভাল হ'ত। সরবৎ পান ক'রে বড় গম্ভীর হ'য়ে গেল সুদর্শন। ঘুম পেয়ে গেল। বললে হ'ত, দুঃখ বা শোক ক'রে লাভ নেই। আজ যা হল না, কাল হয়তো তা হবে। হয়তো কোনও দিন হবে না। যা হল, তাকে ছোট ক'রে দেখতে নেই। মহাভারতে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে তাই বলেছিলেন। আরও একটা বড় কথা বলেছিলেন। সময় নিরপেক্ষ। সে কাউকে ভালোবাসে না, কাউকে ঘৃণা করে না। শুধু সবাইকে আকর্ষণ করে। 'ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেষ্যঃ কুরুসত্তম। ন মধ্যস্থঃ ক্বচিৎ কালঃ সর্বং কালঃ প্রকর্ষতি।' সবাইকে কাল কেবল আকর্ষণ করে। আমাকেও করছে। আস্তে, অত জোরে নয়। আস্তে হাত চালাও। ঘাড়ে কেমন একটা ব্যথা। সর্বংকালঃ প্রকর্ষতি। বাষট্টি বছর বয়সে কালের আঁকর্ষণকে ভয় করার কথা নয়। আমি নিশ্চিন্ত হ'লে

সুদর্শন দুবে হবে উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী! কেন হবে না? তার চেয়ে যোগ্য তখন থাকবে না আর কেউ। এমন দিন আসবে সে দিনের খুব দেরী নেই, যে দিনের মন্ত্রীরা আজকের মন্ত্রীদের থেকে অন্য-প্রকার হবে। ইংরিজী জানবে না। তারা আসবে গ্রাম থেকে, জিলা শহর থেকে। নতুন ভারতবর্ষের প্রকৃত নেতা। হবে না কেন? রাজনীতিতে কারা আসছে? গ্রামের ধনী চাষী। দশরকম কর্মহীন মানুষ। যাদের আর কিছু করবার নেই তারা রাজনীতি করছে। ভালো ভালো ছেলেগুলি হচ্চে এনজিনীয়র ডাক্তার, সায়ান্টিষ্ট, এড্‌মিনিষ্ট্রেটর। বুঝছে না, গণতান্ত্রিক দেশে আসল নীতি হল রাজনীতি। আগে রাজা, পরে প্রজা। ভীষ্ম শরশয্যা থেকে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন, আগে কোনও রাজার আশ্রয় নেবে, তারপর ভার্যা আনবে, তারপর আহরণ করবে ধন। রাজা না থাকলে ভার্যাও থাকবে না, ধনও না। 'রাজানং প্রথমং বিন্দেৎ ততো ভার্য্যাং ততোধনম। রাজন্যসতি লোকস্য কুতোভার্য্যা কুতো ধনম্॥' রাজা মানে 'কিং' নয়, রাজা মানে গভর্ণমেণ্ট। আগে দেশ সুশাসিত হবে, তবে ঘরে বৌ থাকবে, ধন জমবে। এ কথাটা ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকেরা বুঝছে কৈ? যাদের হাতে রাজনীতির রশি তুলে দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত, তারা যে দেশের রথ বেশি দিন টানতে পারব না, দেশের লোক তা ভেবে দেখছে কি?

আমি মরলে অথবা অবসর নিলে উদয়াচলের 'রাজা' হবে সুদর্শন দুবে। তারপর হয়ত-বা গোবিন্দ সহায়। সুদর্শন দুবের তিন-ধাপ নীচে। দুর্গাভাই দেশাই? দুর্গাভাই দেশাইদের কাল বহুদিন গেছে। সুদর্শনের সঙ্গে আমার সমঝোতায় দুর্গাভাই আহত হবেন। ভাববেন, তাঁকে ডিঙিয়ে এ-কাজ ক'রে তাঁর প্রতি আমি অসম্মান দেখিয়েছি। অভিমান হবে। তাই, ভোর-সকালে যেতে হবে দুর্গাভাই-এর কাছে। অসুস্থ জেনে তাঁকে আজ আর

বিরক্ত করিনি, বলতে হবে। অভিমান ভাঙ্গতে দেরী লাগবে না। সুদর্শন তুবের সঙ্গে একত্রে তিনি মন্ত্রীসভায় থাকবেন না? নিশ্চয় থাকবেন। না থেকে যাবেন কোথায়? গান্ধী-আশ্রম আর চলবে না। মন্ত্রীত্ব ছাড়া আর কিছু করবার নেই আমাদের কারুর, আমরা যারা একবার মন্ত্রী হয়েছি। মন্ত্রীত্ব নিয়ে যাও, আমরা বেকার। আমাদের অংসে মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। তুর্গা-ভাইকে মন্ত্রীত্ব নিতেই হবে। সুদর্শন তুবে আর তুর্গাভাই দেশাই একে অন্যকে ম্লান ক'রে রাখবে। একজনও পারবে না বেশি প্রভাব ছড়াতে। তুজনেই থাকবে আমার আয়ত্বে, তুর্বল হ'য়ে। স্বয়ং বৃহস্পতি বলেছেন, রাজার প্রধান কর্তব্য সযত্নে স্বার্থ রক্ষা করা।

কাল সকালে বিলাসপুরে বিস্ময়ের সীমা থাকবে না। যারা ভেবেছিল কে. ডি. কোশলের পতন হল, তারা আবার তার উত্থান দেখে বিস্মিত হবে। উদয়াচলের নেতা কে ডি কোশলের কদাপি পতন ঘটবে না। যেদিন ঘটবে সেদিন তার মৃত্যু। আমরণ সে উদয়াচলের সেবা ক'রে যাবে। তা নইলে আত্মার তৃপ্তি হবে না। উদয়াচলের ইতিহাসে কে. ডি কোশল অমর হয়ে বেঁচে থাকবে। তাঁর নাম বহন করবে না কেবল কে. ডি. কোশল এ্যাভিনিউ, কে. ডি. কোশল কলেজ ফর উইমেন, কোশল পলিটেকনিক এবং কে ডি কলোনী। তাঁর নাম বহন করবে উদয়াচলের ইতিহাস। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। উদয়াচলের এক এবং অদ্বিতীয় নেতা।

নেতা কি ক'রে হয়? কোন্ মালমশলায়? কোন যাতুতে? দেশ সেবায়? তাহলে তো উদয়াচলের নেতা হতেন তুর্গাভাই কৃপাভাই দেশাই! দলীয় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে? তাহলে এ সম্মান প্রাপ্য হ'ত সুদর্শন তুবের। নেতৃত্বের যাতু অন্যতর, যা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের আছে, তুর্গাভাই ও সুদর্শন তুবের নেই। মহাভারতে বলা হয়েছে নেতা সূর্যের মত অন্ধকারময় স্থান

উদ্‌ভাসিত করেন, বায়ুব মত নির্বাত স্থান আহ্লাদিত করেন। 'অসূর্য্যমিব সূর্য্যেন নির্বাতমিব বায়ু না। ভাসিতং হ্লাদিতঞ্চৈব কৃষ্ণনেদং সদো হি নঃ॥' সে নেতা হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। আর ভারতবর্ষে বর্তমান যুগে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী কাব্যে রূপ দিয়েছে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। উদয়াচলের অন্ধকারে সে আলো এনেছে। নির্বাত উদয়াচলে এনেছে প্রাণধারণের বায়ু। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল উদয়াচলের একমাত্র নেতা।

তবু একজন বলেছিল, সব ছেড়ে দাও, দিয়ে বনবাসী হও। বলেছিল এক বৃদ্ধা নারী। নাম পদ্মাদেবী। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের ধর্মপত্নী। বলেছিল, দুর্বলের মত রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করো। না, তা নয়। বলেছিল, জয়লাভের পব রাজমুকুট মাটিতে রেখে একবস্ত্রে বাণপ্রস্থ গ্রহণ করো। রাজী হইনি বলে আজই রাত্রে সে বারাণসী চলে গেছে। বলেছিল, এ জয়ের জন্যে যে দাম দিতে যাচ্ছ তাতে তুমি নিঃস্ব হবে। কি দাম দিতে হল? সুদর্শন দুবেকে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরেব মন্ত্রীত্ব? সবোজিনী সহায়কে মন্ত্রীসভায় নেওয়া? দুশো কংগ্রেসী সদস্যের ছোটখাট দাবী দাওয়া মিটিয়ে দেওয়া? নিজের ছেলেকে কৌশলে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ক'রে নেওয়া? এসবের কি এতই দাম যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলকে নিঃস্ব ক'রে দেবে? এটুকু দাম কি উদয়াচল দিতে পারে না কে. ডি. কোশলেব নেতৃত্বের জন্যে?

…মেয়েটি বেশ। নামটিও। সরোজিনী সহায়. আশ্চর্য। খানিকটা কৌশল্যার মত দেখতে। শিক্ষিত, মার্জিত, সপ্রতিভ। দেখতে বেশ সুন্দর। রসিকতা বোঝে। উচ্চাশা আছে। মেয়েটি বেশ। ওকে তৈরী করতে পারলে কাজ হবে। মুখ্যমন্ত্রীর উপমন্ত্রী হবার আশ্বাসে মহা খুশী। এতোটা আশা করতে পারে নি। ভেবেছিল বড় জোর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী হ'তে পারবে। দিতে জানতে হয়। যখন দিতে হবে, তখন বেশি ক'রে দাও।

গ্রহীতার হাত পূর্ণ ক'রে দাও। যখন জানো দেবেনা, তখন এক বিন্দুও দেবার ছলনা কোরোনা। আস্তে আস্তে দিতে গিয়ে দেখবে দানের চিহ্ন মাত্র নেইঃ নিদাঘ তপ্ত মাটিতে জলবিন্দুর যেমন চিহ্ন থাকে না। সরোজিনীকেও তেমনি দুহাত উপছে দিয়ে দিয়েছি। একে উপমন্ত্রী, তারপর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকবার সৌভাগ্য। ওকে দিয়ে কাজ হবে। রাজনৈতিক উচ্চাশা আছে। শিক্ষিত, মার্জিত, সপ্রতিভ। বলে কয় বেশ। দেখতে ভালো। রসিকতা বোঝে। মুখে-চোখে প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতা। বুকে কোথাও লুকানো ব্যথা আছে মেয়েটির। ডান গালটি হাতে ভর করে কথা শুনছিলো। দেখতে ভালো লাগছিল। মনে হচ্ছিল সন্ধ্যায় ম্লান আকাশে প্রতিপদের চাঁদ। ঐ দেখ, জয়দেবের ভাষা মনে এসে গেল।

'ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্।
বলে শশিনমিব সায়মলোলম॥'

আশ্চর্য, ধর্মপত্নী পদ্মাদেবীকে নিয়ে কবি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অন্তরে কাব্যধারা কোনও দিন প্রবাহিত হয়নি। পদ্মাদেবী তাপসী। রমণী নয়। তার স্থান পূজাঘরে, নিশ্ছিদ্র নীতিবোধে, কর্তব্যের কঠোর দাবি নিরলস নিঃপ্রশ্ন নিপুণতায় মিটিয়ে যাওয়ায়। সে অন্তরের বিবেক। তাকে নিয়ে অনেক কিছু হ'তে পারে, কাব্য হয় না, বেঁচে থাকার দহন আনন্দ অনুভব করা যায় না। এ বৃদ্ধ বয়সে কাব্যধারা কেমন যেন শুকিয়ে গেছে; রাজনীতি ও শাসনের ধারাবাহিকতা থেকে অবসর নেই। তবু ইচ্ছে হয়— মরবার আগে আর একখানা মহাকাব্য রচনা ক'রে যাই। সরোজিনী সহায় কি কাব্যরস বুঝবে?

'বিচল দল কললিতানন চন্দ্রা
তদধর পান রভস কৃত তন্দ্রা॥
চঞ্চল কুণ্ডল ললিত কপোলা
মুখরিত রসন জঘন গতিলোলা॥

দয়িত বিলোকিত লজ্জিত হসিতা
বহুবিধ কূজিত রতিরস বসিতা ॥
বিপুল পুলক পৃথু বেপথু ভঙ্গা
শ্বসিত নিমীলিত বিকাসিত নঙ্গা ॥'

যুগ যুগ ধ'রে সব কবি এমনি কাব্যলক্ষ্মীর সন্ধান ক'রেছে। যার মুখচন্দ্রে উড়ে উড়ে পড়েছে চূর্ণ অলক, প্রিয়মুখ চুম্বন সুখে ঢুলু ঢুলু আঁখি। ললিত কপোলে দুলছে মণি-কুণ্ডল; মেখলা মুখর ঘন ঘন জঘন-সঞ্চালনে। দয়িতকে দেখে কখনও সে হাসিতে উদ্ভাসিত, কখনও প্রেমলাজে লজ্জিত। রতিরসে বিভোর তার মুখ থেকে কত না অস্ফুটধ্বনি বিচ্ছুরিত। কখনও সে বিপুল পুলকে কম্পিত। তার রতিরঙ্গ প্রকাশ পাচ্ছে কখন বা ঘন ঘন নিঃশ্বাসে, কখনও চোখের চাহনিতে।

সুদর্শন ডুবেও বারবার কেঁপে উঠছিল। রতিরঙ্গে নয়। পরাজয়ের বিভীষিকায়। কিন্তু সত্যি সুদর্শনের হার হয়নি। আগামী মন্ত্রীসভায় উদয়াচলের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি হ'য়ে উঠবে, ধীরে ধীরে, সুদর্শন ডুবে। দুর্গাভাই দেশাই ক্রমে অস্তমিত হবেন। ধৈর্য ও বুদ্ধি থাকলে উদয়াচলের গগনে সুদর্শন একদিন প্রধান ভূমিকায় উদিত হবেন। কংগ্রেস বহুদিন রাজত্ব করবে। ভেঙ্গে যেতে যেতেও রাজত্ব করবে। তার কারণ—কংগ্রেস কোনও দল নয়। বহু দল-উপদলের মিলিত রঙ্গভূমি। অন্য কোনও দল ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল দানা বাঁধতে পারবে না। এই সাধারণ সত্য দুর্গাপ্রসাদ বুঝল না, তাকে বোঝান গেল না। এদেশের জলবায়ু, ইতিহাস ঐতিহ্য কোনও কিছুকে পবিত্র থাকতে দেয় না। সবকিছুতে ভেজাল মিলিয়ে 'ভারতীয়' করে নেয়। আমরা তাকে বলি 'সমন্বয়'। এ সমন্বয়ের চেহারা দেখবে সর্বত্র। বহুদলের রাজনীতির নাম দিয়ে একটি দলের ধারাবাহিক রাজত্ব। গণতন্ত্রের সঙ্গে আশ্চর্য সমন্বয় সামন্ত-তন্ত্রের। সমাজ-বাদের সঙ্গে ধনবাদের। ভারতবর্ষে সাম্য

বাদ বল, সমাজবাদ বল, সব ভেজাল। সবকিছুতে 'সমন্বয়'। অথচ এ সত্যটা দুর্গাপ্রসাদ বুঝল না। বুঝলে সে কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে 'বামপন্থী' হ'ত না। তৈরী করত না স্বখাত রাজনৈতিক কবর। দুর্গাপ্রসাদ আজ কংগ্রেসে থাকলে একদিন উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী হ'ত। পিতার উত্তরাধিকারে তার পূর্ণ যোগ্যতা ছিল। আমিও তাকে দিয়ে যেতাম সযত্নে দীক্ষা। আমার জীবনের সবটুকু পাওনা তার হাতে তুলে দিয়ে যেতাম। হল না। পুত্র চললো না পিতার পথে, তার সঙ্গী হয়ে। বেছে নিল বিপথ। দুপথের ব্যবধান গেল বেড়ে। দুর্গাপ্রসাদ এখন পিতার আদেশে কারাগারে বন্দী। আমার জয়ে তার আনন্দ নেই। আমি হারলে সে ব্যথা পেত না। আমি চলেছি, আমার পথে, শেষ পথটুকু মাত্র আছে বাকী। দুর্গাপ্রসাদ ব্যঙ্গ করছে, উপহাস করছে, নিন্দা ও প্রতিবাদ করছে। ক্ষীণ প্রতিরোধও করেছে। তার মায়ের আকুল অনুরোধ দিয়ে নয়। বিকল্প রাজনীতির জোর দেখিয়ে। অথচ তার কোনও দিন জয় হবে না। গলিতনখদন্ত হ'য়েও কংগ্রেস রাজত্ব করবে। দুর্গাপ্রসাদ একদিন বৃদ্ধ হবে, দেহে, মনে। ব্যর্থতায়, হতাশায় সে বৃদ্ধ হবে। অথচ কিছু করার নেই। আমার শক্তি নেই তাকে ফিরিয়ে আনার। সুদর্শন দুবেকে টেনে আনতে পারি—কিন্তু পুত্র দুর্গাপ্রসাদ আমার আয়ত্বের বাইরে।

'বিধি-নিষেধ কে বন্ধন, জগ্‌কে
ব্যঙ্গ কহাঁ উপহাস কহাঁ,
তানো কো তানে স্থননে কা
সময় কহাঁ অবকাশ কহাঁ ?
নিজ পথ পর চলতে রহতে হো
মিলা তুমহেঁ গতি কা 'নির্বাণ'
দুর দেশকে অথক পথিক হে
হে কবি, হে অদভুত, অনজান।'

কবি দূরদেশের অনজান পথিক। পান্থ সে, তাই তাকে পথের বোঝা ব'য়ে বেড়াতে হয়। কবি কেবল বলতে চায়, জীবনে জীবনে যে-বলার শেষ নেই। 'দিনের কাহিনী যত, রাত চন্দ্রাবলী, মেঘ হয়, আলো হয়, কথা যাই বলি।' আমি বলছি, অথচ তুমি শুনতে পারছ না। তুমি বলতেও পারছ না। তোমার বলন নেই, শ্রবণ নেই অথচ তুমি পাষাণ-অহল্যা নও। তুমি রক্ত-মাংসে গড়া সুন্দরী নারী। তোমার হাতের স্পর্শ সুন্দর, তোমার দেহের কান্ত শান্ত উত্তাপ সুন্দর। তোমার সেবা সুন্দর। অথচ তোমার গভীর কালো চোখে প্রাণের প্রকাশ নেই, তোমার ঘনকৃষ্ণ মৃদু-সুরভিত কেশে কম্পিত কামনা নেই। তুমি শুনতে পাও না। অথচ তুমি জানো আমার কি চাই, কেন তোমাকে এখানে আসতে হয়, কখন তোমাকে চলে যেতে হয়। তোমার কাছে কিছু চাইতে হয় না, তোমাকে কিছু বলতে হয় না। কথা বললে তোমার মুখে সামান্য ভাবের পরিবর্তন দেখতে পাই নে। আমি রজনীর নিজন একাকীত্বের কাছে কতো কথা বলি, তুমি একমাত্র প্রাণী আমার কাছে থাকো। কাছে থাকো অথচ শুনতে পাও না। তবু এত রাত্রে ঘুমুতে এসে তোমার এই নীরব সঙ্গ আমার ভাল লাগে। তুমি সেবা কর।

আমরাও সেবা করি। আমরা দেশের নেতা ও দেশ-সেবক। বহুদিন আগে দেশমাতৃকার মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আমরা সংগ্রামে নেমেছিলাম, পৃথিবীর বৃহত্তম সহিংস শক্তিকে অহিংসায় পরাস্ত ক'রে ভারতবর্ষে আমরা এক অভিনব ইতিহাস রচনা করেছি।

ভাই বোনেরা, কমরেডগণ, আপনারা এক মুহূর্তের জন্যে সে গৌরবময় ইতিহাসের কথা বিস্মৃত হবেন না। আমাদের একজনও নেতা নয়ঃ আমরা এখনও ভারত মাতার আজ্ঞাবহ সৈনিক অবস্থার পরিবর্তনে কর্তব্যের রূপ বদলায়। পুণ্য-প্রদীপ্ত কুরুক্ষেত্রের বিবদমান দুই সৈন্য শিবিরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়েছিলেন, তাঁর সেদিনকার কর্তব্য হত্যা করা,

দুর্যোধনকে পরাস্ত করা, যুদ্ধে জয়লাভ করা। আজ আমাদের কর্তব্যের চেহারা শুধু বদলেছে, অন্তঃসার বদলায় নি। আমরা এখন শাসনভার গ্রহণ করেছি, কিন্তু এ হল ভরতের অযোধ্যার শাসন-ভার গ্রহণ করবার মত। ভরত শ্রীরামচন্দ্রের হেমভূষিত পাদুকাদ্বয় নিয়ে অযোধ্যায় ফিরেছিলেন, সে পাদুকাই রাজ্যের যোগক্ষেম বিচার করতো। আমরাও দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হ'য়ে রাজ্যভার গ্রহণ করেছি। সমস্ত দেশবাসীর উচ্চারিত, অনুচ্চারিত আজ্ঞা, কামনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ ও অভাব আমাদের শাসনের যোগ-ক্ষেম বিধান করছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে আমরা ক্ষমতা পেয়ে ভোগী, আরামপ্রিয় ও বিলাসী হ'য়ে উঠেছি। ইংরেজ-পরিত্যক্ত অট্টালিকায় আমরা বাস করি, গাড়ী চড়ে বেড়াই, সাধারণ মানুষের থেকে আমরা অনেক দূরে। কিন্তু, ভাইসব, আমার বিনীত নিবেদন, এ ধারণা একেবারে ভুল। আপনাদের মনে আছে, গত মহাযুদ্ধের আগেও কংগ্রেস একবার মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যেই মুহূর্তে আমাদের নেতারা সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, দেশবাসীর সংগ্রাম-আহ্বান আমাদের কানে পৌছল, সেই মুহূর্তে আমরা সব কিছু ত্যাগ করে আবার সৈনিকের সাজে রাজপথে বেড়িয়ে এলাম। এই হল আমাদের আসল পরিচয়। আবার যদি কোনও দিন আহ্বান আসে, আমরা যারা আজ শাসন-যন্ত্র চালাচ্ছি, বাস করছি রাজপ্রাসাদে, সৈনিক হ'য়ে আমরা আবার জনতার নেতৃত্ব করবো। আমাদের কারুর দেহ অক্ষত নয়, কমরেডগণ। এমন কেউ নেই আমাদের মধ্যে যার দেহে ইংরেজ-পুলিশের অত্যাচারের চিহ্ন নেই, কিংবা যার আত্মা দীর্ঘ কারাবাসের যন্ত্রণায় জর্জর হয় নি। ভাই বোনরা, আপনারা জানবেন, আমরা কখনও ভুলি না, ভুলি না, ভুলি না। যদি পরদেশী দুশমন আবার কখনও পুণ্যতোয়া ভারতের স্বাধীনতা বিপন্ন করে, যদি দেশের মধ্যকার দেশদ্রোহী দেশকে দুর্বল, পঙ্গু, নিঃস্ব করতে উদ্যত হয়,

আমরা আবার সৈনিক হ'য়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবো আপনাদের পাশে, আপনাদের আগে ; কদাচ আপনাদের পশ্চাতে নয়।

খুব হাততালি পড়েছিল সেদিন। শরৎকালে বিশাল গান্ধী-ময়দানে বিরাট জনসভা। লোক, লোক আর লোক। স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকী। জনতা হাত তালি দিতে দিতে মেতে উঠেছিল। দুর্গাভাই বলেছিলেন অমন ওজস্বিনী ভাষণ জীবনে তিনি বেশি শোনেন নি। আমি কি করেছিলাম, জানো? জনতার উল্লাস দেখে কেঁদে ফেলেছিলাম। স্বাধীনতা যে আমাদের দেশের মানুষের এত প্রিয়, স্বরাজ যে তাদের বুকে এমন গর্বের, আনন্দের তরঙ্গ এনেছে, আমি আগে ভাবতে পারি নি। সত্যি বলতে কি, যে-ভাবে স্বাধীনতা এলো তাতে আমাদের অনেকের মন দমে গিয়েছিল। সেই শেষ পর্যন্ত ইংরেজের সঙ্গে গিয়ে আমরা হাত মেলালাম ; বললাম, তোমরা যা করবে করো, তারপর অন্তত ওপর-ওপর বিদেয় হও। ইংরেজ দেশটাকে দুটুকরো করল, রাখল চিরদিনের মত পঙ্গু করে। আমরা স্বাধীন হয়ে ইংরেজের গলা জড়িয়ে ধরলাম, কাটাকাটি করলাম হিন্দু-মুসলমানে। কিন্তু স্বাধীনতার যে আর একটা দিকও আছে, তা যে দেশের জনসাধারণের মনে জাগরণের বন্যা এনেছে, দাসত্বের মলিনতা দূর ক'রে তাদের উন্নত শির করেছে, তার পরিচয় পেলাম সেদিনের জনসভায়। বুক কেঁপে উঠল বারবার। মনে হল, এই আশ্চর্য শক্তি যদি আমরা ঠিকমত ব্যবহার করতে পারি, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হ'তে বাধ্য।

দুর্গাভাইও নিশ্চয় ভয় পেয়েছিলেন। তাই তিনি আমার বক্তৃতার অনুসরণে তুলসীদাসের 'রামরচিতমানস' থেকে রাম-ভরত-উপাখ্যান আবৃত্তি করতে লাগলেন।

'সভা সকুচ বস ভরত নিহারী।
রামবন্ধু ধরি ধীরজু ভারী॥

কুসমউ দেখি সনেহু সভাঁরা।
বড়ত বিধি দিম ঘটজ নিবারা॥
সোক কনকলোচন মতি ছোনী।
হরী বিমল গুণগণ জগ জোনী॥
ভরত বিবেক বরাহঁ বিসালা।
অনায়াস উধরী তেহি কালা॥
করি প্রণামু সব কহঁ কর জোরে।
রামু রাউ গুরু সাধু নিহোরে॥
ছমব আজু অতি অনুচিত সেরা।
কহউঁ বদন মৃদু বচন কঠোরা॥
হিয়ঁ সুমিরী সারদা সুহাই।
মানস তে মুখ পঙকজ আই॥
বিমল বিবেক ধরম নয় সালী।
ভরত ভারতী মঞ্জু ময়ালী॥'

জনতা শান্ত হল। কেমন ঝিমিয়ে এল একটু আগের প্রায়-মতাল ঝড়। জনতা দুর্গাভাই-এর সঙ্গে গলা মিলিয়ে তুলসীদাসের দোহা গাইতে লাগল।

'বিমল বিবেক ধরম নয় সালী।
ভরত ভারতী মঞ্জু ময়ালী॥'

পরে একদিন দুর্গাভাই বলেছিলেন, স্বরাজই হোক, আর যাই হোক, জনতাকে কখনও ক্ষেপতে দিতে নেই। তাহলে সে অহিংসা ভুলে যাবে। উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠবে। তাকে আর শান্ত করা যাবে না। তাই না গান্ধীজী জননায়ক হয়েও জনতাকে পাগল হ'তে দেননি, সব সময় শান্ত রাখতে চেষ্টা করেছেন! মনে আছে চৌরিচোরা? সত্যাগ্রহ আন্দোলন বরং প্রত্যাহার করেছেন, তবু জনতাকে হিংসার পথে এগোতে দেন নি।

জনতার চিত্ত শান্ত রাখা, বুঝলে, সহজ কাজ নয়। গান্ধীজী পারতেন, তাঁর নিজের চিত্ত শান্ত ছিল। আমার চিত্ত এখন শান্ত হওয়া উচিত। তিন-কুড়ি-দশের নেই বেশি দেরী, এবার শান্ত হ'য়ে সমুখে শান্তি পারাবার দেখবার জন্যে নিজেকে তৈরী করা উচিত। সুরদাসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অহোরাত্র গুণগুণ করা উচিত, "আঁখিয়া হরি দরশন কী প্যাসী।" কিন্তু আমার চিত্ত সর্বদা অশান্ত! জনতার সামনে দাঁড়িয়ে কোনও দিন আমি শান্ত হ'তে পারি নি। কেমন অজানা ভয়, অচেনা আতংক অন্তরের গোপন অন্ধকারে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। বার বার মনে হয়েছে এই যে অসংখ্য অগণিত মানুষ, এরা আজ চুপ ক'রে বসে আমার কথা শুনছে, হাত-তালি দিচ্ছে, যদি এরা হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে; যদি এরা হঠাৎ দাবি করে: আরও অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, দাও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্ম; দাও গৃহ, রাস্তা, উন্নত চাষ, নতুন শিল্প—যদি দাও দাও ক'রে এগিয়ে এসে হঠাৎ দাউ দাউ বহ্নিশিখায় জ্বলে ওঠে? তাহলে কোথায় যাবে এই এত যত্নের গণতন্ত্র, এই এত সাধের সমাজতান্ত্রিক কাঠামো, এই এত আয়াসের দেশ সেবা?

অথচ একবারও দুর্গাভাইর মত আমার মুখ দিয়ে রামচরিত মানসের পয়ারঅমৃত নির্গত হয়নি উদ্বেলিত জনতাকে শান্ত করতে। বরং অন্তরের কোন অন্ধ্যায় গহ্বরে লুকানো কোন পাপ-কণ্ঠ চুপি চুপি বলেছে, এরা জাগবে না, জাগবে না, কোনও দিন, দাও দাও ধ্বনি তুলে দাউ দাউ জ্বলে উঠবে না। মনে রেখো, এ ভারতবর্ষের জনতা; চার হাজার বছরে এরা জাগেনি, ঘুমের সঙ্গে এদের চিরন্তন মিতালী।

জনতার পানে তাকিয়ে আরও কি মনে হয়েছে, জানো? মনে হয়েছে, বিরাট নদী জীবনের অগণিত তরঙ্গ নিয়ে সম্মুখে প্রবাহিত। আর, তক্ষুণি সেই নিরাকার ভয়। যদি নদী হঠাৎ সমুদ্র হয়ে ভয়ঙ্কর গর্জনে আমাদের দিকে ধেয়ে আসে? দুর্গা-

প্রসাদ একদিন বলেছিল, এদেশের মানুষ চিরদিন আপনাদের কথায় উঠবে বসবে না। একদিন তারা প্রশ্ন করবে, প্রশ্নের জবাব চাইবে। একদিন তাদের সঙ্গে আপনাদের চরম বোঝাপড়া হবে। দুর্গাপ্রসাদ এদেশের মানুষকে চেনে না। এরা চিরদিন চালিত হবে, হয় আমার দ্বারা, নয়—সুদর্শন দ্বারা, নয় অন্য কারুর দ্বারা। আর যারা এদের ক্ষেপিয়ে তোলবার ব্যর্থ প্রয়াসে জীবন নষ্ট করছে, তারাও এদের চালিয়ে নিয়ে যেতে চায়। জনতার দ্বারা চালিত হ'তে চায় না।

জনতা, তোমায় চুপি চুপি বলি, জনতা হল নারীর মত। কিছুতে তার তৃপ্তি নেই। তার ভোগ, সম্ভোগ, বাসনার আদি-অন্ত নেই। সে কৃতজ্ঞতা জানে না। রামায়ণে মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন, সৃষ্টির আদি থেকে স্ত্রীজাতির এই স্বভাব, তারা সম্পন্ন ব্যক্তির অনুরক্ত হয়, বিপন্নকে ত্যাগ করে। তাদের চপলতা বিদ্যুতের ন্যায়, তীক্ষ্ণতা অস্ত্রের ন্যায়, ক্ষীপ্রতা গরুড় ও বায়ুর ন্যায়। "এষাহি প্রকৃতিঃ স্ত্রীনামাসৃষ্টে রঘুনন্দন। সমস্থ-মনরজ্যন্তে বিষমস্থং ত্যজন্তি চ।" অমন যে সীতাদেবী তিনিও লক্ষ্মণের প্রতি কত সহজে সন্দেহবতী হ'য়ে উঠেছিলেন, মনে আছে? রামচন্দ্র মৃগরূপী মারীচের পিছু পিছু বহুদূরে গিয়ে পথভ্রান্ত। হঠাৎ মারীচ তাঁর স্বর নকল ক'রে চেঁচিয়ে উঠেছে 'লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!' সীতা ব্যাকুল হ'য়ে লক্ষ্মণকে বলছেন রামের সন্ধানে যেতে। লক্ষ্মণ বিপদ অনুমান ক'রে সীতাকে একা ফেলে যেতে পারছেন না। এই সময় বাল্মিকী সীতার মুখ দিয়ে কি বলিয়েছিলেন?

'অহং তব প্রিয়ং মন্যে রামস্য ব্যসনং মহৎ।
রামস্য বসনং দৃষ্ট্বা তেনৈতানি প্রভাষসে॥
নৈব চিত্রং সপত্নেষু পাপং লক্ষ্মণ যদ্‌ভবেৎ।
ত্বদ্‌বিধেষু নৃশংসেষু নিত্যং প্রচ্ছন্ন চারিষু॥...

তন্ন সিদ্ধতি সৌমিত্রে তবাপি ভরতস্থ বা।
কথমিন্দিবরশ্যামং রামং পদ্মনিভেক্ষণম্॥
উপসংশ্রিত্য ভর্তারং কাময়েয়ং পৃথগ্ জনন্।
সমক্ষং তব সৌমিত্রে প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ম্॥'

সীতা বলে উঠলেন, লক্ষ্মণ, তুমি রামের মহাবিপদ কামনা কর। তুমি নির্দয় কপটাচারী জ্ঞাতিশত্রু। তুমি যে পাপকার্য করবে তাতে আশ্চর্য কি! তোমার বা ভরতের মনস্কামনা সিদ্ধ হবে না। তুমি ভাবছ, রাম মারা গেলে আমি তোমার কামপ্রার্থী হব। কিন্তু একবার যে ইন্দিবরশ্যাম পদ্মনেত্র রামচন্দ্রকে স্বামীরূপে ভোগ করেছে, সে অন্য কাউকে কামনা করতে পারে না।

মহাভারতে পাণ্ডব শিবিরে সবচেয়ে অসুখী, অতৃপ্ত বিদ্রোহী ছিল কে? দ্রৌপদী। বার বাব দ্রৌপদীর রসনা বেচারা যুধিষ্ঠিরের দেহে-মনে কঠিন বেত্রাঘাত করেছে। জনতাও রমণীর মত চির-অতৃপ্ত। তাকে যত দাও, সে তত চাইবে। কোনও দিন সে বলবে না, আর নয়, অনেক হয়েছে। লাস্যময়ী নারীর মত দিবসের কার্য, রজনীর বিশ্রাম সব সে গ্রাস ক'রে বসবে। তবু তার তৃপ্তি হবে না।

তুমিও কেমন লাস্যময়ী হ'য়ে উঠছ। তোমার মুখে কথা নেই। মনে আছে কি কোনও কথা? একটি শব্দও শুনতে পাওনা। কেউ কখনও শুনেছে কি তোমার উচ্চারিত শব্দ? তুমি কৌশল্যা নও, আমি সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল নই। কৌশল্যার চোখে নাচত স্বপ্ন আর মায়া আর কামনার ছায়া। চাঁপা ফুলের মত বর্ণ ছিল কৌশল্যার। কালো চোখ দুটি প্রগলভা হরিণীর মত নেচে নেচে কথা কইতো। চিবুকে কালো একটি তিল ছিল কৌশল্যার। 'চুনি চুনি ভএ কাঁচুঅ ফাটলি'। এই ছিল কৌশল্যা প্রথম প্রথম। তারপর, 'ঘন-ঘন আঁচর কুচযুগ কাঁচর, হাসি-হাসি তহি পুন হেরি।' শকুন্তলারও একদিন এক মুহূর্তে, বসন-বাকলকে

বড়ো বেশি আঁট মনে হয়েছিল। কৌশল্যাকে যখন প্রথম দেখি, কুষাণপুর স্কুলে একদিন পরিদর্শন উপলক্ষে, সেদিনও কালিদাসের শকুন্তলা বর্ণনা মনে পড়েছিল। 'নাতি-পরিস্ফুট-শরীর-লাবণ্য।' দেহে লাবণ্য পুরো পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠেনি। অনেক কিছু সম্পদের আশ্বাস দিচ্ছে অপূর্ব এক দেহলতা। তারপর একদিন সে দেহলতা সত্যি স্তবকে স্তবকে কুসুমদীপ্ত হ'যে উঠেছিল। 'মুনিমনসামপি মোহন কারিণি তরুণাকারণবন্ধো' হ'য়ে উঠেছিল কৌশল্যা। মুনিদেব মনেও বিভ্রম জাগাতে, তরুণ মনকে অহেতুক আনন্দে নাচিয়ে তুলতে পারত সেদিন কৌশল্যা। আমি মুনি নই। আমি প্রজা-পালক। আমি কবি। তুমি আমায় বিভ্রান্ত করতে পারো না। কৌশল্যার পরে আর কেউ পারেনি। না, সেও পারবে না, যার নাম সরোজিনী সহায়। প্রজাপালনের মধ্যে কবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোথায় যেন হারিয়ে গেল। মরবার আগে আর একবার তার সঙ্গে রাজা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মোকাবিলা হবে কি? আর 'কৃষ্ণলীলাকাহানী' নয়। নতুন কাব্য, একালের কাব্য, চোখে-দেখা মনে-জানা মানুষদের নিয়ে নতুন এক মহাকাব্য সে লিখতে চায়। পাবে কি?

'রাত কা অন্তিম প্রহর হ্যয়,
ঝিলমিলাতে হ্যয় সিতারে,
বক্ষ পর যুগ বাহু বাঁধে
ম্যঁয় খড়া সাগর কিনারে।
বেগ সে বহ্‌তা প্রভঞ্জন
কেশপট মেরে উড়াতা,
শূন্য মেঁ ভরতা উদধি—
উর কী রহস্যময়ী পুকারেঁ
ইন্ পুকারোঁ কী প্রতিধ্বনি
হো রহো মেরে হৃদয় মে

হায় প্রতিচ্ছায়িত জঁহা পর
সিন্ধুকা হিল্লোল-কম্পন।
তীব পর কৈসে রর্কুঁ ম্যয়ঁ,
আজ লহরোঁ মেঁ নিমন্ত্রণ!'

লহরোঁ মেঁ নিমন্ত্রণ। বারবার তরঙ্গ আমায় আমন্ত্রণ করেছে। শুনতে পেয়েছি অতল জলের আহ্বান। ইচ্ছে হয়েছে সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি অজানা অচেনা নিরুদ্দেশে। চেপে বসে থেকেছি রাজনীতির আসনে, পরে রাজাসনে। বহুদিন উদয়াচলের মুকুটহীন রাজা, একবার মুকুট পেয়ে, আর তা ছাড়তে রাজী নয়। প্রজাপালনে ত্রুটি ঘটতে দিই নি। গণতন্ত্র বলো, সমাজতন্ত্র বলো, এ হল প্রাচীন ভারতবর্ষ। এখানে যে রাজকার্য চালায় সে রাজা। জনগণ সব প্রজা। রাজার মতোই আমি প্রজাপালন ক'রে আসছি। নিজেকে এক মুহূর্তের বিশ্রাম দিইনি। 'অবিশ্রমো, লোকতন্ত্রাধিকারঃ'। লোকতন্ত্রে যার অধিকার, যিনি রাজা, তাঁর বিশ্রাম নেই। তিনি সূর্যের মত অনন্ত অবিরাম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন; বায়ুর মতো দিবারাত্র সমানভাবে বয়ে চলেন; অনন্তদেবের মত তিনি 'সদৈবাহিত-ভূমিভারঃ'। আমি কবির চেয়ে রাজার ভূমিকায় জড়িয়ে গেছি অনেক বেশি। উদয়াচলের গগনে চিরদিন গৌরব-ভাস্বর হ'য়ে উদিত থাকতে চেয়েছি। আমার হাতে বিশেষ ময়লা লাগেনি, আমার মনেও নয়। দুর্গাপ্রসাদ চলে যাবার পর ছেলেগুলির জন্য একেবারে-যে-টুকু না করলে নয় তার চেয়ে বেশি করিনি। যা করেছি তা না করলে ভবিষ্যতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের পুত্র বলে উদয়াচলে পরিচয় দেবার মত সামাজিক মর্যাদা ওদের থাকতো না। হ্যাঁ, একটা বাড়ী করেছি। বহুকালের অপূর্ণ সাধ মিটিয়ে তৈরী করেছি আমার বাড়ী। তাতেও আইনে বাঁধে এমন অন্যায় কিছু করিনি। উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী জীবনে কোনও নারী নেই, সবাই জানে। তুমি তো পরিচারিকা মাত্র!

ঘুম পাচ্ছে? বেশ লাগছে তোমাকে। নেশা লাগছে, গর্ব লাগছে, তোমার সঙ্গ আজ এমন ভালো লাগছে। চোখে ঘুম নেমে আসছে। আজ এখানে বলব শুধু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। অর্থাৎ বেদব্যাস। মহাভারত রচয়িতা। [illegible] জন মহাভারতের উপাখ্যান এবং রচয়িতা। কে ছিলেন তাঁর [illegible] জানো? পরাশর মুনি তাঁর পিতা। একদিন মৎস্যগন্ধা কন্যা তাঁর বাপের আদেশে যমুনায় পারাপার করছিলেন। সেই সময় ঋষি পরাশর এসে সে নৌকায় উঠলেন। সত্যবতীর রূপে পরাশর কামাতুর হ'য়ে পড়লেন। সঙ্গম চাইলেন। সত্যবতী বললেন, 'এমন স্থানে এই নৌকার এত লোকের সামনে কি করে সম্ভব?' ঋষি পরাশর তখন কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করলেন। বললেন, 'আমার সঙ্গে সঙ্গম করলেও তোমার কুমারীত্ব বজায় থাকবে, তাছাড়া মৎস্যগন্ধা তুমি সুগন্ধযুক্তা হবে।' সত্যবতীর আর আপত্তি করবার কারণ রইল না। কুজ্ঝটিকার অন্তরালে পরাশর সত্যবতী-সঙ্গমে জন্ম হল বেদব্যাস। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। জন্ম হ'তেই বৈরাগ্যবান। কিন্তু জীবন-বিমুখ নয়। সত্যবতী পরে শান্তনুর পত্নী হন। শান্তনুর কাছ থেকে সত্যবতী পেলেন দুইপুত্র: চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। দুজনেই নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলেন। তখন সত্যবতী কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে ডেকে আদেশ দিলেন, ভ্রাতৃপত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্রোৎপাদন করতে। আজন্ম তপস্বী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মাতৃ আজ্ঞা পালন করলেন। বললেন 'মাতঃ! কেবল ধর্মপালনের উদ্দেশ্যে আমি আপনার অভীষ্ট কাজ করবো।'

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আরও বললেন, দুই রাণীকে এক বছর ব্রতপালন ক'রে শুদ্ধ হ'তে হবে। সত্যবতী রাজী হলেন না। বললেন, এক্ষুণি রাণীদের পুত্র চাই। তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বললেন, তবে রাণীরা যেন আমার কুৎসিত রূপ, গন্ধ আর বেশ সহ্য করতে পারেন। সত্যবতী অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে অম্বিকাকে শয়ন ঘরে পাঠালেন। অম্বিকা

বিছানায় শুয়ে ভীষ্ম ও অন্যান্য সুদর্শন বীরদের কথা ভাবতে লাগল। তারপর সেই দীপালোকিত গৃহে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রবেশ করলেন তাঁর কৃষ্ণবর্ণ দীপ্ত নয়ন, পিঙ্গল জটা-দাড়ি দেখে অম্বিকা ভয়ে চো বুজল। তাঁর পুত্র ধৃতরাষ্ট্র হল মায়ের দোষে অন্ধ। অম্বালি চোখ বুজল না, কেবল ভয়ে পাণ্ডুর হ'য়ে গেল। তার পুত্র প হল মায়ের দোষে পাণ্ডুবর্ণ।

আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। কে. ডি. কোশল। কে. ডি. বেদব্যাসের উত্তরসূরী। আজন্ম তপস্বী নই। ব্রাহ্মণ সন্তান। ব্রাহ্মণ হ'য়ে রাজা। আমি তাই বিশ্বামিত্র। আমরা সবাই। আমি, সুদর্শন তুবে, তুর্গাভাই দেশাই। আমাদের হাতে নতুন মহাভারত তৈরী হচ্চে। আমরাও বিশ্বামিত্রের মত ক্ষত্রিয় বলকে ধিক্কার দিয়েছি। বিশ্বামিত্র বলেছিলেন,'ব্রহ্মতেজোবলং বলম্'। বলেছিলেন,'বলাবলং বিনিশ্চিত্য তপ এব পরং বলম্'। বলাবল দেখে আমি নিশ্চিত জেনেছি তপস্যাই পরম বল। আমাদের তপস্যা রাজনীতি। আমরা, একালের বিশ্বামিত্ররা, বলি, রাজনীতিই পরম বল।

কাল সন্ধ্যায় গান্ধী ময়দানে বিরাট জনসভা হবে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশলের বিজয়-কেতন উড়বে সে জনসভায়। উদয়াচলের কংগ্রেসে পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আনন্দ প্রকাশ করবে জনসমুদ্র। কে. ডি. কোশলকে অভিনন্দন জানাবে পুনরায় রাজা হবার জন্য। বক্তৃতা করবে সুদর্শন তুবে, বক্তৃতা করবেন তুর্গাভাই দেশাই—এবং সরোজিনী সহায়। গান্ধীবাদের সঙ্গে মিলবে নবীন সমাজবাদ ; নীতিবাগীশের সঙ্গে নীতি-বিমুখ। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জয়ধ্বনিতে বিলাসপুরের গগন বিদীর্ণ হবে। সে জয়ধ্বনি পৌঁছবে না গঙ্গা-সলিলপূত বারাণসীতে।

ফুলের মালার ভারে ভেঙ্গে পড়বে না কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল। মণিহার আগামী কাল তার সাজবে, সাজবে সাজবে। জনসমুদ্রের পানে তাকিয়ে তার বুক কেঁপে উঠবে। সেই প্রাচীন কম্পন।

জনতাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আর ক্ষেপিয়ে তুলতে চাইবে না। জনতা থাকবে নদী হ'য়ে। সমুদ্র হবে না। দাও দাও ক'রে দাউ দাউ অগ্নিশিখা হ'য়ে এগিয়ে আসবে না।

তোমরা এসেছ আমাকে অভিনন্দন জানাতে? দাও, দাও, মালা দাও, ফুলহার দাও, মণিহার দাও। আমি তোমাদের মুখ্যমন্ত্রী। তোমাদের গণতান্ত্রিক রাজা। তোমরা ভোট দিয়ে আমাকে রাজা করেছো। আমি একালের গোপালদেব। কেন করেছ? আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বড়, অনেক উঁচু, তাই। আমি ক্ষমতার ব্যবহার জানি, তাই। আমি শাসনের কৌশল জানি, তাই। আমি তোমাদের সবাকার সবকিছু জানি। সাড়ে পাঁচ বছর আমি তোমাদের রাজত্ব চালিয়েছি, আরও অনেক দিন চালাবো, যতদিন এ দেহে শক্তি থাকবে, ততদিন। তোমরা আমায় হারাতে পারবে না। আমি তোমাদের দুর্বলতা সবটুকু জানি, তাই কেবল তোমরাই হারবে। আমাকে কেন, কংগ্রেসকেও তোমরা কোনও দিন হারাতে পারবে না। কংগ্রেসের বল তোমাদের প্রাচীন দুর্বলতা, ধারাবাহিক দুর্বলতা। তোমরা অনাহারে মরলেও নির্বাচনের সময় কংগ্রেসকে ভোট দেবে। সেই ভারতবর্ষ সমানে চলেছে, তার বাইরের চেহারা বদলেছে, অন্তরের রূপ বদলায়নি। তোমরা একবার আমাকে সরাতে চেয়েছিলে, হেরেছে। আবার চাইলে, আবার হারবে। কংগ্রেসকে সরাতে চাইলেও হারবে। তোমরা যারা কংগ্রেসকে সরাতে চাইছো, জানো না কংগ্রেস প্রতিদিন তোমাদের দুর্বল করছে; কংগ্রেসের সব দুর্বলতা তোমাদের মধ্যে ঢুকছে। তেমনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল কুজ্ঝটিকার আড়াল থেকে তোমাদের দুর্বলতা বাড়িয়ে দেবে, তোমাদের দুর্বলতা নিয়ে খেলবে, তোমাদের ওপর আমরণ রাজত্ব করবে।

আমি তোমাদের ভাল করবো, মঙ্গল করবো। আমি যে রাজা তোমাদের কুশল আমার একমাত্র কাম্য। তোমরা শান্ত সুশীল

প্রজা, আমি ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যব্রত, প্রজাকল্যাণরত রাজা। তোমাদের আবেদন নিবেদন সব আমি মন দিয়ে শুনবো। তোমাদের আরও অনেক ভাল করবো। দেখবে, উদয়াচলে আরও সড়ক হবে, নদীর ওপর বাঁধ, বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়বে, বসবে নতুন কল কারখানা, কৃষির প্রসার হবে, বিদ্যালয় হাসপাতাল তৈরী হবে আরও অনেক। তবু তোমাদের পেটে ক্ষিধে থাকবে, ঘরে ঘরে থাকবে, বেকার যুবক, তবু শতকরা ত্রিশজনের বেশি নামসই করতে পারবে না, তবু গ্রামে গ্রামে জমাট হ'য়ে থাকবে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন অন্ধকার, প্রতি পাঁচ বছর পর বাধ্য শান্ত সুশীল তোমরা কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে যাবে।

আমার শাসনতন্ত্রের মূলমন্ত্র থাকবে : দ, দ, দ

পুরাকালে প্রজাপতি নিজে বিদ্যাদানের জন্যে একটি আশ্রম খুলেছিলেন। তাঁর তিনটি ছাত্রের মধ্যে একটি দেবতা, একটি দানব, তৃতীয়টি মানুষ। বারো বছর বিদ্যাদানের পর, সমাবর্তনের সময়, প্রজাপতি তাদের ডেকে পাঠালেন। গুরুর কাছে শিষ্য শেষ উপদেশ প্রার্থনা করবে।

প্রথম এল দেবতা-শিষ্য। প্রজাপতি-চরণে প্রণত হয়ে বলল, "গুরুদেব আমায় কিছু উপদেশ দিন।"

প্রজাপতি বললেন, "দ"

শিষ্য পুনরায় প্রণাম করল। প্রজাপতি ঈষৎ হেসে প্রশ্ন করলেন, "বুঝতে পেরেছ?"

"হ্যাঁ। আপনি আমায় উপদেশ দিলেন দাম্যত'। অর্থাৎ দমন করো।"

এবার এল মানুষ-শিষ্য। প্রার্থনা করল শেষ উপদেশ।

প্রজাপতি আবার বললেন, "দ।"

প্রণাম ক'রে সে উঠে দাঁড়াল।

"বুঝতে পেরেছ?"

"পেরেছি। আপনি আমায় বললেন 'দত্ত'। অর্থাৎ দান করো।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল, তুমি উদয়াচলের রাজা। তুমি মুখ্য
দ, দ, দ।

উদয়াচলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন কোশল ঘুমিয়ে পড়া
বাইরে মেঘের লঘু গর্জন হল, দ, দ, দ।
ঘরে নাসিকার গুরু গর্জন হল, দ, দ, দ।

জগন্মোহন তিওয়ারী এসে দরজায় দাঁড়াল।

দেখল, একটি নিরেট বোবা, নিরেট বধির সুন্দরী কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঘুমন্ত মুখের পানে তাকিয়ে রয়েছে।

নিজেকে ঘুছিয়ে নেবার প্রয়োজন মনে করেনি।

———